বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

সিলেট

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সিলেট

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
শরদিন্দু ভট্টাচার্য

সংগ্রাহক
উত্তম কুমার দেবনাথ
সঞ্জয় কুমার নাথ
অপূর্ব কর্মকার
জয়শ্রী মোহন তালুকদার
নাজমুল হক চৌধুরী
বাপ্পী চক্রবর্তী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
সিলেট

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১৮

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত পঁচিশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : SYLHET (Present State of Folklore in Sylhet District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 325.00 only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5327-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি।

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর),

www.pathagar.com

মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)।

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে।

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।

৫. ছবি।

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর।

www.pathagar.com

১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, গবেষণা অফিসার মো. জিল্লুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান সিলেট জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সিলেটের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭১

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. বনভূমি ও গাছপালা
ঘ. সীমানা
ঙ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
চ. জনবসতির পরিচয়
ছ. নদ-নদী, খাল-বিল ও পাহাড় টিলা
জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ঝ. ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা ও নিদর্শন
ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি
ট. মুক্তিযুদ্ধ
ঠ. বিশিষ্ট গায়ক, শিল্পী ও লোককবি

লোকসাহিত্য (folk literature) ৭২-১৩৪

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোককবিতা
ঘ. লোকছড়া
ঙ. পাঁচালি
চ. লোকপুরাণ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material folk culture) ১৩৫-১৩৮

লোকশিল্প
১. মৃৎশিল্প, ২. শীতলপাটি, ৩. মণিপুরি তাঁতের কাপড়, ৪. বাঁশ/ বেত শিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১৩৯

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪০-১৪১

১. বাঁশের সহায়তায়, ২. ইটের সহায়তায়, ৩.কেবল মাটি দ্বারা, ৪. কুড়ে বা ছনের ঘর, ৫. অন্যান্য।

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ১৪২-২২৫
১. ইসলামী সংগীত
২. মুর্শিদি
৩. সহজিয়া ও মারফতি সংগীত
৪. বৈষ্ণবগীতি
৫. শাক্ত সংগীত
৬. সূর্যব্রতের গান
৭. বিবাহসংগীত
৮. আঞ্চলিক গান
৯. বন্দনা গীতি
১০. ভাটিয়ালি
১১. দেশাত্মবোধক
১২. মাতৃবন্দনা
১৩. অন্যান্য সংগীত

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২২৬-২২৭

লোকউৎসব (folk festival) ২২৮-২২৯
১. গোপীনাথের উৎসব
২. মহাপ্রভু মহোৎসব
৩. কাঠিয়া বাবার উৎসব
৪. জলসা
৫. ওরস

লোকমেলা (folk fair) ২৩০-২৩১
১. বৈশাখী মেলা
২. মাঘী মেলা
৩. পৌষ মেলা
৪. একুশে মেলা
৫. চড়ক মেলা
৬. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা
৭. রথযাত্রার মেলা

লোকাচার (ritual) ২৩২-২৪৮
১. হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে
২. মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত উৎসব
৩. ব্রতাচার
৪. সাধভক্ষণ
৫. অন্নপ্রাসন
৬. মনসাপূজা
৭. ভোলা ছাড়ান
৮. আকিকা
৯. গর্ভজান

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ২৪৯-২৬৩

ক. লোকখাদ্য

১. আলুর পিঠা, ২. চন্দন কাঠ পিঠা, ৩. ডালের পিঠা, ৪. চালের পিঠা, ৫. ধুনি পিঠা, ৬. চাল-আলুর পিঠা, ৭. মালপা, ৮. বকফুল, ৯. চোঙা পিঠা, ১০. আলুর জাম, ১১. মুগের বরফি, ১২. হাতকরার চুকা (টক্) বা খাট্টা, ১৩. আলুর দম, ১৪. নারকেল ইলিশের ঝোল, ১৫. থুনিমানকুনির (থানকুনির) ভর্তা, ১৬. ডুমোর তরকারি, ১৭. বাঁধাকপি, ১৮. তরমুজের খোলা ভাজা, ১৯. করলা শুকতো, ২০. পুঁই পাতার বড়া, ২১. আলু ডিম বড়া, ২২. কচু পাতার বড়া, ২৩. আলু মাছের ভর্তা, ২৪. শুটকি ভর্তা, ২৫. হাঁস-বাঁশের মাংস, ২৬. চিংড়ি সিদ্ধ, ২৭. লাউ-বড়ই টক, ২৮. জারুল ভর্তা, ২৯. কুচিলা পাতার বড়া, ৩০. ইলিশ শুটকির বড়া, ৩১. পাম রুটি, ৩২. চা-পাতা ভর্তা, ৩৩. ভুনা খিচুড়ি, ৩৪. চিড়ার পোলাও, ৩৫. সিদ্ধ চালের পোলাও, ৩৬. পটল পোলাও, ৩৭. চাটনি

খ. মণিপুরিদের খাদ্য

গ. গারোদের তরকারি

ঘ. মিষ্টিজাত খাদ্য

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & dances) ২৬৪-২৭৩

ক. লোকনাট্য

খ. লোকনৃত্য

১. ধামাইল, ২.ঝুমুর নৃত্য, ৩. চড়ক নৃত্য, ৪. হিজড়া নৃত্য

লোকক্রীড়া (folk games) ২৭৪-২৯৪

১. মার্বেল, ২. সাত পাতা, ৩. মাংস, ৪. বড়া, ৫. ঘোড়া, ৬. সাতচাড়া, ৭.ছিক্, ৮.বন্দি, ৯. লাই, ১০. ছোট খেলা, ১১. চেল খেলা, ১২. ইরি বিরি, ১৩. রস-কস, ১৪. কুত্কুত, ১৫. কানামাছি, ১৬. টেকরা টেকরি, ১৭. সেল, ১৮. কানাকানি, ১৯. চোর-পুলিশ, ২০. দাঁড়াগুটি, ২১. রাজা ও চোর, ২২. মাছের নাম না ফুলের নাম, ২৩. হাব্বা-ডাব্বা, ২৪. নুন্তা, ২৫. ইটুল বিটুল, ২৬. আলু আলু, ২৭. গাইয়া গুটি, ২৮. মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া কাং

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৯৫-৩০৪

ক. লোকচিকিৎসা

খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৩০৫-৩১৩

প্রবাদ-প্রবচন (folk saying & proverb) ৩১৪-৩২০

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩২১-৩৩৫

১. লৌহশিল্প কর্মকার সম্প্রদায় (কামার), ২. নরসুন্দর, ৩. কাঠমিস্ত্রী (সূত্রধর) ৪. স্বর্ণকার, ৫. চর্মকার, ৬. শব্দকর, ৭. ব্যান্ড বাদক, ৮. ঠেলা শ্রমিক, ৯. খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক, ১০. ঠাকুর/বাবুর্চি, ১১. মুড়ি প্রস্তুতকারক, ১২. গৃহনির্মাণ শিল্পী, ১৩. ধুনকর সম্প্রদায়, ১৪. রিক্সা-চালক, ১৫. পাথর ও বালু ব্যবসায়ী, ১৬. চিত্রশিল্পী, ১৭. বস্ত্র প্রস্তুতকারক

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩৩৬-৩৪৩

ক. বাঁশজাত লোকপ্রযুক্তি

১. পলো, ২. খলই, ৩. হাতজাল, ৪. টুকরি, ৫. চালুনি, ৬. হেইত, ৭. চুলা, ৮. কাফা

খ. লৌহ নির্মিত লোকপ্রযুক্তি

১. শর্তা, ২. বেড়ি, ৩. কোদাল, ৪. হাতুড়ি, ৫. বটি দা, ৬. ছেদ দা/কুব দা, ৭. রাম দা, ৮. কাঁচি, ৯. নিড়ি কাঁচি, ১০. ঘুটনি

গ. কাঠজাত লোকপ্রযুক্তি

ঘ. লেপ-তোষক তৈরির লোকপ্রযুক্তি

ঙ. ধান সেদ্ধ করার লোকপ্রযুক্তি

লোকভাষা (folk language) ৩৪৪-৩৫০

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

প্রাচীনকালে বর্তমান আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ এবং সিলেট (শ্রীহট্ট) অঞ্চলের সমন্বয়ে কামরূপ রাজ্য গড়ে ওঠে।[১] রামায়ণ এবং মহাভারত কামরূপ সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করে তাতে দেখা যায় সমগ্র বঙ্গে আর্য বসতি অনুপস্থিত থাকলেও কামরূপের প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক অঞ্চলে তা বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেন-'...এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল *অহোম* নামে অন্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছে। সেখানে যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীনকালে আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত।'[২] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা প্রাগজ্যোতিষ্‌পুরকে অনেক পণ্ডিতই বৃহত্তর সিলেটের লাউড় ও জৈন্তা রাজ্য বলে মনে করেন।[৩]

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে *সুরমস* নামক যে জনপদের উল্লেখ বর্তমান, ভি. এম আগরওয়াল তাকে সুরমা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীন *শ্রীহট্ট* বলে চিহ্নিত করেছেন।[৪] তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হলে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই একটি উন্নত জনপদ হিসেবে সিলেট অঞ্চলের অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পাবে।

আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলকে তিনটি স্ব-স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে; আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত *রূদ্রাক্ষমাহাত্ম* এবং *রূপচিন্তামোনিকোষ* (পঞ্চদশ শতক) নামক দুটি পাণ্ডুলিপি শ্রীহট্ট ও হরিকোলা জনপদ দু'টিকে এক বা সমার্থক বলে উদ্ধৃত করেছে। নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, সপ্তম-অষ্টম থেকে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল জনপদ, বঙ্গ ও সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে হরিকেল বা হরিকোলা জনপদটির বিস্তৃতি ছিল শ্রীহট্ট (সিলেট) পর্যন্ত।[৫]

কামরূপরাজ ভূতি বর্মার শাসনকাল মোটামুটিভাবে ৫১৮-৫৪২ খ্রিঃ বলে অনুমিত। তখন গুপ্ত যুগের পতন কাল; দুর্ধর্ষ হুন নায়ক তুরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার পূর্বক মন্দির ও মঠ ধ্বংসে রত, অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছেন বৌদ্ধ ও হিন্দু পণ্ডিতগণ, সঙ্গত কারণে ব্রাহ্মণগণ দিশেহারা ও আতঙ্কিত। ঠিক সেই সময় সিলেট তথা পূর্বাঞ্চলের শাসকগণ সেখানে ব্রাহ্মণদের স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমাঞ্চলের বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং পূর্বাঞ্চলের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করেই সম্ভবত এ (ষষ্ঠ) শতাব্দীর শেষ দিকে বিপুল সংখ্যক ব্রাহ্মণের পূর্বাঞ্চলে আগমন ঘটে। পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি মতে, ছয় সহস্র ব্রাহ্মণ এতদঞ্চলে এসেছিলেন এবং তাদের বসতি গড়ে তোলার জন্য সিলেট বিভাগের (শ্রীহট্ট মণ্ডলের) গরলা, পোগার, চন্দ্রপুর নামক তিনটি জেলা (তিনটি বিষয়) এবং উপকূলীয় দ্বীপ সমেত এক বিশাল ভূখণ্ড দান করা হয়েছিল।[৬]

www.pathagar.com

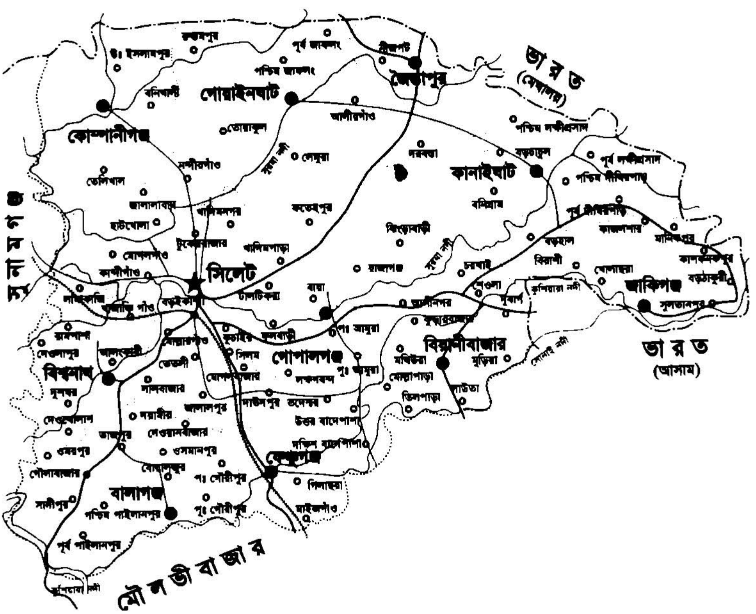

সিলেট জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

সুসমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ হিসেবে সিলেট অঞ্চলের অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এসব তথ্য সন্দেহাতীত ভাবে যোগ্য ভূমিকা পালন করে।

শ্রীহট্ট শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে আসলেও এমনকি বৃহৎ কোনো রাজ্যের অংশ হিসেবে তার উপস্থিতি চোখে পড়লেও এ নামে স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্ব প্রথম পরিদৃষ্ট হয় খ্রিষ্টীয় দশম শতকে, মহারাজ শ্রীচন্দ্রের শাসন আমলে।[৭] তার নামাঙ্কিত পশ্চিমভাগ তাম্রফলকই উক্ত তথ্যের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। মধ্যযুগের প্রথম পর্বেও এ ভূখণ্ড *শ্রীহট্ট* নামে অধিষ্ঠিত ছিল বলে আমাদের ধারণা। তবে সে সময় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন *রিপুরাজগোপীগোবিন্দ* উপাধিপ্রাপ্ত নরপতি কেশব দেবের পিতা নারায়ণ দেব। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মৌলভীবাজার জেলার মাইজগাঁও ও বরমচাল রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী ভাটেরা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনই উক্ত তথ্যের প্রামাণিক। উল্লেখ্য, বৃহত্তর সিলেটের অন্তর্গত *ভাটেরা*'র হোমের টিলা থেকে উদ্ধারকৃত উক্ত তাম্রশাসনের সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলে অনুমিত। সেই সময় কেশব দেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিধায়, তৎপূর্ব সময়কে তাঁর পিতা নারায়ণ দেবের রাজত্বকাল বলে ধারণা করা যায়।

সিলেটে অবশ্য মুসলিম বিজয় সূচিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে; গৌড়গোবিন্দের রাজত্বকালে। তবে ইতোপূর্বে ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে কৈলাসগড়ে এবং ১২৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আজমিরিগঞ্জে[৮] মুসলিম শাসকগণ ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন।

কেশব দেব যে সিলেট বা শ্রীহট্টের অধিপতি ছিলেন, তার সাক্ষ্য বহন করছে পূর্বোক্ত তাম্রশাসনে বর্ণিত *শ্রীহট্ট রাজ্যকমলায়া, প্রাদাৎ শ্রীহট্টনাথোয়ৎ* প্রভৃতি উদ্ধৃতি এবং ভূমি পরিমাপক একক *কেদার, হল* প্রভৃতি শব্দ যা বর্তমানে এতদঞ্চলে *কেয়ার* ও *হাল* নামে প্রচলিত।

শ্রীহট্ট বলতে তখন কোন্ কোন্ অঞ্চলকে নির্দেশ করা হতো তা অবশ্য তাম্রলিপি সূত্রে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে কমলাকান্ত গুপ্তের অনুমান গোবিন্দ কেশব দেবের সময় এ রাজ্য সিলেটের দক্ষিণাংশ, কাছাড় জেলার (আসাম) বৃহৎ এক অংশ এবং ত্রিপুরার একাংশ নিয়ে গঠিত ছিল।[৯] জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য অবশ্য এ রাজ্যের সীমা আরো বৃহৎ ছিল বলে অনুমান করেন। তাঁর মতে, কাছাড় ও ত্রিপুরার অংশ বিশেষের সঙ্গে সমগ্র সিলেটই ওই সময় ছিল শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।[১০] মধ্যযুগে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনার অংশবিশেষও *শ্রীহট্ট মণ্ডলের* সঙ্গে ছিল যুক্ত।

বিদেশিদের উচ্চারণে শ্রীহট্ট একসময় সিলেট রূপে পরিবর্তিত হয়। এই সিলেটের নামকরণ নিয়ে বেশ কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

এক. এ অঞ্চলে প্রচুর শিল, শিলা বা পাথর পাওয়া যেত। এর উপর হাট বা বাজার বসত। এ থেকে নাম হয় শিলা হাট, শিলহট, শিলহট্ট ক্রমে সিলেট নামে রূপান্তরিত হয়।

দুই. হযরত শাহজালাল যখন তাঁর সঙ্গী নিয়ে প্রথম সিলেট আসেন তখন গৌড় গোবিন্দ রাজধানীর প্রবেশ পথে বড় একটি পাথর (শিল) ফেলে রেখে ছিলেন। হযরত

www.pathagar.com

শাহজালাল *শিল্ হট যা* (পাথর সরে যা) বলার সাথে সাথে পাথর সরে যায়। এ থেকে নাম হয়ে যায় শিলহট্।

তিন. গৌড়ের রাজা গুহক তাঁর কন্যা শিলার নামে রাজধানীতে একটি হাট স্থাপন করেন। হাটের নাম রাখেন শিলাহাট্। পরে নাম পরিবর্তিত হয়ে শিলহট এবং একসময় শ্রীহট্ট হয়ে যায়।

চার. শ্রী অর্থ সুন্দর, হস্ত অর্থ হাত। সুন্দর হাতের গড়া তাই শ্রীহস্ত। কালক্রমে শ্রীহট্ট।

পাঁচ. এখানকার বাজারটি খুব সুন্দর ছিল। তাই শ্রীহট্ট। পরে সিলেট।

'শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি বিষয়ে নানা গল্প-কাহিনী-কিংবদন্তী প্রচলিত থাকলেও *সুন্দর* অর্থে শ্রী এবং *হাট* অর্থে হট্ট শব্দ যুক্ত হয়ে এর নামকরণ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রীপুর, শ্রীরামপুর, শ্রীমঙ্গল, শ্রীসূর্য, রায়শ্রী, গোবিন্দশ্রী, বানেশ্রী, লক্ষণশ্রী, চৌহাট্টা প্রভৃতি নামকরণ আমাদের এই ধারণার পক্ষে যুক্তি দান করে।

প্রাচীন যুগের বিদেশি ঐতিহাসিকগণ সিলেটকে উপস্থাপন করেছেন সিরি-ও-টো (Siri-0-t0) রূপে। আবার মধ্যযুগে এতদঞ্চল উল্লিখিত হয়েছে সিরিওট (Siriot) নামে। বর্তমানে ইংরেজিতে তা Sylhet নামে নামাঙ্কিত হলেও বিভিন্ন সময় তা Sisatae, Siratae প্রভৃতি নামেও হয়েছে উদ্ধৃত।'[১১]

ব্রিটিশ শাসন আমলে সিলেট কখনো ঢাকা, কখনো আসামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বিভাগের একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে তা আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের রেফারেন্ডমের ফলে সিলেটের একটি মহকুমা বিচ্যুত হয়ে চলে যায় ভারতের সঙ্গে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে এ বছরই সিলেট ব্রিটিশ শাসনের আওতাধীন আসে। কোম্পানি কর্তৃক এতদঞ্চলের প্রথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হন তখন মি. সামনার।

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য গঠিত হয় সুনামগঞ্জ মহকুমা। ১৮৭৮ ও ১৮৮২ সনে একই কারণে সৃষ্টি হয় যথাক্রমে করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার মহকুমা। একশত বছরেরও অধিক সময় পর্যন্ত এগুলো মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালে; তখনো সিলেট ৪টি মহকুমার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা। তবে তার একযুগ পর অধীনস্থ মহকুমাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট পরিণত হয় স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগে। মহকুমাসমূহ অবশ্য তখন অধিষ্ঠিত হয় জেলা শহরের মর্যাদায়।

সিলেট বিভাগ '৮৪ পূর্ব সিলেট জেলারই নতুন সংস্করণ। কারণ, এই বিভাগের সঙ্গে অন্য কোন জেলা বা বিভাগের কোন অংশের যেমন সংযুক্তি ঘটেনি, তেমনি এই বিভাগের কোন অংশও অন্য কোন জেলা বা বিভাগের সঙ্গে একীভূত হয়নি। শুধু পূর্বেকার মহকুমাগুলো এক্ষেত্রে জেলার স্থান দখল করেছে।

www.pathagar.com

সিলেট জেলার একটি অংশ *করিমগঞ্জ* এখন ভারতের অংশ। এটা ১৯৪৭ সালের সিলেট রেফারেন্ডাম-এর ফল। এর পূর্ব পর্যন্ত সিলেট কখনো আসাম আবার কখনো বাংলার অংশ হিসেবে মানচিত্রে শোভিত হতো।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

সিলেট জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশ, পূর্বে ভারতের আসাম প্রদেশ, দক্ষিণে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলা। ২৩°৫৫ উত্তর থেকে ২৫°১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৫ পূর্ব থেকে ৯২°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এর অবস্থান। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এতদঞ্চলের উচ্চতা ৫০ থেকে ৭৬ ফুট।

৩,৭৮০.৭১ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সিলেট জেলার ভূ-প্রকৃতি টিলা, হাওর, বিল এবং সমতলভূমির সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে সমতল ভূমিতে বেলে দো-আঁশ এবং টিলাময় উঁচু ভূমিতে কাঁকর মিশ্রিত লাল মাটির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের মাটির অম্লত্ব ৫.৬ থেকে ৬.৫।

বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলে নিয়মিত মৌসুমী প্রবাহ দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমা লঘু চাপের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আর এই লঘুচাপ ও বায়ুমণ্ডলের পুঞ্জিভূত মেঘ সিলেটের পাহাড়, টিলাসমূহের গা ঘেঁষে উড়ে বেড়ানোর কারণে এবং বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এতদঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। অবশ্য গ্রীষ্মকালে সিলেট অঞ্চলের উপর দিয়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় বলে এসময়েও এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি থাকে। সিলেটের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩১.৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১২.৯° সেলসিয়াস। তবে অনেক সময় এতদঞ্চলে দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বিরাজ করে।

গ. বনভূমি ও গাছপালা

সিলেট জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল একসময় বনভূমির অন্তর্ভুক্ত থাকলেও জনসংখ্যার চাপে বর্তমানে তা ৫%এ নেমে এসেছে। মোট ২১ হাজার হেক্টরের মতো জমি বর্তমানে বনভূমির অংশ। অবশ্য সংরক্ষিত আছে মাত্র ১০ হাজার হেক্টর (১ হেক্টর = ২.৪৭ একর)।

গ্রিন এক্সপ্লোর সোসাইটি,[১২] শাবিপ্রবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, সিলেট জেলার বনভূমি বর্তমানে নিম্নরূপঃ

উপজেলা ২০ ধারায় ঘোষিত (একর) ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত (একর) সর্বমোট (বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন-একরে)

উপজেলা	২০ ধারায় ঘোষিত (একর)	৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত (একর)	সর্বমোট (বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন-একরে)
গোয়াইনঘাট	১৪৪৩.০০	৪১০১.৭০	৫৫৪৪.৭০
কোম্পানীগঞ্জ	১৪১৬৭.২৯	১২২১১.০২	২৬৩৭৮.৩১
কানাইঘাট	৫৮৩৩.৯৫	১৮৯৩২.০২	২৪৭৬৫.৯৭
জৈন্তাপুর	০	১৭০৬.৭৬	১৭০৬.৭৬

www.pathagar.com

এগুলো ছাড়া সিলেট জেলার যে সব বনভূমি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো হচ্ছে—
টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক এবং রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট।

টিলাগড় ইকোপার্ক

টিলাগড় বনবিটের আওতাধীন টিলাগড় ইকোপার্ক (প্রস্তাবিত তৃতীয় সরকারী চিড়িয়াখানা) এর আয়তন ১১২ একর। এই পার্কে ৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে চাঁপালিশ, শাল, গর্জন, নাগেশ্বর, বকুল, হিজল এবং বিবিধ বেত উল্লেখযোগ্য। ২৬ প্রজাতির প্রাণি এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে মেছোবাঘ, বাগডাশ, বনমোরগ, অজগর, হনুমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক

উত্তর সিলেট রেঞ্জ ১-এর আওতাধীন এই বনের আয়তন ১৭০০ একর। এখানে রয়েছে ২১৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৩ প্রজাতির উভচর, ১২ প্রজাতির সরিসৃপ এবং বেশ কয়েক প্রজাতির পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণি। সরিসৃপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-গিরগিটি, অজগর, দাড়াইশ, গোখরা, ধোরা, জুনিয়া, দুধরাজ প্রভৃতি সাপ। পাখিদের মধ্যে-ফিঙ্গে, হাড়িচাচা, চড়ুই, শালিক, ঈগল, লক্ষ্মীপেঁচা প্রভৃতি। স্তন্যপায়ী প্রাণির মধ্যে শেয়াল, রেসাস বানর, মুখপোড়া হনুমান এবং বাঁশ প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে বড়ুয়া, জাই ও মৃত্তিঙ্গা।

একসময় সম্পূর্ণ বনাঞ্চল বাঁশ-বাগান নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কর্মসূচি তথা বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। সিলেট জেলার অন্যান্য বনাঞ্চলের মধ্যে এখানে জীব-বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি এবং বন ধ্বংসের হার এখানে অনেক কম।

রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট

এই বন সিলেট রেঞ্জ-২ এর আওতাধীন। এর আয়তন ৩৩২১ একর এবং তা গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি রক্ষিত বনাঞ্চল। ধারণা করা হয় বনাঞ্চলটি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। অনেকে অবশ্য একে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বনও মনে করেন। এই বনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি বাংলাদেশের একমাত্র সোয়াম্প ফরেস্ট যা বৎসরের একটা নির্দিষ্ট সময় পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। এখানে করচ গাছের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যন্য গাছের মধ্যে হিজল, জারুল, পানিজাম, বরুণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মূত্রা বেত এবং জালি বেতও এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে এখানে আছে হাড়ি চাচা, শামুক ভাঙা, বক, ফিঙ্গে, বুলবুলি, বসন্তবৌড়ি প্রভৃতি। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে দাড়াইশ, পিট ভাইপার, ধোড়া, অজগর, ব্যাঙ, রেসাস বানর এবং বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক জোঁক।

বর্তমানে জনবসতি ও পরিদর্শনকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বনটি হুমকির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

সিলেটের বিভিন্ন চা-বাগানও অরণ্য বেষ্টিত ছোটখাট বনাঞ্চল। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বিশেষত শেয়াল, বানর, পাখি ও সাপ দেখতে পাওয়া যায়। খাদিম, ডলিয়া, হাওয়লদার পাড়া, করের পাড়া প্রভৃতি কম ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় এখনো প্রচুর পরিমাণে বানর, রক্ত চোষা, বাগডাশ, বেজি, শেয়াল ও বিভিন্ন ধরনের পাখি ও বৃক্ষ প্রত্যক্ষ হয়। এসব অঞ্চলে বানর সমূহ মাঝেমধ্যেই গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যায়, ফলমূল ও গাছের পাতা যে আহার ও নষ্ট করে সে তো বলাই বাহুল্য।

সিলেটে স্বীকৃত কোন বোটানিক্যাল গার্ডেন নেই, তবে এয়ারপোর্ট রোডে পর্যটন মোটেলের পাশে একটি ছোটখাট উদ্যান পরিদৃষ্ট হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও কাঠের বৃক্ষ বর্তমান। বহু পর্যটক নানা কারণে এখানে বেড়াতে আসেন।

ঘ. সীমানা

সিলেট সদরের উত্তরে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট, দক্ষিণে বিশ্বনাথ ও দক্ষিণ সুরমা, পূর্বে জৈন্তা, দক্ষিণ পূর্বে গোলাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার অবস্থান।

দক্ষিণ-সুরমা উপজেলার উত্তরে সদর, দক্ষিণে ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ, পূর্বে গোলাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে বিশ্বনাথ উপজেলার অবস্থান। সুরমা নদী এই দুটি উপজেলাকে বিভক্ত করলেও কয়েকটি বড় ব্রিজের মাধ্যমে তা সংযুক্ত।

গোয়াইনঘাট উপজেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, পশ্চিমে কোম্পানীগঞ্জ, পূর্বে জৈন্তাপুর এবং দক্ষিণে সিলেট সদর উপজেলা।

কানাইঘাটের উত্তরে ভারত, পশ্চিমে জৈন্তাপুর, পূর্বে জকিগঞ্জ এবং দক্ষিণে গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলার অবস্থান।

বালাগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে বিশ্বনাথ, উত্তর পূর্বে দক্ষিণ সুরমা এবং পূর্বে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা। এর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে অবস্থান করছে মৌলভীবাজার এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলা।

গোলাপগঞ্জের উত্তরে সিলেট সদর, জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট। দক্ষিণে ফেঞ্চুগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে বিয়ানীবাজার এবং পশ্চিমে দক্ষিণ-সুরমা।

ফেঞ্চুগঞ্জের উত্তরপশ্চিমে দক্ষিণ সুরমা, উত্তরপূর্বে গোলাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে বালাগঞ্জ উপজেলা। দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণের প্রায় সমগ্রএলাকা জুড়ে অবস্থান করছে মৌলভীবাজার জেলা।

জকিগঞ্জের পূর্ব ও দক্ষিণে ভারতের আসাম প্রদেশ এবং উত্তর ও পশ্চিমে কানাইঘাট উপজেলা। পশ্চিমে অবশ্য বিয়ানীবাজারের সঙ্গেও সীমান্ত রয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে সিলেট সদর, পূর্বে গোয়াইন ঘাট এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থান।

www.pathagar.com

বিশ্বনাথ উপজেলা ৪৪.৪৪ থেকে ২৪.৫৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৩৯ থেকে ৯১.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এর উত্তরে সিলেট সদর উপজেলা, পূর্বে দক্ষিণ সুরমা, পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলা এবং দক্ষিণে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত।

বিয়ানীবাজারের উত্তরে কানাইঘাট, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের আসাম এবং পশ্চিমে গোলাপগঞ্জ উপজেলা।

জৈন্তাপুর উপজেলার উত্তরে ভারতের আসাম, দক্ষিণে গোলাপগঞ্জ, পূর্বে কানাইঘাট ও পশ্চিমে গোয়াইন ঘাট উপজেলার অবস্থান।

চৌম্বক তথ্য

(উপজেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে)

এক. সিলেট সদর

আয়তন: ৩০৯.৪১ ব.কি.মি

লোকসংখ্যা: ২,২৭, ৪৩৬

পুরুষ: ১,৩৫,৫৫৪

মহিলা: ৯১,৮৮২

থানার সংখ্যা: ৪ টি

সিটি কর্পোরেশন: ১ টি

ওয়ার্ড : ২৭ টি

ইউনিয়ন: ২৬ টি

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি: ১০৮৫৩

সিটি কর্পোরেশনের লোকসংখ্যা ২,৮৫,৩০৮

পুরুষ : ১,৫৬,০১০

মহিলা :১,২২,২১৮

কৃষিভিত্তিক তথ্যাবলি

কৃষি জমির পরিমাণ : ৩৮,৭২২ একর

প্রধান প্রধান কৃষিজাত পণ্য : ধান, চা, শাকসব্জি, কমলালেবু

আবাদি জমির পরিমাণ : ৩৪৫১১

মোট অনাবাদি জমির পরিমাণ : ৪৩৪০

বনের অধীন জমির পরিমাণ : ২০০2

চা বাগানের সংখ্যা : ৭ টি

www.pathagar.com

সরকারি কৃষি খামার ও গবেষণাগার : ০১টি
কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণাগার : ০১টি

দুই. বিশ্বনাথ

আয়তন: ২১৪.৫০ বর্গ কি.মি.
গ্রামের সংখ্যা: ৪৩৬
ইউনিয়নের সংখ্যা: ০৮
লোকসংখ্যা: ২, ৩২, ৫৭৩
পুরুষ: ১, ১৬, ৫১০
মহিলা: ১, ১৫, ৫৬৩
হিন্দু: ১০, ০৬৫
মুসলমান: ২, ২৩, ০৯৩
খ্রিষ্টান: ৩৪
বৌদ্ধ: ৭
অন্যান্য; ৭৪

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলে এতদঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ বেশ কিছু অঞ্চলের জমিদারি পান বাবু রামজীবন রায়। পরবর্তীকালে তারপুত্র বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী এতদঞ্চলের জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথের নামানুসারে ক্রমে বাজারের নাম হয় বিশ্বনাথ বাজার এবং পরে গোটা থানার নাম হয় বিশ্বনাথ থানা। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বনাথ বাজার থানা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উপজেলায় হয় উন্নীত।

হজরত শাহজালালের সঙ্গী শাহ চান্দ, শাহ কালু, শাহ কবির প্রমুখ আউলিয়াগণ এখানে বসতি গড়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

তিন. দক্ষিণ-সুরমা

আয়তন: ১৯৪.১৭ কিলোমিটার
লোকসংখ্যা: ১,৮৮,৬৭৩
পুরুষ: ৯৭,১১২
মহিলা: ৯১,৫৬১
থানার সংখ্যা: ০১ টি
ওয়ার্ড: ০২টি
ভূমি অফিস: ৩ টি

www.pathagar.com

ইউনিয়ন: ০৯ টি

গ্রাম: ৩১৭ টি

নদী:১টি (সুরমা)

রেলপথ-২৬ কি.মি।

এতিমখানা:২

ভোটার: ১,১৫,০৩৩

পুরুষ ভোটার: ৫৮,০৫০

মহিলা ভোটার: ৫৬,৯৮৩

চার. বালাগঞ্জ

আয়তন: ৩৯০ বর্গ কি.মি.

ইউনিয়নের সংখ্যা : ১৪

গ্রামের সংখ্যা : ৪৭২

লোকসংখ্যা : ২,৫৭,০৪২ জন

পুরুষ: ২০,৪৮৭ জন,

মহিলা: ১,৩৬,৫৫৫ জন

হিন্দু : ৩৬.০৭৩ জন,

মুসলমান: ২.২০,১৭৭ জন।

পাঁচ. ফেঞ্চুগঞ্জ

ফেঞ্চুগঞ্জের আয়তন ১১৪.৪৮ বর্গ কি.মি.

জনসংখ্যা: ১,৩৮,০০২

পুরুষ: ৭০,০০১

মহিলা: ৬৮,০০১

ইউনিয়ন ৫টি,

গ্রাম ৯৩টি।

ফেঞ্চুগঞ্জের চা-বাগান

চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফেঞ্চুগঞ্জ অন্যতম স্থান হিসেবে স্বীকৃত। এখানে মোমিন ছড়া, মণিপুর, মউরাপুর, উত্তর ভাগ, ঢালুছড়া প্রভৃতি চা-বাগান রয়েছে। এ সকল চা-বাগানের মানুষের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র সংস্কৃতি, ভাষা ও সম্প্রদায়।

যে সকল সম্প্রদায়ের বাস—

মোমিনছড়া চা-বাগান

সম্প্রদায়	সংখ্যা
মৃধা–	১০ পরিবার

www.pathagar.com

কসেরি বা কৈরি–	৮ পরিবার
কর্মকার–	২৮ জন
গোয়ালা–	২০ পরিবার
চাষা–	৯ পরিবার

এছাড়া মুসলমান চা-শ্রমিকের সংখ্যা জানা না গেলেও প্রায় ৫০ পরিবার রয়েছে বলে শ্রমিকগণ উল্লেখ করেছেন।

মণিপুর চা-বাগান

সম্প্রদায়	সংখ্যা
মৃধা–	১২ পরিবার
বাউরী–	৫ পরিবার
সবর–	৮ পরিবার
কর্মকার–	৬০ জন
গোয়ালা–	৪০ জন

মউরাপুর চা-বাগান

সম্প্রদায়	সংখ্যা
ঘাটুআল–	১০/১৫ পরিবার
কাশী–	৪১ জন
নাইডু–	২৩/২৪ জন
তেলেঙ্গা–	২৪/২৫ জন
ওলমী–	৭/৮ পরিবার
চাষী–	৪/৫ পরিবার

শ্রমিকের জীবন ব্যবস্থা

মোমিন ছড়া, মণিপুর, ঢালু ছড়া চা-বাগানে মাত্র ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই নিম্নমানের। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে মাধ্যমিক মান পেরুনোই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার মানুষের জীবন ব্যবস্থা অনেকাংশে মালিক-ম্যানেজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো বাবুও (কর্মচারি) অনেক সময় তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। এমনকি ছবি তুলতে পর্যন্ত কখনো কখনো বড় বাবুর অনুমতি প্রয়োজন হয়।

চা-বাগানে শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টা কাজ করে। বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতিদিন তারা পায় মাত্র ৪৮ টাকা। এ টাকা দেয়া হয় প্রতি সপ্তাহের বুধবার এবং ওই দিনকে বলে তলব্‌বার। প্রতি বৃহস্পতিবার প্রত্যেক শ্রমিককে ৩ কেজি করে আটা দেয়া হয়। এছাড়া কোনো কোনো বাগানে দুর্গাপূজার সময় বোনাস দেয়া হয়। চা-বাগানে সপ্তাহে দু'দিন *হাট* বসে। সেই দিনগুলোকে বলে বাজারবার। প্রতিটি বাগানে ১টি নির্দিষ্ট স্থানে বাজার বা হাট বসে।

www.pathagar.com

বাজারগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। অতি অল্প ও সাধারণ মানের খাদ্য সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। অধিক দামে শহরের বাজারে শ্রমিকেরা জিনিস কিনতে পারে না বলে এখানে নিম্নমানের জিনিসই তারা ক্রয় করে। দোকানগুলো বাঁশ ও খড় নির্মিত। অধিকাংশের উপরে খড় নির্মিত চাল থাকলেও তিন পাশ খোলা থাকে।

ধর্ম ও উপাসনালয়

মোমিন ছড়া

এখানে রয়েছে ১টি মন্দির, যার নাম মোমিন ছড়া সর্বজনীন পূজা মন্দির। এই মন্দিরে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে ততটা আড়ম্বরপূর্ণ হয় না। এখানকার শ্রমিকবধূরা বিপদনাশিনী ব্রত, শনিব্রত করলে এ মন্দিরে এসে পূজো দেন। পুরুষ শ্রমিকদের অনেকে অবশ্য কোনো কোনোদিন সন্ধ্যা বেলা মদ্যপ অবস্থায় এখানে এসে মাতলামি করে। মেম্বার বা পুরহিতরা তখন এদেরে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

মণ্ডপের পাশে ছোট্ট একটি নাট মন্দির আছে। এখানে কখনো কখনো দুর্গা পূজার সময় যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়।

ছয়. গোলাপগঞ্জ

আয়তন: ২৭৮.৩৪ ব. কি.মি.

গ্রামের সংখ্যা: ২৫৪

মহল্লা: ১০৮

ইউনিয়নের সংখ্যা: ১১

লোকসংখ্যা: ২,২৯,০৭৪

পুরুষ: ৫০.২৯%

মহিলা: ৪৯.৭১%

হিন্দু: ৫.২ %

মুসলমান: ৯৪.৮ %

অন্যান্য তথ্য

গোলাপগঞ্জ সিলেট জেলার অন্যতম খ্যাতনামা উপজেলা। এই উপজেলারই ঢাকাদক্ষিণে মধ্যযুগের বিস্ময়কর পুরুষ শ্রীচৈতন্যের পৈতৃক নিবাস ছিল। এখনো তাঁর বাড়িটি এখানে প্রত্যক্ষ হয়। জেলা শহর থেকে এই উপজেলার দূরত্ব ১৭ কি. মি। ১৯২২ সালে এটি থানা এবং ১৯৮৬ সালে উপজেলার মর্যাদা লাভ করে। বিস্তৃত ইতিহাস ঐতিহ্যের অধিকারী এই উপজেলায় প্রাচীনকাল থেকে সভ্য, শিক্ষিত মানুষের বাস। হযরত শাহজালালের কয়েকজন সঙ্গীও এখানে বসবাস করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। শহর ও গ্রামের যুগপৎ বৈশিষ্টসম্পন্ন এই উপজেলা এখনো বহু পর্যটকের আকর্ষণীয় স্থান।

www.pathagar.com

সাত. কানাইঘাট

আয়তন: ৪০৩.৩৯ বর্গ কি.মি.

ইউনিয়ন:০৯

গ্রাম: ৩১৩

চা-বাগান: ০৩

কৃষিভিত্তিক তথ্যাবলি

মোট জমির পরিমাণ: ৯৯,৬৩০.২৮ একর

আবাদি: ৬১,০০০ একর

অনাবাদি: ৩৮,৬৩০ একর

বন: ১৭০৭ একর

এখানে আছে-

মৎসজীবী সমবায় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, গৃহ ও ঋণদান সমবায় সমিতি, ভূমিহীন সমবায় সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, গ্রাম বহুমুখী সমবায় সমিতি, বাজার সমবায় সমিতি, কৃষক সমবায় সমিতি, বিত্তহীন সমবায় সমিতি, মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি প্রভৃতি।

এই উপজেলায় ঢেঁকির ব্যবহার নেই। যন্ত্রচালিত দুটি মেশিন আছে, যার প্রয়োজন পড়ে সে মোবাইল করলেই বাহক তার যন্ত্র নিয়ে মোবাইলকারীর দ্বারে এসে উপস্থিত হন। বাহক অর্থের বিনিময়ে মেশিন দিয়ে ধান থেকে চাল তৈরি করেন।

আট. জৈন্তাপুর

আয়তন: ১৮০.৮০ ব.কি.মি

ইউনিয়ন: ৫

গ্রাম: ১৫২

উপজাতীর সংখ্যা: সরকারি হিসেবে ২০০০, বেসরকারি ৩৫০০

উল্লেখযোগ্য চা-বাগান: চিকনাগুল, লালখান, শ্রীপুর, হাবিবানগর প্রভৃতি।

নদী : ৭ টি (সারি, কাপনা, বড়গঙ্গা, করিচ, ক্ষেপা, লাইন ও নয়াগাঙ্গ)

রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ, চা-বাগান এবং ফরেস্ট দেখতে অনেকেই এখানে আসেন। শ্রীপুর একটি মনোরম পিকনিক স্পট।

রাজ্যের ইতিহাস

জৈন্তা একসময় খাসিয়া উপজাতিদের রাজ্য ছিল। এরা মাতৃতান্ত্রিক বলে এই রাজ্য একসময় নারীরাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজ্যটি তাদেরই বংশের পুরুষ কর্তৃক শাসিত হয়।

এ বংশের নরপতিরা কালী ভক্ত ছিলেন এবং কালীপূজায় তারা নরবলি দিতেন বলে কথিত। রাজ্যের শত্রু বা অপরাধীদের তারা মা কালীর সম্মুখে বলি দিতেন বলে

www.pathagar.com

জনশ্রুতি রয়েছে। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ বর্তমান উপজেলা সদর নিজপাট ইউনিয়নে রাজধানী স্থাপন করেন।

মোট তেইশ জন খাসিয়া রাজা জৈন্তায় রাজত্ব করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সময়ে জৈন্তার সামন্ত রাজ্য গোভা'র শাসক ছত্র সিংহ চারজন ব্রিটিশ প্রজাকে ধরে নিয়ে যান। পরে তিনজনকেই কালী মন্দিরে বলি দেন। এ ঘটনার সূত্র ধরে ১৮৩৫ সালে ইংরেজরা জৈন্তা রাজ্য দখল করে নেয়। ইংরেজ সৈন্যরা রাজেন্দ্র সিংহকে বন্দী করে সিলেটের মুরারী চাঁদের বাড়িতে আটকে রাখে। আটক অবস্থায় তিনি ১৮৬১ সালে মারা যান। কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, রাজেন্দ্র সিংহের বন্ধু ছিলেন ছাতকের ব্রিটিশ কোম্পানীর মি. হ্যারি। কিন্তু ইংরেজ প্রজাদের নরবলির ঘটনায় হ্যারি প্রতিশোধ হিসেবে রাজা রাজেন্দ্রের পতনে সহযোগিতা করেন। আর এভাবেই বহু প্রাচীন এ জৈন্তা রাজ্য ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাসঙ্গিক একটি গীত নিম্নরূপঃ

'হায়রে সাহেব হ্যারি বাহাদুর
রাগের দোষে খাইলেরে সোনার জৈন্তাপুর
ছাতক থনে আইল হ্যারি যাইত বদরপুর
সিলেট আইয়া জিজ্ঞাস করে জৈন্তা কত দূর
বাত্তি গুত্তি ইন্দ্র সিংহের মুখে রেখা দাড়ি
বন্দী করিয়া থইল নিয়া মুরারি চান্দর বাড়ি।

তবে অনেকের ধারণা, বিদেশি আক্রমণকারীগণ তাদের আক্রমণকে বৈধতা দেয়ার জন্য যে সব অজুহাত তৈরি করতেন এই কাহিনি তারই একটি। পরে তা কিংবদন্তি হিসেবে লোকমুখে প্রতিষ্ঠা পায়।

নয়. গোয়াইনঘাট
লোকসংখ্যাঃ ২,৭৮,৩২৪
গ্রামের সংখ্যাঃ ১৮৪
ইউনিয়নের সংখ্যাঃ ৯

দশ. কোম্পানীগঞ্জ
লোক সংখ্যাঃ ১, ১৩, ৭৮৪
গ্রামের সংখ্যাঃ ১৪৮
ইউনিয়নের সংখ্যাঃ ৬

এগার. বিয়ানীবাজার
আয়তনঃ ২৫৩.২২ বর্গ কি.মি
ইউনিয়নঃ ১১টি

উপজেলায় *মালিকভবন* নামক ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি ভবন আছে, যা চিনের শ্রমিক কর্তৃক তৈরি। টিলা ধ্বংস না করেই এই নয়নাভিরাম দালান তৈরি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই উপজেলায় বিদ্যাদানের জন্য মিথিলা থেকে ৫জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে আনয়ন করা হয়েছিল। রাজা কর্তৃক পাঁচজনকে পাঁচখণ্ড ভূমি দান করায় এখানাকার বিশাল একটি অঞ্চলের নাম হয় পঞ্চখণ্ড। এঁদের বংশধরদের মধ্যে রঘুনাথ শিরমনি ও শ্রীবাস পণ্ডিত অন্যতম প্রসিদ্ধ। একসময় পঞ্চখণ্ড ক্ষুদ্রনবদ্বীপ নামে পরিচিতি ছিল।

বারো. জকিগঞ্জ

আয়তন: ২৭৫ ব.কি.মি

ইউনিয়ন: ৯

গ্রাম: ২৮৬

উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাকাল

গুরুসদয় উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮২
জকিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৪৮
জকিগঞ্জ সরকারী কলেজ	১৯৮৫

ঙ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে চীনের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ উক্ত রাজ্যের রাজা ভাস্কর বর্মার আমন্ত্রণে সেখানে গমন পূর্বক সিলেটসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন (৭ম শতাব্দী) রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলে এবং পরবর্তীকালে তাঁর রচনাতে তা ব্যক্ত করলে আমরা প্রাচীন সিলেট সম্পর্কে ধারণা পাই।[১৩] তিনি অবশ্য হর্ষ বর্ধনের রাজত্বকালে খ্রিষ্টিয় ৬৩০ সালে ভারত বর্ষে আগমন করেন এবং ৬৪৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেন। তবে সিলেট যে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে কামরূপের আর্যায়িত মঙ্গোলীয় বর্মণ বংশীয় রাজা ভূতি বর্মণ বা মহাভূত বর্মণের (ভাস্কর বর্মণের প্রপিতামহ) অধীন ছিল, তা আমরা কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার *নিধনপুর* তাম্রফলক থেকে পরিজ্ঞাত হই। অবশ্য 'Civilization in Ancient India' এবং *জাতিতত্ত্ববারিধি* গ্রন্থেও এ বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদি উদ্ধৃত হয়েছে।[১৪]

হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে কামরূপ রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাতে দেখা যায় রাজ্যের তৎকালীন অধিপতি হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। তারা বৌদ্ধের অহিংস নীতির প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তবে ওই সময় কামরূপে কোনো বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি।

মধ্যযুগে রাজাগণ ব্রাহ্মণদের ভুমি দান পূর্বক সেদেশে তাদের স্থায়ী আবাসনে আকৃষ্ট করতেন। সিলেটের শাসকগণও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেননা। শ্রীহট্ট নরপতি কেশব দেব ব্রাহ্মণদের যেসব অঞ্চল দান করেছিলেন তার মধ্যে ভাটপাড়া, বড়গ্রাম, মহূরাপুর, ইটাখোলা,* বরপঞ্চাল (বরমচাল), আমতলী, সিংউর (সিঙ্গুর), গুড়াবয়ি, আখালিকুল, ইন্দায়িনগর (ইন্দানগর), শুঘর (সুঘর), করগ্রাম, কাটাখাল, সালাচাপাড়া

www.pathagar.com

প্রভৃতি অন্যতম। এসব অঞ্চলের অধিকাংশই বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলা থেকে শুরু করে হবিগঞ্জ জেলা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অবশ্য কাটাকাল ও সালচাপাড়া নামক যে দুটি স্থানের নাম এ অংশে উদ্ধৃত হয়েছে, তা বর্তমানে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের কাছাড় জেলার অন্তর্গত। দানকৃত ভূমির বিস্তৃত রূপ থেকেও শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিশালতা সম্পর্কে আমরা হতে পারি অবহিত।

তাম্রলিপি সূত্রে সিলেটের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তা খুবই সন্তোষজনক। ওই সব তাম্রলিপিতে শাসকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাশাপাশি তাদের পূর্বপুরুষের নাম এবং উজ্জ্বল কর্মকাণ্ডের বিবরণ হয়েছে প্রকাশিত। উল্লেখ্য, প্রথম তাম্রশাসনটি রাজা গোবিন্দ কেশব দেব এবং দ্বিতীয়টি তাঁর তৃতীয় পুত্র ঈশান দেবের হওয়া সত্ত্বেও একই বংশের পূর্ববর্তী শাসকগণের শৌর্য-বীর্য- মহত্ত্বের কথা এগুলোতে হয়েছে বর্ণিত।

উপরে উদ্ধৃত তাম্রশাসনসমূহে রাজাদের পদাতি, তরঙ্গ, হস্তী ও রথ সংযুক্ত চতুরঙ্গ বাহিনী এবং অসংখ্য রণতরীর (নৌকাবাটক) উল্লেখ বর্তমান। এতদ্ব্যতীত রাজা কেশব দেব কর্তৃক রাজধানীতে নির্মিত কংসনিসূদনের (শ্রীকৃষ্ণের) একটি সুউচ্চ প্রস্তর মন্দির ও রাজা ঈশান দেব কর্তৃক মধুকৈটভারির অভ্রভেদী প্রাসাদ মন্দিরের চমৎকার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এতে উপস্থাপিত। ব্রাহ্মণ ও গুণী ব্যক্তিদের প্রতি যে রাজাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, উক্ত তাম্রশাসনে তারও স্পষ্ট নিদর্শন উদ্ধৃত হয়েছে। লক্ষ করা গেছে, রাজাগণ ব্রাহ্মণদের শুধু ভূমি প্রদান করেই তৃপ্ত বোধ করেননি, এদেশে তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসে আকৃষ্ট করার জন্য তুলাপুরুষদান (বিদ্বান ব্রাহ্মণদের রাজার সম ওজনের সুবর্ণালঙ্কার প্রদান) যজ্ঞও সম্পন্ন করেছেন। তাদের প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়। কেশব দেবের শ্রবণাভিরাম গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সিলেটে স্থায়ী হতে শুরু করেন।

শ্রীহট্ট নৃপতিদের উপর্যুক্ত গুণাবলির পাশাপাশি আর যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে সেই সময়কার স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার চেয়ে সিলেটের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ যে অনেক বেশি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ ছিল, তাম্রশাসনে বর্ণিত কয়েক প্রজন্ম ব্যাপ্ত একটি স্থায়ী রাজবংশই এ তথ্য প্রমাণ করে।

বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক কমলাকান্ত গুপ্ত শ্রীহট্টের রাজবংশের একটি ভিন্ন তালিকা উপস্থাপন করেন।[১৫] তাঁর মতে, তিব্বত থেকে আগত *কৃষক* নামক রাজা উক্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্রের নাম হাটক এবং নাতি গুহক। এই গুহকই কুলদেবতা কংসনিসূদনের প্রতিস্থাপক। গুহক রাজার পুত্র ছিলেন তিনজন: গুড়ক, লড্ডুক ও জয়ন্তক। এদের নামে পরবর্তীতে সেখানে গৌড়, লাউড় ও জৈন্তা নামক তিনটি রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে।

রাজা গুড়কের পুত্রের নাম শ্রীহস্ত। তিনি ত্রিপুরার অধিবাসীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীহস্তের পুত্র কীর্তিপাল; তবে এরপর চারপুরুষের নাম অজ্ঞাত। পঞ্চম পুরুষ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় ভূতবিক্রবন্তদেবের নাম। তিনি নির্বাক ছিলেন বিধায় দেবাধিষ্ঠিত দেহ অভিমানে *দেব* উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র নবীন

www.pathagar.com

গীর্ব্বন্ত বা নবগীর্ব্বন্ত বা নবগীর্বান। পিতার ন্যায় নির্বাক নয় বিধায় তিনি নবীন গীর্ব্বন্ত। গোকুল কিশোর নবগীর্বান এর পুত্র এবং গোকুল কিশোরের পুত্র নবনারায়ণ। এরপর নবনারায়ণের পুত্ররূপে পাওয়া যায় গোবিন্দরণ কেশব দেবের নাম।

মধ্যযুগে এই অঞ্চল তিনটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা- লাউর, গৌড় ও জৈন্তা। তবে ইটা, তরফ এবং বানিয়াচং নামে আরো তিনটি সামন্ত রাজ্য এখানে ছিল বলে জানা যায়।

সিলেট সদরসহ এ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জের কিয়দংশকে কেন্দ্র করে গৌড় রাজ্য গঠিত ছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের (১২০১ খ্রিঃ) একশত বৎসর পর (১৩০৩ খ্রিঃ) হযরত শাহ জালালের সহায়তায় সিকান্দার গাজী গৌড় জয় করেন। তিনি গৌড়ের রাজা গোবিন্দকে পরাজিত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

লাউড় রাজ্য গঠিত ছিল প্রায় সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা এবং হবিগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বেশ কিছু অংশ নিয়ে। সাহিত্য সংস্কৃতির জন্য এ রাজ্যের রয়েছে ব্যাপক খ্যাতি। আলোচ্য লোকসাহিত্য তো বটেই, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য, বাউল-পদাবলী-মুর্শিদি এবং গীতিকা সাহিত্যেরও অধিকাংশ এতদঞ্চলের সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ তদীয় মন্ত্রী কুবেরাচার্যের পুত্র বৈষ্ণব সাধক অদ্বৈতাচার্যের নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তখন তার নাম হয় লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। তিনি সংস্কৃত ভাষায় *বাল্যলীলা সূত্রম্* গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে জৈন্তা রাজ্যের ব্যাপ্তি। একদা সিলেটের উত্তরাংশের সমতলভূমি, জৈন্তা পাহাড় এবং আসামের নওগাঁ জেলার অংশ বিশেষও জৈন্তা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। বাঙালি হিন্দু রাজাগণ ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। এরপর তিব্বত থেকে আগত খাসিয়ারাজ কর্তৃক রাজ্যটি অধিকৃত হয়। রাজা জয়ন্ত রায়ের (রাজত্বকাল ১৫০০-১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) পর খাসিয়া রাজবংশ দীর্ঘকাল এতদঞ্চলে রাজত্ব করেন। ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) তারাই এ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন।

ত্রিপুরার সামন্তরাজ্য *ইটা* সম্পর্কে তেমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য উৎঘাটিত না হলেও একটি দানপত্রের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায় যে, মৌলভীবাজার জেলার ইটা, বরমচাল ইন্দানভার, ইন্দেশ্বর, শমসের নগর প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে এ রাজ্যের বিস্তৃতি। ত্রিপুরারাজ ধর্মধর ১১৯৫ সনে দ্বিজনিধিপতিকে উক্ত জনপদ দান করেছিলেন। দ্বিজনিধিপতির উত্তরপুরুষ ভানু নারায়ণের (১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ) সময় পার্শ্ববর্তী ভানুগাছ অঞ্চলের সামন্তরাজ চন্দ্রসেন বিদ্রোহী হন। ভানু নারায়ণ তাকে বন্দি করে ত্রিপুরা রাজ বিজয় মানিক্যের হস্তে সমর্পণ করলে বিজয় স্বস্তি বোধ করেন। শুধু তাই নয়, ফল স্বরূপ ভানুগাছের দায়িত্বও ভানু নারায়ণের নিকট অর্পিত হয়। সুবিদ নারায়ণ উক্ত রাজ বংশের শেষ রাজা। তিনি ১৫৯৮ সনে খাজা ওসমান খান লোহানী নামক এক পাঠান

www.pathagar.com

কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। তাঁর চারপুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পরিবারের মহিলা সদস্যদের প্রায় সকলেই আত্মাহুতি দেন। খাজা ওসমান তেরো বৎসর উক্ত রাজ্য শাসন করেন।

তরফও ত্রিপুরার অধীন একটি সামন্ত রাজ্য। প্রায় সমগ্র হবিগঞ্জ জেলা নিয়ে এ রাজ্যের ব্যাপ্তি। হযরত শাহ্ জালালের সিলেট বিজয়ের অল্প কিছুদিন পর (আনুমানিক ১৩০৪ সন) তাঁর কয়েকজন আউলিয়ার সহায়তায় সিপাহসালার নাসির উদ্দিন উক্ত রাজ্য জয় করেন। এ রাজ্যের রাজা আচাক নারায়ণ লক্ষণ সেনের মতই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রাম বলে কথিত হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং একদা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেশব মিশ্র ছিলেন উক্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা এবং কয়েক প্রজন্ম যাবৎ কৃতিত্বের সঙ্গে এঁরা রাজ্য পরিচালনা করেন। কাণ্যকুব্জ থেকে আগত কাত্যায়ণ গোত্রীয় এই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে চতুর্থ বংশীয় রাজা পদ্মনাভ সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি দান, বিদ্যানুরাগ, পরাক্রম প্রভৃতি সৎ গুণের কারণে *কর্ণ খাঁ* উপাধিতে সম্মানিত হন। এই রাজবংশ অবশ্য দক্ষিণ ভারত থেকেও অনেক বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করে বানিয়াচঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন।

উল্লিখিত হয়েছে, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ৮ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বৃটিশ শাসনের অধীন আসে। এরপর ক্রমান্বয়ে তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে অবশ্য সিলেটের জন্য গণভোটের প্রয়োজন পড়ে। তৎকালে হিন্দুর সংখ্যা অধিক হলেও ভূখণ্ডটি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। ওই সময় চা-শ্রমিকদের ভোটাধিকার না থাকা এর একটি অন্যতম কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।

সিলেট জেলা বর্তমানে ১২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। যথা-

১. সদর সিলেট, ২. দক্ষিণ-সুরমা, ৩. বালাগঞ্জ, ৪. ফেঞ্চুগঞ্জ, ৫. গোলাপগঞ্জ ৬. বিয়ানি বাজার, ৭. বিশ্বনাথ, ৮. কোম্পানীগঞ্জ, ৯. গোয়াইনঘাট, ১০. কানাইঘাট, ১১. জৈন্তাপুর, ১২. জকিগঞ্জ।

চ. জনবসতির পরিচয়

নৃতত্ত্বঃ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এতদঞ্চলের মূল ধারার মানুষ মিশ্র বা সংকর। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোথাও কোথাও অস্ট্রোলয়েড প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও মঙ্গোলয়েড প্রাধান্যও উল্লেখ করার মতো। অর্থাৎ মূলত মঙ্গোলয়েড ও আদি-অস্ট্রোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর মিশ্রণেই এতদঞ্চলের মানুষের নৃ-বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য ভূ-মধ্যসাগরীয় প্রাধান্যও চোখে পড়ার মতো। 'অস্ট্রোলয়েডগণ আফ্রিকা থেকে বহু প্রজন্মেও চেষ্টায় ভারত তথা বাংলায় আসতেই পারে, তবে ভারতবর্ষের মানুষের পূববর্তী স্তর অর্থাৎ নরবানর বা তারও আগেকার কোনো ক্ষুদ্র প্রাণি বা প্রাণকণা, ভারতবর্ষ তার পূববর্তী অবস্থানে (আফ্রিকা)

www.pathagar.com

থাকাকালেই জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে ভূখণ্ডটি বর্তমান স্থানে আসার সময় সেগুলোকেও (আদি-অস্ট্রোলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়দের পূর্বসূরি প্রাণকণা) সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ওইগুলোই পরবর্তীকালে বিবর্তনের মাধমে ভারতে অস্ট্রোলয়েড ও ভূ-মধ্যসাগরীয় মানুষের উৎপত্তি ঘটিয়েছে'।[১৬]

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের দিনাজপুর-রংপুর-ময়মনসিংহ-সিলেট, ভারতের আসাম ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-পার্বত্যচট্টগ্রামের উঁচু ভূমি ছিল একসময় বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড। পরবর্তীকালে হিমালয়ের পলি পতিত হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম দান করে। যেহেতু বাংলাদেশের (বিশেষত সিলেটের) উত্তর ও পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মঙ্গোলয়েডদের অবস্থান, তাই নব্য ভূখণ্ডে মঙ্গোলয়েডদের আগমন ঘটাও খুব সহজেই সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট তথা সমগ্র বাংলার নৃ-বৈশিষ্ট্যে তাই অস্ট্রোলয়েড ও মঙ্গোলয়েডদের মিশ্রণ প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ধর্ম ও সমাজ: সিলেট জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্নিদের সংখ্যা অধিক। অল্পসংখ্যক শিয়া এবং সুফি প্রভাবিত মুসলিমও এতদঞ্চলে দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে শূদ্রদের সংখ্যা অধিক, ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ও আছেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

বর্ণ বিভাজন ছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে আরো কিছু বিভাজন রয়েছে। যেমনঃ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব। তন্মধ্যে বৈষ্ণবদের সংখ্যা অনেক বেশি। শাক্ত প্রভাবিত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব প্রভাবিত শাক্তও এখানে দৃষ্টি গোচর হয়।

কানাইঘাটের জনগণ অতিমাত্রায় ধার্মিক ও রক্ষণশীল। এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অন্যান্য উপজেলার চেয়ে কম।

খামার/গৃহপালিত পশুপাখি: উল্লেখযোগ্য কোনো খামার এতদঞ্চলে নেই। তবে গ্রামে অনেকের বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল প্রত্যক্ষ করা গেছে। এখানে গৃহপালিত ভেড়ার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কেউ কেউ শখ করে ময়না এবং টিয়া পাখি পোষেণ। তবে এর সংখ্যা কম। সিলেট শহরের হাওয়লদার পাড়ার নিম্নবিত্ত অধ্যুষিত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাঁস-মুরগি-ছাগল বর্তমান। শহরে পশু হাসপাতাল থাকায় অনেকে এ থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। করের পাড়া অঞ্চলে গৃহপালিত কুকুরের সংখ্যা অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যক্ষ হয়।

কানাইঘাটে প্রচুর ঘোড়া আছে। অনেকেই সেখানে একাধিক ঘোড়া পোষেণ। মহিষও আছে অনেকের বাড়িতে। রাজ হাঁস, মুরগি এবং পাতিহাঁসের সংখ্যাও প্রচুর। ঘোড়া থাকার কারণে এখানে মাঝে মাঝে ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট শহরের বিত্তবানদের কেউ কেউ শখ করে ঘোড়া পোষেণ।

গৃহ

সিলেটের অধিকাংশ উপজেলা প্রবাসী অধ্যুষিত। প্রায় সকল বাড়িরই এক বা একাধিক লোক প্রবাসে অবস্থান করছেন। ফলে এসব উপজেলায় খড় নির্মিত ঘর খুব একটা দেখা যায়না। পাকা বাড়ি তো বটেই, বহুতল ভবনও অনেকেই তৈরি করেছেন। আধা পাকা ঘর-বাড়ির সংখ্যাও অবশ্য উল্লেখ করার মতো। মাটির ঘরগুলো বাঁশের খাপের উপর মাটির আস্তর দিয়ে তৈরি।

www.pathagar.com

প্রতিটি বাড়ির রান্না ঘর আলাদা। বাড়ির পাশেই একটি ছোট্ট খুপরির মতো ঘর থাকে যাতে রান্না-বান্নার কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনেক বিত্তবানের পাকা বাড়িতেও রান্নাঘরটি নির্মিত হয় মাটি কর্তৃক।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে পূর্ব দিকে একটি পৃথক ঘর থাকে। অপরিচিতি, স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিদেরে সেখানে আপ্যায়ন করা হয়। এরা বাড়ির উত্তর-পূর্ব সীমানা ঘেষে ঠাকুর-ঘর নির্মাণ করেন।

প্রায় প্রতিটি বাড়িরই রয়েছে একটি করে পুকুর যাতে নিত্যদিনকার ধোয়া মোছার কাজ করা হয়। অধিকাংশ বাড়িতে রয়েছে গরু কিংবা মহিষ। এদের জন্য রয়েছে গোয়ালঘর। গোয়ালঘর প্রতিটি বাড়িতেই মাটির তৈরি।

গোলাপগঞ্জের কিছু কিছু গ্রামে মাটির তৈরি ঘর দেখা যায়। এদের রান্না ঘর, বাড়ির প্রধান ঘর থেকে আলাদা অবস্থানে নির্মিত। এছাড়া প্রায় প্রত্যেক বাড়ি মূল গেট থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত থাকে। গেটের পাশে একটি স্বতন্ত্র ঘর দেখা যায়, এখানে জমি বা চাষাবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে একটি ঠাকুরঘর থাকে। এই ঘরটিও মূল বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত হয়। সচরাচর পূর্ব বা উত্তর দিকে এই ঘর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন সকাল বা দুপুরে স্নান সমাপনের পর গৃহবধূরা এখানে এসে দেবতা পূজা করেন এবং সন্ধ্যায় প্রজ্বলিত করেন ধূপ।

অনেক হিন্দু বাড়িতে ইট-সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত একটি মনোরম তুলসী বেদী প্রত্যক্ষ হয়েছে।

সিলেটে অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বাস। এদের মধ্যে চা-শ্রমিক ও সাঁওতাল ব্যতীত আর সকলেই মঙ্গোলয়েড শ্রেণিভুক্ত। চা-শ্রমিকদের মধ্যে রেড-ইন্ডিয়ান বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল।

সিলেটের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য

সিলেট শহর ও তার আশেপাশে অনেক নৃগোষ্ঠীর বসবাস। নিম্নে তাদের সংস্কৃতি ও জনজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার পাশাপাশি নাথ সম্প্রদায় সম্পর্কেও আলোচনা করা হলো।

১. মণিপুরি

মণিপুরি সম্প্রদায় বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ ও পাঙ্গাল এ তিন শাখায় বিভক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ সম্প্রদায় সনাতন কিন্তু পাঙ্গালরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

মৈতৈ মূলত মঙ্গোলয়েড বংশোদ্ভূত এবং তাদের ভাষা তিববত-চীনা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়াদের মধ্যে ভারতীয় নৃ ও ভাষার প্রভাব ব্যাপক। উভয় সমাজই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রধাণত এই দুই ভাগে বিভক্ত। এদের প্রায় সকলেই বৈষ্ণব।

সিলেট শহরের মণিপুরি রাজবাড়ি, লামাবাজার, সুবিদ বাজার, সাগর দীঘির পাড়, শিবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসবাস।

www.pathagar.com

সিলেটে বসবাসরত মণিপুরিদের আদি নিবাস ভারতের উত্তর-পূর্ব মণিপুর রাজ্য। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাসহ সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, ভানুগাছ এবং সিলেট শহরে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। বার্মিজ আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে তারা সিলেট আগমন করেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। অবশ্য কেউ কেউ বৃটিশ আক্রমণের কারণে মণিপুর থেকে তারা সিলেট আগমন করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

সিলেট শহরে বসতি

সিলেট শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় মণিপুরিগণ বসবাস করেন। তবে রাজবাড়ি, লামাবাজার, লালদিঘির পাড়, কেওয়াপাড়া, নরসিংটিলা, বাগবাড়ি, সাগর দিঘির পাড়, সুবিদ বাজার, আম্বর খানা, গোয়াইপাড়া, শিবগঞ্জ, মাছিমপুর এলাকায় মণিপুরিদের বসবাস অপেক্ষাকৃত অধিক।

লোকসংখ্যা: ১০,০০০-১৫,০০০

পেশা : প্রধানত সোনা-রূপার অলংকার তৈরি, মটর ও গাড়ি মেরামত এবং ফটোগ্রাফি। কেউ কেউ সংগীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণে নিয়োজিত আছেন।

মেয়েদের হস্তশিল্প নির্মাণ প্রধান পেশা।

বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করতে সমস্যা হতো বিধায় অনেকদিন তারা মূল পড়াশুনা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে বর্তমানে এরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক অগ্রসর। বর্তমানে তারা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকুরিতে (পেশায়) নিয়োজিত।

খাদ্যাভ্যাস

মণিপুরিরা মূলত নিরামিষাশি হলেও বর্তমানে তারা বাঙালি খাবারেও অভ্যস্থ। মণিপুরিদের বিশেষ একটি খাদ্যের নাম পাল্টই, সিদল শুটকি ও আলু দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

মৃত্যুর পর মণিপুরিদের কেউ কেউ মৃতদেহকে দাহ এবং কেউ কেউ সমাধিস্থ করেন।

পোশাক

মণিপুরি মহিলাগণ সচরাচর *ইন্নাফি* ও *ফানেক* পরিধান করেন। ইন্নাফি ওড়না জাতীয়, এটি থাকে উপরে, আর ফানেক পেটিকোটের ন্যায়, এটি থাকে নিচে অর্থাৎ কোমরে। পুরুষরা অনুষ্ঠান হলে ধুতি-পাঞ্জাবি নতুবা অন্যান্যদের মতো শার্ট-গেঞ্জি পরিধান করেন। কিশোরী যুবারা বর্তমানে বাঙালিদের মতো জামা-শাড়ি পরিধান করছে।

হস্তশিল্প

মণিপুরিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পে পারদর্শী। তাঁতযন্ত্র 'ইয়োংখাম' ও 'পাংয়োং' দিয়ে মনিপুরি মেয়েরা চাদর, স্কার্ফ, বিছানার চাদর, শাড়ি, বেড-কভার,জাল ইত্যাদি বানিয়ে থাকে। তবে তাদের শীত বস্ত্রের নাম *লাশিং ঙারোং*।

www.pathagar.com

ক্রীড়া

মণিপুরিদের বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র ক্রীড়া বর্তমান। এদের মধ্যে শাগোল কাং জৈ, যুক্ত শানাবা, কাং শানাবা, থোড়ি চিংবা অন্যতম। শাগোল কাং জৈ থেকে পলো খেলার উৎপত্তি বলে তাদের দাবি।

সাহিত্য চর্চা

বাংলা ও মণিপুরি উভয় ভাষাতেই মণিপুরিরা সাহিত্য চর্চা করেন। মৈরা নামে তাঁদের একটি সাহিত্য সংসদ রয়েছে। কবি এ. কে, শেরাম এটি সম্পাদনা করেন।

সংগীত ও নৃত্য

মণিপুরিদের সংগীত নৃত্য অতি উঁচু মান সম্পন্ন। তবে এঁরা বাংলা গানও ভাল করে থাকেন। রানা কুমার সিংহ দীর্ঘদিন যাবৎ সিলেটের রবীন্দ্র সংগীত অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের বিশেষ মান সম্পন্ন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। *আনন্দলোক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান* নামে তাঁর একটি সংগীত বিদ্যালয় আছে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এ. কে. শেরাম এর কন্যা শানারৈ শানৈ চ্যানেল আই প্রযোজিত প্রথম লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী। বিষ্ণুপ্রিয়াদের মধ্যে অনিতা সিন্‌হা প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী। তিনি সিলেটের অপর প্রখ্যাত শিল্পী হিমাংশু বিশ্বাসের সহধর্মিণী। তাঁদের একমাত্র সন্তান পিংকি বিশ্বাসও সংগীত শিল্পী। তিনি প্রথম লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরীদের মধ্যে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

অন্যান্য সংগীত শিল্পী : কে মুখমনি সিংহ ,বিনোদ সিংহ (প্রয়াত), কামেশ্বর সিংহ, রানা কুমার সিংহ, অনুপ কুমার সিংহ প্রমুখ।

মণিপুরি নৃত্য উপমহাদেশে বিখ্যাত। বাংলাদেশে মণিপুরী নৃত্যকে মঞ্চে নিয়ে আসেন ওস্তাদ ব্রজধন সিংহ। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শোভারানী দেবী, বিলাসিনী দেবী, চন্দ্রা দেবী, মঙাং লৈমা, শানারৈ ও শান্তনা দেবী। শান্তনা দেবী বয়সে নবীন হলেও তার অনেক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান।

প্রধান উৎসব

মণিপুরিরা বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁরা তাদের প্রাচীন ধর্মকর্মও পালন করেন। রাস-পূর্ণিমা, রথ-যাত্রা, ঝুলন ইত্যাদি তাদের প্রধান উৎসব। 'শাজিবু উৎসব' নামে তাদের আরেকটি বড় উৎসব রয়েছে।

বিয়ে

বিয়ের সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা লেহেঙ্গা জাতীয় এক ধরনের পোশাক পরেন। এ পোশাক তারা কেবল মাত্র বিয়ের সময়ই পরিধান করেন।

www.pathagar.com

সাত পাক

বিয়ের সময় মেয়েরা নেচে নেচে সাত পাক দেয়। এ সময় কনের হাতে একটি গ্লাস থাকে। গ্লাসে সাদা ফুল থাকে। প্রতি পাকে বরের মাথায় ফুল প্রদান করতে হয়। সাত পাক এর পর পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিয়ে পড়ান।

বিয়েতে আগত অতিথিদের বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। বিয়ের পরের দিন খুব ভোরে বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ি চলে যান।

তবে বর্তমানে আধুনিক মণিপুরিরা বাঙালিদের মতোই ভোজের আয়োজন করেন।

প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ মনিপুরী সাহিত্য সংসদ (১৯৭৪), বাংলাদেশ মণিপুরী মহিলা সমিতি (১৯৭৬), বাংলাদেশ মণিপুরি যুব সমিতি (১৯৭৮), বাংলাদেশ মণিপুরি ছাত্র সমিতি (১৯৮৪) প্রভৃতি।

২. পাত্র

এরাও মঙ্গোলয়েড বংশোদ্ভূত। টিপরাদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য রয়েছে। এরা নিজেদের সিলেটের প্রাচীন অধিবাসী বলে দাবি করেন এবং রাজা গৌড় গোবিন্দকে পূর্বসূরি বলে মনে করেন। সিলেট সদর উপজেলার ৩নং খাদিমনগর ইউনিয়নের রাখালগুল, আলাইরবহর, ফড়িংউরা এবং সীমার বাজার এলাকায় বেশ কিছু পাত্র সম্প্রদায়ের বাস।

এদের কেবল নিজস্ব ভাষা-ই নয়, নিজস্ব সংস্কৃতিও বর্তমান। তবে তাঁরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। শিক্ষাদীক্ষায় পাত্র সম্প্রদায় বর্তমানে অগ্রসর হচ্ছেন। আলাইবহর গ্রামে সম্প্রতি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের নাম *শরৎপাত্র আলাইবহর প্রাথমিক বিদ্যালয়*। এদের অধিকাংশ রামকৃষ্ণ মিশনের অনুসারী।

পদবি

পাত্র সম্প্রদায় কোন কোন ক্ষেত্রে 'পাতর' হিসেবে পরিচিত। সম্ভবত অঙ্গারিক কয়লা তৈরি করতেন বলে তাদের 'পাথর' বলা হতো, যা অপভ্রংশ হয়ে 'পাতর' হয়েছে। সিলেটে স্থানীয়ভাবে জমির দলিলপত্রে তাদের 'পাথর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পাত্রদের নিকট তাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয় হল 'লালেং'। এর অর্থ হল 'পাত্র'।

পাত্র সম্প্রদায় তাদের নামের শেষে পদবি হিসেবে 'পাত্র' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে শিক্ষিত কিছু পাত্র তাদের নামের শেষে 'মহাপাত্র' শব্দ পদবি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি তারা সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের সভাসদ তাই তারা পাত্র নয় 'মহাপাত্র'। পাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচয় দেয়। মহাপাত্রদের অধিকাংশ আলাইবহর গ্রামের বাসিন্দা।

www.pathagar.com

বর্তমানে পাত্রদের গ্রামের সংখ্যা ২৩টি হলেও জানা যায় অতীতে এর সংখ্যা ছিল আরও বেশি। বিভিন্ন কারণে পাত্রদের গ্রামের সংখ্যা হ্রাস পায়। কুয়ারমাটি, উত্তরকাছ, ভবানীগুল, বটেশ্বর, সিদাইগুল, মোকামবাড়ী, সালুটিকর, কালাগুল ইত্যাদি গ্রামসমূহে পাত্র সম্প্রদায়ের অবস্থান পূর্বে থাকলেও বর্তমানে পাত্র বসতি নেই বললেই চলে।

পাত্রদের মতে, পূর্বে তাদের গ্রামগুলো ছিল সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অর্থাৎ কেবলমাত্র পাত্র সম্প্রদায়ই এসব গ্রামে বাস করত। কিন্তু কালক্রমে এসব গ্রামে বাঙালিদের বসবাস শুরু হয়।

পাত্র পরিবারের শিশুরা পড়াশোনা না করে ছাগল ও ভেড়া চড়ায়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে পাত্র পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে উৎপাদনমূলক কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকতে হয় বছরের প্রায় সকল সময়।

তবে পাত্রদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারও রয়েছে। এদের সংখ্যা খুবই কম। পাত্রদের মধ্যে কয়েকজন প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরিতে নিয়োজিত। তাদের সংখ্যাও হাতে গোনা।

পেশা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাত্র সম্প্রদায় বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব ও ক্ষয়িষ্ণু। অতীতে শিকার ও পাহাড় এলাকায় আবাদি জমি চাষাবাদকরে সম্ভবত এরা সচ্ছল জীবনযাপন করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে চায়ের চাষ ও চা শিল্পের সূচনা হলে পাত্রদের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা হয়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, খাদিমনগর টিলা এলাকার গ্রামগুলোর জমিসমূহ ছিল পাত্রদের নিয়ন্ত্রনাধীন। কিন্তু চায়ের চাষ তাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। আবার সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাদের করে বিপর্যস্ত এবং বর্তমানে তাদের অধিকাংশই নিঃস্ব, দরিদ্র ও মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

পাত্র সম্প্রদায়ের অতীত পেশা ছিল শিকার, অঙ্গারিক কয়লা তৈরি, সীমিত আকারে চাষাবাদ ও 'মোয়ালি'। 'মোয়ালি' এক প্রকার মাদক যা গরুর দুধ বৃদ্ধির জন্য গরুকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু কালক্রমে মোয়ালি তৈরির কাজও বন্ধ হয়ে যায়। পাত্র সম্প্রদায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল অঙ্গারিক কয়লা প্রস্তুত করা। স্বর্ণকার, কর্মকার ও হোটেলগুলোতে এই অঙ্গারিক কয়লা সরবরাহ করতেন তারা। অঙ্গারিক কয়লা তৈরির জন্য পাত্ররা পাহাড়ের বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে তৈরিকৃত গর্তে তা পুড়াতেন। উল্লেখ্য, কয়লা তৈরি করার জন্য পাত্র সম্প্রদায় দলবদ্ধভাবে পাহাড়ে গমন করলেও কাঠ সংগ্রহ ও কয়লা তৈরি ব্যক্তিগতভাবে করতেন। ফলে কয়লা বিক্রয়ের অর্থ ব্যক্তিগতভাবেই লভ্য হতো। কয়লা তৈরির কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং নোংরা হওয়া সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য অন্য পেশা না থাকায় পাত্ররা পৈতৃক পেশা গ্রহণ করেন। তবে সিলেটে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে অঙ্গারিক কয়লার চাহিদা কমে যেতে থাকে। এছাড়া পাহাড়ের বনজঙ্গল হ্রাস পাবার ফলে পাত্ররা আগের মত কাঠ সংগ্রহ ও অঙ্গারিক কয়লা প্রস্তুত করতে পারেননা।

www.pathagar.com

পেশাগত অন্যান্য দিক

পাত্র সম্প্রদায় মাছ ধরলে তা বিক্রি না করে পরিবারের ভোগের জন্য ব্যবহার করেন। তাদের মতে মাছ বিক্রি তাদের পেশা নয়। তবে পূজা পার্বণে পাত্ররা উচ্ছো চাট দিয়ে ছড়া ও নালা থেকে মাছ ধরেন। কারণ বড়শির মাছ দেবতাকে উৎসর্গ করা যায়না।

পাত্র সম্প্রদায় চা বাগানের কাজ করেননা। তারা চা বাগানের কাজ করাকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। পাত্রদের ধারণা, যেসব বিদেশি তাদের সর্বনাশ করেছে তন্মধ্যে ইংরেজরাও আছে। তাই তাদের তৈরি চা-বাগানে কাজ করাকে তারা অসম্মানজনক মনে করেন। চা বাগানের ফলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও কষ্টের চিহ্ন স্পষ্ট।

পাত্রদের মধ্যে বহুসংখ্যক দিনমজুরের কাজ করেন। পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বর্গাচাষী হিসাবেও কাজ করেন, যদিও বর্গাচাষের জন্য গরু এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে বর্গাচাষ করা তাদের জন্য কষ্টকর।[১৭]

৩. খাসিয়া

কারো কারো মতে খাসিয়াগণ বহিরাগত। চিনের পার্বত্য অঞ্চল ছিল এদের প্রাচীন বাসস্থান। পরবর্তীতে হুয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীপথে এরা ভারত হয়ে সিলেট আগমন করে। অন্যমতে এরা মায়ানমার থেকে সিলেট আসেন। খাসিয়াদের দাবি এরা এখানকার আদিম অধিবাসী। অন্যান্য মঙ্গোলয়েড যেমন পাত্ররাও নিজেদেরে এখানকার আদিম অধিবাসী বলে দাবি করেন। তাদের দাবি অবশ্য হালকাভাবে উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উৎপত্তি এবং বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিলে এই দাবির আংশিক সত্যতা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

খাসিয়াগণ মাতৃতান্ত্রিক। তাদের মেয়েরা একাধিক স্বামী রাখতে পারে। গোত্র মায়ের নামে হয়। বিয়ের পর খাসিয়া পুরুষগণ স্ত্রীর ঘরে বসবাস করে।

ধর্মের দিক থেকে এরা মূলত খ্রিষ্টান এবং এদের অনেকে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী।

খাসিয়াদের কেউ কেউ প্রাচীন ধর্মমতে আস্থাশীল। তাদের এই ধর্মের সম্ভবত কোনো নাম নেই। তবে কেউ কেউ জেনটিল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই মতে তারা নানা দেব দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। এদের কেউ কেউ হিন্দু ধর্মেরও অনুসারী।

খাসিয়াদের অনেকে ইংরেজি ভাষায় কথা বললেও তাদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। তবে এই ভাষা তারা লিখে প্রকাশ করতে পারেন না। মূলত খ্রিষ্টানগণ ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। এরা একসময় গাছের উঁচু ডালে বাসা বাঁধলেও বর্তমানে মাটি থেকে খানিকটা উপরে গাছের শাখা দ্বারা নির্মিত ভিত্তির উপর কাঠ বা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি বাসস্থানে তাঁরা বসবাস করেন।

সিলেটের জাফলং, তামাবিল, ডাউকি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক খাসিয়ার বাস।

৪. অন্যান্য নৃগোষ্ঠী

গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে মঙ্গোলয়েড এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে অস্ট্রোলয়েড ও রেডইন্ডিয়ান বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। চা-শ্রমিকদের প্রায় সকলে হিন্দু, আর গারোদের প্রায়

www.pathagar.com

সকলে খ্রিষ্টান। বর্তমানে রাঙামাটি থেকে আগত কিছু ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোক এতদঞ্চলে প্রত্যক্ষ হয়। এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

গারো

সিলেট শহর ও সদর উপজেলার স্থায়ী ও অস্থায়ী বসবাসকারী গারোদের সংখ্যা প্রায় ৬০ পরিবার। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হলো নয়াসড়ক খ্রিষ্টান মিশনে ৩ পরিবার, ফিশারি খাদিম নগরে ৬ পরিবার ও দলই পাড়া খাদিমনগরে ১১ পরিবার। অবশিষ্ট পরিবারগুলি কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গা বা জেলা থেকে এখানে এসে বসবাস করছেন। সিলেট শহরে গারো মেয়েদের অধিকাংশই বিউটি পার্লারে কাজ করছেন। সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও মধুপর এলাকার মেয়েরাও এখানে এসে বিউটি পার্লারে কাজ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মধুপুর অঞ্চলের সংখ্যা বেশি।

গারো পুরুষ বা ছেলেদের নিজস্ব গারো ড্রেস লেংটি ও গেঞ্জি থাকলেও বর্তমানে ইউরোপীয় ও বাঙালি পোশাকই ব্যবহার করছেন বেশি। এরা মাতৃতান্ত্রিক। বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে বরকে থাকতে হয়।

মহিলা ও মেয়েদের নিজস্ব পোশাক আছে। কিন্তু সিলেট শহরে যারা বসবাস করছেন, তারা শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করেন।

ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অবশ্য তারা গারোদের নিজস্ব ড্রেস যেমন দচমান্দা, দকশাড়ি ও গারোদের বিশেষ গামছা (ওড়না) ব্যবহার করা হয়। সিলেট শহরে গারোদের ড্রেস বানাবার কোন তাঁত শিল্প নেই । নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরি গ্রামে গারোদের পোশাক বানানোর নিজস্ব তাঁত শিল্প আছে। সেখান থেকে এনে তাঁরা ব্যবহার করেন।

গারোদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, কিন্তু কোন উপকরণ না থাকায় অনুষ্ঠান করতে পারছেন না। মধুপুর থেকে কিছু কিছু উপকরণ এনে ওয়ানগালা (নবান্ন) উৎসব পালন করেন। অন্যান্য জেলার গারো ছেলে মেয়েরা শিক্ষায় যতটা এগিয়েছে, সিলেট সদর উপজেলার ছেলেমেয়েরা তেমন এগুতে পারেনি। বেশির ভাগই দশম শ্রেণি পাশ করার পর আর্থিক অবস্থার কারণে কলেজে পড়তে পারে না।

চা-শ্রমিক

মালনী ছড়া, আলীবাহার, তারাপুর, লাক্কাতুরা (লাক্কর তলা), কালাগুল, চিকনাগুল প্রভৃতি সিলেটের উল্লেখযোগ্য চা-বাগান। চা-বাগান সমূহের আয়তন বিশাল আকৃতির হয়ে থাকে। সচরাচর টিলা বা উঁচু অঞ্চলে চা ভাল জন্মে। চা গাছের উচ্চতা ৩-৪ ফুটের বেশি হতে দেয়া হয়না। তবে আশে পাশে বড় বড় বৃক্ষরোপণ করা হয়। এগুলো চা গাছকে রোদের তাপ থেকে রক্ষা করে।

চা-বাগানের নিজস্ব সীমার মধ্যেই কর্মচারি, কর্মকর্তা, ও শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে। চাকরি যতদিন থাকে ততদিন কর্মচারিরা এখানেই বসবাস করেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চা-শ্রমিকগণ এই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দরুণ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা বাগানের কোয়ার্টার গুলোতে বসবাস করেন।

www.pathagar.com

আদি উৎসের পরিপ্রেক্ষিতে চা-শ্রমিকগণ জাতিগত ভাবে নিম্নোক্ত শ্রেণি বিন্যাস মেনে চলেন।[১৮] যথা-

দেশওয়ালি

(উত্তর প্রদেশ থেকে আগত)

১. পাশি, ২. গোয়ালা, ৩. কৃষ্ণ গোয়ালা, ৪. অহি গোয়ালা, ৫. যাদব গোয়ালা, ৬. কৈরী, ৭. ভর, ৮. পাণ্ডে, ৯. তেওয়ারি, ১০. কুর্মি, ১১. বারই, ১২. চাষা -প্রভৃতি।

উড়িয়া

(উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে আগত)

১. তাঁতি, ২. পান তাঁতি, ৩. সবর, ৪. শুদ্ধ সবর, ৫. বোনার্জি, ৬. নায়েক, ৭. বোনাজ, ৮. খোদাল, ৯. বাল্মিক দাস, ১০. সমলপুর তাঁতি, ১১. সনপর তাঁতি, ১২. কন্দ, ১৩. চাষা ১৪. কেউট প্রভৃতি।

সাঁওতাল

(সাঁওতাল পরগনার ডুমকা জেলা, বীরভূম ও ঝাড়খণ্ড থেকে আগত)

১. মুরমু, ২. সরেন, ৩. কিসকু, ৪.বাস্কে, ৫. হেমরন, ৬. বেসরি, ৭. মার্ডি, ৮. চড়ে, ৯. হাসদা, ১০. উরাং, ১১. সাংমা, ১২. টুডু প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গি (চা-শ্রমিকদের ভাষায়)

১. কর্মকার, ২. বাউরি, ৩. ভৌমিক, ৪. ভূমিজ, ৫. কালিন্দি প্রভৃতি।

'কর্মকারগণ বর্ধমান থেকে এবং অন্যরা পুরুলিয়া থেকে আগত। এতদ্ব্যতীত মুণ্ডাদের চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি, রাচি এবং ভুইয়াদের গয়া, ভাগলপুর, হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য, এ সমস্ত তথ্য মূলত প্রবীণ চা-শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত। বিহার, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত অঞ্চলগত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও অবশ্য এখানে বর্তমান।

ছত্রীদের কেউ কেউ নিজেদের নেপাল থেকে, চাষা'রা উড়িষ্যা কিংবা উত্তর প্রদেশ থেকে এবং সবরদের কেউ কেউ কটক, পুরী ও বিশাখাপট্টম থেকে আগত বলে দাবি করেন।

দেশওয়ালিদের সঙ্গে সাঁওতাল, কিংবা উড়িয়াদের সঙ্গে দেশওয়ালিদের যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়না, তেমনি কৈরিদের সঙ্গে তেওয়ারি কিংবা বোনাজের সঙ্গে নায়েকেরও ওই রকম কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়না। এক্ষেত্রে তেওয়ারির সঙ্গে কেবল তেওয়ারির, বোনাজের সঙ্গে কেবল বোনাজ, এবং কৈরিদের সঙ্গে কেবল কৈরিদেরই সামাজিক ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

চা-শ্রমিকদের অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে সকলে তা নয়। মূল জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষও আদিবাসী চা-শ্রমিকদের সঙ্গে একীভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত দেশওয়ালি বলতে সম্ভবত পৃথক কোনো জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেনা, একদেশ, একদেশি বা একই দেশের অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ বোঝাতেই (খুব সম্ভব) এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। (উত্তর প্রদেশসে আয়া হুয়া লোগোনে এক দুসরেকো দেশওয়ালে কহতে হ্যাঁয়)।

তারা সচরাচর গ্রাম পূজা, করম পূজা, বনদুর্গা পূজা, টুসু পূজা এবং হোলি উৎসব পালন করেন। তবে বাঙালির দুর্গা পূজাই এখন তাদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

নাথ সম্প্রদায়

ভারতের একটি সুপ্রাচীন ধর্মীয় সাধনা পদ্ধতির নাম যোগ। এই যোগবাদ একসময় ক্ষীণ হয়ে এলেও পরবর্তীকালের বৌদ্ধ, জৈন, সুফি ও বৈষ্ণব মতের সঙ্গে মিশে ভিন্ন একটি ধর্ম সৃষ্টি করে। এটিই নব্য শৈববাদ বা নাথ ধর্ম। এই মত পরবর্তীকালের হিন্দু বা সনাতন মতের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়।

নাথ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার পাল রাজাদের সময় হতে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। এ কাহিনিগুলি নাথ গুরুদেরই অবদান। কাহিনিগুলিকে বলা হয় নাথ গীতিকা।

যোগ সাধনা হচ্ছে নাথ ধর্মের মূল ভিত্তি। নাথ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যোগী বলা হয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। এ বিষয়টিকে পতঞ্জলি বলেন, *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*।

চিন্তার বিরাম নেই। তাই মনকে চিন্তা শূন্য করতে হবে। মনকে করতে হবে নিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির। পতঞ্জলি একেই বলেছেন,*'প্রচ্ছর্দনবিধারনাভ্যং প্রাণস্য।'*

অর্থাৎ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করা।

যোগের চূড়ান্ত অবস্থা সমাধি। যোগের বড় উদ্দেশ্য নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ। যাতে বিভূতি বা সিদ্ধি লাভ হয়।

নাথ সাহিত্য ভাবের দিক থেকে চর্যাপদের সাথে মিল রয়েছে। উভয় ধারাতে সিদ্ধগণের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া যায়।

নাথ সাহিত্যের প্রধান দুইটি ধারা।

১. মীন চেতন বা গোরক্ষ বিজয়

২. ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান।

মীন চেতন বা গোরক্ষ বিজয় পুথিতে মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়ে সেখানকার নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে সাধনমার্গ ছেড়ে আমোদে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ তাকে মীন চেতন বা গোরক্ষ বিজয় তত্ত্বকথা শুনিয়ে আবারো সাধন পথে নিয়ে আসেন।

ময়নামতির গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রন্থ বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এ কাহিনি বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মীন চেতন বা গোরক্ষ বিজয় গ্রন্থের রচয়িতা— শ্যামাদাস সেন, ভীমসেন রায়, ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস প্রমুখ।

www.pathagar.com

ময়নামতির গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা— দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, আবদুল শুকুর মহম্মদ।

নাথ বা যোগী ধর্মের চার সিদ্ধাপুরুষ:

১. মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ)

২. জালন্ধরি পাদ (হাড়িপা)

৩. গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ, গোর্খনাথ)

৪. কানুপা (কাহ্নপা)

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে যোগী জাতির অবস্থান একসময় দৃঢ় ছিল।

নাথ সম্প্রদায় নিজেদেরে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন এবং ব্রাহ্মণদের মতো পৈতা ধারণ করেন (তবে কারো কারো মতে, শর্মা উপাধিধারীগণ নাথ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এবং নাথ ও দেবনাথ উপাধিধারীগণ যোগী)। অন্যান্য হিন্দুদের মতো তারা দশবিধ সংস্কারাদি কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। তবে এঁরা দশবিধ সংস্কারে কেবল সামবেদীয় বিধান অনুসরণ করেন ।

(বিবাহ, গর্ভধারণ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নকে দশবিধ সংস্কার বলে) মৃত্যুর পর বৈষ্ণবদের মতো এরাও মৃতকে সমাধি দেন। তবে এঁরা মৃতকে মাটিতে পদ্মাসনে বসিয়ে সমাধিস্থ করেন। স্থানাভাব বা মূল হিন্দুদের অনুসরণে বর্তমানে অনেককে দাহও করতে দেখা যায়।

সিলেট সদর উপজেলার খাদিমপাড়া ইউনিয়নের বাহুবল, বহর নওয়া গাঁও, শান্তি বাগ, সিটি কর্পোরেশনের শিবগঞ্জ (রায়নগর), চৌকিদেখি, টিলাগড় প্রভৃতি অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায় বসবাস করেন।

ছ. নদ-নদী, খাল-বিল ও পাহাড়-টিলা

সিলেটের প্রধান দু'টি নদী সুরমা ও কুশিয়ারা সিলেট বাসীর খুবই প্রিয়। এর মধ্যে সুরমা নদী সদর সিলেটের উপর দিয়ে প্রবাহিত। অন্যান্য নদীর মধ্যে রয়েছে-পিয়াইন, গোয়াইন, চেঙ্গের খাল, সারি, কাপনা, শেওলা প্রভৃতি।

অমরকোষ অভিধানে বর্ণিত আছে *শরাবতী*কে কেউ কেউ সুরমা মনে করেন। মরক্কোর অধিবাসী বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা হযরত শাহজালালের (র.) সাথে দেখা করতে ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট আসেন বলে কথিত। তিনি জলপথ *নহরে আজরক* দিয়ে সিলেটে পৌঁছান। আরবি শব্দ আজরক অর্থ নীল। অনেকের মতে, *নহরে আজরক* বা পানি নীল ছিল বলেই এর নাম সুরমা।

সিলেট শহরের প্রতিটি পাড়ায় ২০ বৎসর পূর্বেও একাধিক পুকুরের অবস্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র সিলেট শহরে পুকুর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সংগ্রাহকগণ মোট ১৭টি পুকুরের সন্ধান পেয়েছেন যার ৪টি ৮নং ওয়ার্ডে। ব্রাহ্মণ শাসন, হাওয়লদার পাড়া ও কালীবাড়িতে অবস্থিত এই ৪ পুকুরের ৩টি ব্যক্তি মালিকানাধীন।

www.pathagar.com

ফেঞ্চুগঞ্জে পুকুর রয়েছে ১,১২৫টি (সর্বশেষ তথ্য)। তন্মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর ৯৮৮টি। এ উপজেলায় দিঘির সংখ্যা ৭টি। বিভিন্ন পুকুরে বিভিন্ন সময় সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা *লাই, ডুবখেলা* প্রভৃতি খেলে থাকে।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পুকুর নামে একটি পুকুর রয়েছে যার পাড়ে ব্রিটিশ শাসনামলে শঙ্খ, কাসা, পিতল ইত্যাদির হাট বসত বলে জনশ্রুতি আছে। এই উপজেলা সদরে অবস্থিত একটি দিঘিতে প্রতি বছর অতিথি পাখি আসে। সেখানে তখন এক নয়নাভিয়াম দৃশ্য অবলোকন করা যায়। আবার উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জে অবস্থিত সওয়ার মিয়ার দীঘিতে পূর্বে কলা গাছ দিয়ে তৈরি 'ভেলা'র বাইচ অনুষ্ঠিত হত।

সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন দিঘি, পুকুর, বিল প্রভৃতির রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। এই নামের সাথে আবার জড়িয়ে আছে স্থানীয় কিছু কিংবদন্তি বা ইতিহাস। দাতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি বা স্থানের নামেও নামকরণ হয়েছে অনেক জলাশয়ের। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলোঃ

বিল

চাম্পাকরি বিলঃ ফেঞ্চুগঞ্জের রাজনপুর ও ইসলামপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে এই বিল প্রবাহিত। ধারণা করা হয়ে থাকে এই বিল ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। ঐতিহ্যবাহী এই বিলে বিভিন্ন প্রকার মাছ পাওয়া যায়। পূর্বের মতো এখনও এখান থেকে মানুষ মাছ সংগ্রহ করে থাকে। অনুমান যে, এই বিলের পাড়ে চাম্পা ফুল পাওয়া যেত সেই থেকে তার নামকরণ করা হয়েছে চাম্পাকরি বিল। বর্ষার মৌসুমে যখন বন্যা হয় তখন এই বিলে বিভিন্ন প্রকার অতিথি পাখি আসে। আগে এই বিলে নিকটবর্তী গৃহিণীরা তাদের নিত্যদিনকার কাজ সারতেন। আলাপ আলোচনা হত পারিবারিক বিষয়াবলি নিয়ে। এই বিলের বেশ কিছু অংশ ভরাট হয়ে গেলেও এখনও প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের আধার এই বিল।

খুইয়া বিলঃ ফেঞ্চুগঞ্জ সদর হাসপাতালের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এই বিল। অনুমান যে, ফেঞ্চুরাম বুড্ডা যখন প্রথম ফেঞ্চুগঞ্জ আসেন তারপর এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে খুইয়া বাবু নামে এক ব্যক্তি বিল তৈরিতে অবদান রাখেন। তার নাম অনুসারে খুইয়া বিল। আবার অনেকে বলেন এক সময় এখানে খুইয়া সম্প্রদায়ের লোক বাস করত এ থেকে খুইয়া বিল। এ বিলের বেশ কিছু জায়গা ভরাট হয়ে গেলেও এখনো অনেকে এখানে এসে প্রশান্তি লাভ করেন।

ফুল বাড়ী বিল : কানাইঘাটের বহু পুরাতন এই বিলে এক সময় প্রচুর কচুরিপানা ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই কচুরিপানার ফুল ছিল বিলের সৌন্দর্য। পরবর্তীকালে তাই এর নাম হয় ফুলবাড়ী বিল। কারো কারো ধারণা, এই বিলের পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়িতে প্রচুর ফুল গাছ ছিল। আর একারণে বিলটির নাম হয় ফুলবাড়ী বিল।

হিংগাইর কুড়ী বিল : এখানে প্রচুর সিং মাছ পাওয়া যেত বলে এর নামকরণ হয় হিংগাইরকুড়ী বিল। এই বিলও কানাইঘাটে অবস্থিত।

www.pathagar.com

মহিষ মারা বিল: এই বিলের জল খেয়ে কয়েকটি মহিষ মরে যাওয়ার কারণে বিলের নামকরণ এমন হয়েছিল বলে কারো কারো ধারণা। তবে কেউ কেউ মনে করেন, পূর্বে মহিষ মারা গেলে এখানে ফেলা হত, আর এ কারণে এর নাম মহিষ মারা বিল।

চাতল বিল: এই বিলে এক সময় প্রচুর চাতল মাছ পাওয়া যেত বলে বিলের নাম চাতল বিল।

শীতলা বিল: হিন্দু সম্প্রদায়ের শীতলী দেবীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়। পূর্বে এই বিলে মানুষ শীতলা দেবীর নামে বিভিন্ন জিনিস মানত করে তা উৎসর্গ করত।

বান্ধাগাছী বিল: পূর্বে এই বিলে মানুষ বান দিত (তাবিজ করত) বলে মনে করা হয় তাই নাম হয় বান্ধাগাছী বিল।

গৌরাঙ্গ বিল: বালাগঞ্জের প্রাচীন এই বিলটি স্থানীয় প্রভাবশালী গৌরাঙ্গ বাবুর নামানুসারে নামকরণ হয়। লোকশ্রুতি রয়েছে, বিয়ের সময় মানত করলে এখান থেকে থালা বাসন প্রভৃতি উঠত আবার বিয়ের কাজ শেষে মিলেয়ে যেত। অনেকে বলেন এখান থেকে মাঝে মাঝে অমবস্যার সময় দুটো মূর্তিও উদিত হয়।

নিরাইয়া বিল: এই বিলটিও বালাগঞ্জে অবস্থিত এবং বেশ পুরনো। বিলটি এখনো বেশ নীরব। সিলেটে নীরবকে বলে নিরাই। স্রোতহীন হওয়ায় এই বিলকে নিরাইয়া বিল বলে।

কেশবখালি বিল: বালাগঞ্জের কেশব খালির নামানুসারে এর নামকরণ হয় কেশবখালি বিল। কেশবখালি এলাকা পূর্বে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। এখানে কেশব বাবু নামের এক ব্যক্তির নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ হয় বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ অবশ্য আগে মবিলের নাম এবং তা থেকে স্থানের নাম হয়েছে বলে মনে করেন।

হরিদাসের বিল: ফেঞ্চুগঞ্জের কচুয়া চরে অবস্থিত বিল। ধারণা করা হয়, হরিদাস বাবু নামক এক ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিলের সৃষ্টি। জমিদার হরিদাস বাবু প্রকৃতির শোভা বর্ধন কল্পে এ বিল তৈরি করান। বিলটি এখন ধ্বংসের পথে।

সিলেট জেলার অন্যান্য বিলের মধ্যে রয়েছে পিয়াম বিল, জলডুবি বিল, ভাইয়া বিল, দোপকালী বিল, তুলকা বিল প্রভৃতি।

খাল

নয়াগ্রামের খাল: নতুন বসতির মাধ্যমে একটি গ্রাম গড়ে ওঠায় গ্রামের নামকরণ করা হয় নয়াগ্রাম। এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খালের নাম হয় নয়াগ্রামের খাল। এটি কানাইঘাটে অবস্থিত।

গুপ্পী পাড়ার খাল: এই খাল প্রবাহিত হয়েছে গুপ্পী পাড়ার মধ্যে দিয়ে, তাই এর নামকরণ হয় গুপ্পী পাড়ার খাল।

সেয়াাব মীর্জার খাল: বালাগঞ্জ উপজেলার পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়নের ডেকাপুর গ্রামে এই খাল অবস্থিত। এই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন সোয়াব

www.pathagar.com

মীর্জা। প্রতিষ্ঠিত ও ধনাঢ্য এই ব্যক্তি প্রায় ৫০ বছর আগে তার জায়গার উপর খনন করেন এই খাল। এই খালে এখনও মাছ চাষ হয়, পাখির আনাগোনা শোনা যায়।

রাসবাবুর খালঃ পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত এই খাল রাসবাবু নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। বলা হয় রাসবাবু ছিলেন স্থানীয় জমিদার। তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এই খাল নির্মাণ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে মানুষ বিভিন্ন প্রকার মানত করে আসে। অনেকে এই খালের পানি নিত্য কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

নয়াখালঃ বালাগঞ্জের ওসমানী বাজারে অবস্থিত এই নয়াখাল। এর নামকরণ নয়াখাল কীভাবে হলো তা জানা যায়নি। ধারণা করা হয়, নতুন খাল তৈরির সময় থেকে এর এধরনের নাম হয়।

কুফির মুখ খালঃ বালাগঞ্জের সংযোগস্থলে বিধায় এর নাম কুফিরমুখ খাল। এই খালও বেশ পুরনো। পূর্বে এখানে হিন্দুরা বিভিন্ন প্রথাচার যেমন বিপদনাশিনী ব্রত বা বিয়ের সময় ধান কুলা প্রভৃতি নিয়ে পূজা দিত এই খালে। বর্তমানে তুলনামূলক অনেক কম হয়।

চলিতাবাড়ীর খালঃ চলিতাবাড়ী নামক গ্রামের মধ্যে দিয়ে এই খাল প্রবাহিত হয়েছে। গ্রামের নামানুসারে খালের নামকরণ করা হয়েছে চলিতা বাড়ী খাল।

মহিষা খালঃ পূর্বে এই খালে মহিষ ধুয়া হত বলে এর নামকরণ হয় মহিষা খাল।

এছাড়াও রয়েছে মোলাবাড়ী খাল, বক্কর খাল, বড় বাঘা খাল প্রভৃতি।

পুকুর

চিল বাধার পুকুরঃ এই পুকুরের চারপাশে প্রচুর চিলের সমাবেশ ঘটতো বলে এর নামকরণ হয় চিল বাধার পুকুর।

হাফিজ মিয়ার পুকুরঃ প্রায় ৮০-৯০ বছর পূর্বের এই পুকুর স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হাফিজ মিয়া দান করেন। তার নামানুসারে হাফিজ মিয়ার পুকুর।

নমস্ব পুকুরঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ব্রতাচার পালনের পর এই পুকুরে এসে নানা উপকরণ বিসর্জন দিতেন। তাই এর নামকরণ হয় নমস্ব পুকুর।

তিনকানি পুকুর : তিন কানি (ডেসিমেল) জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর নামকরণ হয় তিনকানি পুকুর।

মীর্জা পুকুর : মীর্জ বাড়ির লোকেরা এই পুকুর দান করে বলে তার নাম মীর্জা পুকুর।

দিঘি

সুরেশ বাবুর দীঘিঃ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে এই দিঘি অবস্থিত। এই দিঘি বিশাল আকৃতির। অনেকে বলেন ধন্যাঢ্য জমিদার সুরেশ বাবু এই দিঘি নির্মাণ করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সুরেশ বাবুর দিঘি। ফেঞ্চুগঞ্জের সবচেয়ে পুরনো দিঘিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এই দিঘির আশেপাশে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা অবস্থিত এবং এতে বিভিন্ন ধরনের পাখি অবাধে বিচরণ করে। এখানে অতিথি পাখিরও সমাগম ঘটে থাকে প্রচুর।

www.pathagar.com

বিয়ানীবাজার উপজেলার বারপালের দিঘি যা বর্তমানে হাজি দিঘি নামে পরিচিত, বেশ প্রাচীন।

সিলেট শহরে মাত্র ১৫-২০ বৎসর পূর্বেও বেশ কয়েকটি বড় দিঘি ছিল। এখন এই দিঘিগুলো ভরাট হয়ে বাণিজ্যিক কার্যালয় ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। তবে স্থানের নামগুলো এখনো এর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন- রাম দিঘির পাড়, লাল দিঘির পাড়, লালা দিঘির পাড়, মাছু দিঘির পাড়, ধোপা দিঘির পাড়, সাগর দিঘির পাড়, চৌকি দিঘি (চৌকি দেখি)।

লালাদীঘি ছাড়া সিলেট শহরে এখন আর বড় কোনো দীঘি নেই।

সিলেট জেলায় বেশ কিছু ছোট-বড় পাহাড় ও টিলা প্রত্যক্ষ হয়। এই পাহাড় গুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. জৈন্তাপুর, ২. ধূপীটুলা, ৩. লালাখাল (খেসারা পাহাড়), ৪. নুনছড়া, ৫. বরিয়াল, ৬. সুনাতন পাহাড়, ৭. লোভাছড়া, ৮. চাতল টিলা, ৯. ডাউকের গুল ১০. ডোনা পাহাড়, -প্রভৃতি।

সিলেট জেলায় বেশ কিছু হাওরও বর্তমান। সমুদ্র সদৃশ এই হাওর এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অপরূপ রূপে করেছে সজ্জিত।

উল্লেখযোগ্য হাওর সমূহ হচ্ছে-

১. হাইল হাওর, ২. বাড়োয়া হাওর, ৩. মুক্তারপুর হাওর, ৪. চাতলা হাওর, ৫. জিলকার হাওর, ৬. বড় হাওর, ৭. বালাইর হাওর, ৮. মাইজাল হাওর, ৯. ষোল হাওর, ১০. মাকড়শির হাওর, ১১. বড় শাওলা হাওর, ১২. বানাইয়া হাওর প্রভৃতি। বর্ষাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই হাওরসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

মধ্যযুগে সিলেটের শাসকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণদের এনেছিলেন মূলত নিজেদের সন্তানদের মধ্যে বিদ্যার আলো ছড়াতে। এই সব ব্রাহ্মণ ও তাঁদের উত্তরসূরিগণ অবশ্য শাসক ও ব্যবসায়ীদেরে বিদ্যা দান করেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, নিজেদের বিদ্যার ভাণ্ডাররকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে নবদ্বীপসহ ভারতের অন্যান্য স্থানে গমন করতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করতেন, তাঁদের অনেকে সেখানেই স্থায়ী হতেন। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র সেই রকম একজন পণ্ডিত। পরবর্তীকালে তাঁদের শিষ্য, বা সেখান থেকে যাঁরা বিদ্যা অর্জন করে আসতেন, তাঁদের দ্বারা সিলেটে রিদ্যাদান কার্য পরিচালিত হতো।

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিলেট বিদেশি মুসলিম শাসকদের অধীনে যাওয়ায় মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাসকগণ এখানে আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে সিলেটে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় সিলেটে *প্রবেশনাল স্কুল* নামে পাশ্চাত্য পদ্ধতির

www.pathagar.com

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বছর পনের পর তা *জিলা স্কুল* নামে রূপান্তর লাভ করে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। এসময় ওয়েলস মিশনের রেভারেন্ড প্রাইজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যচের গ্র্যাজুয়েট জয়গোবিন্দ সোম এতদঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এরপর সিলেটের শিক্ষা বিস্তারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রাজা গিরিশচন্দ্র, প্রমোদ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ফলাফলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সিলেট সদর)।

বিদ্যালয়

সিলেট সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৩৬ খ্রি.
ব্লু-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ	১৯৬১
সিলেট সরকারী অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯০৩
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ হাই স্কুল এন্ড কলেজ	১৯৯৪
দি এইডেড হাইস্কুল	১৯২৮
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	১৯৯৯
রাজা জি.সি (গিরিশচন্দ্র) হাইস্কুল	১৮৮৬
রসময় মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৩০
পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫৯
রামকৃষ্ণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯২৮
মঈনুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৩৫
কিশোরীমোহন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	১৯৩৭
মির্জাজাঙ্গাল বালিকা বিদ্যালয়	১৯৬০
আম্বরখানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	১৯৭৩
ভোলানন্দ নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩
পাঠানটুলা দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬১
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল	১৯৯২
দি মডেল হাইস্কুল	১৯৪০
সিলেট ক্যাডেট কলেজ	১৯৭৯

এছাড়া বর্তমানে স্কলার্সহোম স্কুল এন্ড কলেজ এর কয়েকটি শাখা সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রশংসিত হচ্ছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এন.জি.এফ.এফ হাই স্কুল, ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯৬১
রেবতীরমণ দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়, মোগলাবাজার	১৯০৮
গোটাটিকর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, গোটাটিকর	১৯৭১

www.pathagar.com

কানাইঘাট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, কানাইঘাট	১৯০৫
দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কানাইঘাট	১৯১৫
ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকাদক্ষিণ	১৮৫৮
এম. সি একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, গোলাপগঞ্জ	১৯৩৪
মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ	১৮৮৭
সদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ	১৯২৯
কাসিমআলী উচ্চ বিদ্যালয়, ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯১৫
ভাটরাই উচ্চ বিদ্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ	১৯৫৭
বিন্নাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়, গোয়াইনঘাট	১৯৩৫
বরহাল এহিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, জকিগঞ্জ	১৯৪৫
হরিপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর	১৯৩৭
লাউতা উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার	১৮৭১
দুবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার	১৯৭১
রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ	১৯০৯

মহাবিদ্যালয়

সিলেট মুরারিচাঁদ (এম.সি) কলেজ, টিলাগড়, সিলেট

জমিদার মুরারিচাঁদ রায়ের পোষ্য দৌহিত্র গিরিশচন্দ্র রায় পিতামহের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং এতদঞ্চলের শিক্ষাবিস্তারের স্বার্থে, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন মুরারিচাঁদ স্কুল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে একে তিনি মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। বিশাল আয়তনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা ভবন, প্রশাসনিক ভবন ছাড়াও ক্যান্টিন, মিলনায়তন ও পুকুর বর্তমান। ক্যাম্পাসের বাইরে রয়েছে বিশাল আয়তনের খেলার মাঠ, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক হোস্টেল এবং শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বাসভবন। ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেলও বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত। সমগ্র ভারতবর্ষেই একসময় এই মহাবিদ্যালয়ের সুনাম ছিল। এই মহাবিদ্যালয়েরই নিজস্ব ভূমিতে আর একটি ছোট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ পূর্বক তার নামকরণ করে সরকারী এম. সি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। আর সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজটির নাম করা হয় সরকারী কলেজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ারও অনেক পরে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠানটি স্বনামে ফিরে আসে। একসময়ের আসাম প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কলেজ লাইব্রেরি বলে পরিচিত এই কলেজ লাইব্রেরির বহু গ্রন্থ বিভিন্ন সময় বিনষ্ট এবং স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। কলেজের আয়তনও পূর্বাপেক্ষা কমে গেছে নানা কারণে।

মদনমোহন কলেজ, লামাবাজার

সিলেটের বৃহত্তম বেসরকারি কলেজ। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে যোগেন্দ্রমোহন ও মোহিনীমোহন দাস কর্তৃক দানকৃত একবিঘা জমি ও নগদ ১২ হাজার টাকা নিয়ে এই কলেজের যাত্রা। শহরের প্রাণকেন্দ্র লামাবাজারে এর মূল ক্যাম্পাস। তবে এসময়ের বিত্তবান পুরুষ

www.pathagar.com

রাগীবআলী কর্তৃক দানকৃত তারাপুরে তার আর একটি ক্যাম্পাস অবস্থিত। এই ক্যাম্পাসে কেবল কমার্সের বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারী মহিলা কলেজ, জিন্দাবাজার

শহরের প্রাণকেন্দ্র উত্তর জিন্দাবাজারে অবস্থিত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি আসাম সরকার অধিগ্রহণ করেন, কিন্তু ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার এর দায়িত্ব প্রত্যাহার করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সনে পুনরায় এর দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকারি কলেজের মর্যাদা দেন। মহিলা কলেজের মধ্যে এটি সিলেটের সেরা।

সরকারি এম. এ. জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, কাজলশাহ

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এল. এম. এফ কোর্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটিকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সরকার মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের নামে কলেজ ও হাসপাতালের নামকরণ করেন।

সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা, চৌহাট্টা

সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসাকে বাংলাদেশের প্রথম সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এই মাদ্রাসার জন্ম। তবে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে এতে সিনিয়র সেকশন চালু হয়। আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর অবদুল মজিদ ওরফে কাপ্তান মিয়া এই মাদ্রাসার সম্প্রসারণ ও সরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমারগাঁও

এম.সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার দাবি ছিল সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণ না হলেও ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিলেট শহরের অদূরে স্থাপিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামক এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট ভ্যাটেনারি কলেজকে রূপান্তরিত করে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

সিলেটের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি রাগীব আলী তার তারাপুরস্থ নিজস্ব জায়গায় ১৯৯৫ সনে গড়ে তোলেন সিলেটের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামক এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশের একটি উন্নত কলেজ ও হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে রয়েছে নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সিলেট উইমেনস্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পর রাগীব আলী সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র বন্দরবাজারে প্রতিষ্ঠা করেন সিলেটের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় *লিডিং ইউনিভার্সিটি*। তবে বর্তমানে সিলেটে আরো কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান। যেমন- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ম্যাট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি।

অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আইন মহাবিদ্যালয়, বন বিদ্যালয়, সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই, শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়, বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, এবং কয়েকটি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

ঝ. ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা ও নিদর্শন

ভূমিকম্পের কারণে সিলেটের অনেক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। তারপরও যেগুলো এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে শাহজালালের দরগাহ, কালীঘাট মন্দির, শ্রীচৈতন্যের পৈতৃক নিবাস, চাঁদনী (চান্নি) ঘাটের সিঁড়ি, আলী আমজাদের ঘড়ি, সারদা স্মৃতি ভবন, ক্বিন ব্রিজ, দুর্গা বাড়ি, ওসমানী জাদুঘর, মতিন উদ্দীন আহমদ স্মৃতি জাদুঘর, রাজাস কটেজ, মুসলিম সাহিত্য সংসদের শিলালিপি, জৈন্তা রাজবাড়ি, বলরাম জিউর আখড়াস্থ বিষ্ণু মূর্তি প্রভৃতি। নিম্নে এগুলোর কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হল:

হজরত শাহজালালের দরগাহ

শাহজালালের পুরো নাম হজরত শাহজালাল মযরদ্ ইএ্যমনি। আরব অঞ্চলের একজন বিখ্যাত সুফি সাধক। ভারত হয়ে তিনি চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে সিলেট আগমন করেন। নিরামিষভোজী ও চিরকুমার এই সাধককে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সিলেটের সকলে শ্রদ্ধা করেন। আম্বরখানা থেকে সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত ব্যাপ্ত এলাকা জুড়ে তাঁর মাজার। একে দরগাহ বলে। তাঁর মাজার এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু অঞ্চল দরগাহ গেইট নামে পারিচিত।

কালীঘাট মন্দির

সিলেট সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের খুব সন্নিকটে, সুরমা নদীর তীরে এই মন্দির অবস্থিত। কবে মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল, সঠিকভাবে তা জানা যায় না। তবে সকলেই একে প্রাচীন মন্দির হিসেবে জানেন। কালী মন্দিরের নাম অনুসারে আজ পর্যন্ত গোটা এলাকার নাম কালীঘাট। তবে বর্তমানে মন্দিরের আয়তন খুবই সংকুচিত হয়ে গেছে। চতুর্দিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকায় বর্তমান অবস্থানটিও শঙ্কামুক্ত নয়।

শ্রীচৈতন্যের পৈতৃক নিবাস

সিলেট সদর থেকে খানিকটা দূরে, ঢাকাদক্ষিণ উপজেলার, গোলাপগঞ্জে শ্রীচৈতন্যের পৈতৃক নিবাস। এখানেই শ্রীচৈতন্য মাতৃগর্ভে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন চৈতন্যের দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। আংশিক ভগ্নাবস্থায় যেগুলো ছিল সেগুলোকে মেরামত করে সংস্কার করা হয়েছে। অনেকে তাঁর পৈতৃক নিবাস দেখতে যান। ওখানে মাঝে মাঝে মেলা ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেটে তৈরি ঢাল

পাঠান ও মুঘল আমলে সিলেটের তৈরি ঢাল বিখ্যাত ছিল। সিলেট শহরের লামাবাজারের পশ্চিমে ঢালকর পাড়ার তৈরি ঢাল ভারতের সর্বত্র রপ্তানি হত। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে সিলেটে গন্ডারের চামড়ার তৈরি সুদৃশ্য ও মজবুত ঢাল সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

প্রাচীন শিলালিপি

বালাগঞ্জের বুরুঙ্গা বাজারের পশ্চিমে তিলাপাড়া গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। ইলিয়াস শাহী বংশের স্বাধীন সুলতান নাসিরুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৪২) এর দৌহিত্র শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ (১৪৮১) এর উজির মালিক উদ্দিন ওরফে মালিক সিকান্দার এই মসজিদ নির্মাণ করেন বলে কথিত। ১৪৭৯ সালে নির্মিত এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় একটি প্রাচীন শিলালিপি। শিলালিপিটি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মের ৬ বছর পূর্বকার। উল্লেখ্য, এ স্থানের কিঞ্চিদধিক উত্তর পশ্চিম দিকে বুড়ি বরাকের ডান তীরে বুরুঙ্গা গ্রামে ব্রাহ্মণদের সম্মৃদ্ধ প্রাচীন বসতি অতীতে বিদ্যমান ছিল।

চাঁদনী (চান্নি) ঘাটের সিঁড়ি

ব্রিটিশ আমলে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক সিলেট আসেন। বড়লাটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুরমা নদীর চাঁদনীঘাটে দৃষ্টিনন্দন দীর্ঘ সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। এটিই চাঁদনী (চান্নি) ঘাটের সিঁড়ি ।

সিলেটে একটি প্রবাদ রয়েছে, বঙ্কবাবুর দাড়ি, চান্নি ঘাটের সিঁড়ি আর আলী আমজদের ঘড়ি।

আলী আমজদের ঘড়ি

পৃথ্বিমপাশার বিখ্যাত জমিদার আলী আমজদ দিল্লির চাঁদনীচকে শাহজাদি জাহানারার স্থাপিত ঘড়ি ঘর দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরও ইচ্ছে হয় এমন একটি ঘড়ি তৈরি করার। তাই চাঁদনীচকে দেখা ঘড়ির অনুকরণে সিলেটের চাদনীঘাটে তিনি এই ঘড়িটি তৈরি করেন। এটিই আলী আমজদের ঘড়ি নামে পরিচিত।

ব্রাহ্ম মন্দির

রাজা রামমোহন পরবর্তী সময় সিলেটে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠেছিল। তারা সিলেটে মহানগরীর কেন্দ্রস্থল বন্দর বাজারে ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সিলেটের ব্রাহ্ম সমাজের একমাত্র উপাসনালয়টি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে (১২৬৯ বঙ্গাব্দ) নির্মিত হয়। বর্তমানে সিলেটে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

রামকৃষ্ণ মিশন

ধর্মকে আচার সর্বস্বতা থেকে কল্যাণধর্মী করতে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। তাদেরই ভাবাদর্শের প্রতীক রামকৃষ্ণ মিশন। এই মিশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সিলেটের নাইওরপুল পয়েন্টে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি এই মিশন নানা ধরনের সেবাধর্মী কাজের সঙ্গে জড়িত আছে।

মুসলিম সাহিত্য সংসদ

সিলেট নগরীর দরগা গেইট এলাকায় কেন্দ্রিয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ অবস্থিত। ১৯৪৯ সালের ২৪ এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তবে ১৯৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সংসদের প্রথম কমিটি গঠিত হয়। এখনো তার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মুসলিম সাহিত্য সংসদের উঠোনে একটি বড় প্রাচীন শিলালিপি লম্বভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের একতলা ভবন ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

ওসমানী জাদুঘর

নগরীর নাইওরপুলে এ জাদুঘর অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসনিক অধীনে এ জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়।

সিলেটের প্রাচীনতম রাস্তা

১৯৬২ সালে নির্মিত সিলেট-শিলং রাস্তাটিকে অনেকে সিলেটের প্রাচীনতম রাস্তা বলে মনে করেন। বর্তমানে এ রাস্তা সিলেট- তামাবিল সড়ক নামে পরিচিত।

ক্বীন ব্রিজ

দক্ষিণ দিক থেকে সিলেটে প্রবেশদ্বারে সুরমা নদীর ওপর ক্বীন ব্রিজ অবস্থিত। ১৯৩৬ সালে এটি স্থাপিত হয়। ইংরেজ গভর্নর মাইকেল ক্বীন এর নামে এর নামকরণ করা হয় ক্বীন ব্রিজ। ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১১৫০ ফুট। প্রস্থে ১৮ ফুট। ব্রিজটি লোহা দিয়ে তৈরি। এটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছিল তৎকালে ৫৬ লাখ টাকা। এক সময়কার দৃষ্টিনন্দন এই ব্রিজটি এখনো অনেকের দৃষ্টি কাড়ে।

মালনীছড়া চা-বাগান

ইংরেজ সাহেব হার্ডসন ও তাঁর ভাই ১৮৫৪ সালে মালনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলাদেশের প্রথম চা-বাগান। প্রতিষ্ঠাকালে আয়তন ছিল ১৪,৫০০ একর। বর্তমানে ২,৫০০ একর। মালনীছড়া চা বাগানটি সিলেট শহরের কাছে বিমান বন্দরের পাশে অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।

সারদা হল

সুরমা নদীর তীরে ক্বীন ব্রিজের কাছে সারদা হল অবস্থিত। এটি সিলেটের প্রথম মিলনায়তন। জমিদার শ্রী সারদাচরণের নামানুসারে এর নাম হয় সারদা হল। ১৯১৬

www.pathagar.com

সালে সারদাচরণের মৃত্যুর পর ইন্দেশ্বর টি এন্ড ট্রেডিং কোম্পানী সারদাচরণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ মিলনায়তন নির্মাণ করেন। ভূমি সারদা চরণেরই ছিল বলে জানা গেছে।

শাহজালাল সেতু

১৯৮৪ সালে সিলেটের মেন্দিবাগে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহজালাল সেতু নির্মিত হয়। সেতুর দৈর্ঘ্য ১০৩৮ ফুট এবং প্রস্থ ৪৪ ফুট। ক্বিন ব্রিজের পর এটিই সিলেটবাসীর প্রথম আকাঙ্ক্ষিত সেতু হওয়ায় আজ এটি ইতিহাসের অংশ।

হরিপুর তৈল ক্ষেত্র

তরল সোনার খনি নামে পরিচিত হরিপুর তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সনে। ১০ কি.মি দীর্ঘ ও ৫ কি.মি প্রশস্ত এই তৈল ক্ষেত্রের গভীরতা প্রায় ৫০ হাজার ফুট।

ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি

সিলেটে অনেক আগে থেকেই সাহসী মানুষের বসবাস। একারণে বহিরাগত শত্রুদের এই অঞ্চল কুক্ষিগত করা ও স্বীয় দখলে রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো। সিলেটের ভূ-প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্টের কারণেও বর্হিশত্রুদের বারবার বেগ পেতে হয়ে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্তৃত হলেও সিলেটসহ আসাম কুক্ষিগত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মীরজুমালকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়।[১৯] ব্রিটিশদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাদের পক্ষেও অনেক বিলম্বে গোটা সিলেট অধিকার করা সম্ভব হয়। হযরত শাহজালালের মতো একজন সুফি সাধকের সহায়তায় সিকান্দার গাজী সিলেট (গৌড়) জয় করলেও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল দীর্ঘদিন স্বাধীন হিসেবে স্থানীয় শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে।

সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসও বেশ উজ্জ্বল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম বিদ্রোহটাই সিলেটে ঘটে বলে অনেকের অভিমত।[২০] এছাড়া লাতুর লড়াই, কানাইঘাটের লড়াই, খেলাফত আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ প্রভৃতি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য স্মারক। লাতু বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত। তবে নানকার বিদ্রোহের সূত্রপাত সিলেটের বিয়ানীবাজারে। বিয়ানীবাজারের লাউতা নিবাসী প্রখ্যাত লেখক অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা। এই বিদ্রোহ অবশ্য বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, ভাদেশ্বর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে সিলেটে যিনি দীর্ঘদিন জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে বেঁচেছিলেন তিনি সুহাসিনী দাস। অনেকের কাছে মাসিমা এবং পরবর্তীকালে দিদিমা হিসেবে সুপরিচিত এই মহিয়সী নারীকে মৃত্যুর পূর্বে সরকার সমাজসেবায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন। বাল্য বিধবা সুহাসিনী দাস উমেশচন্দ্র নির্মলা ছাত্রী নিবাসের দায়িত্বে ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরি হয়েছে।

সিলেটের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও গৌরবোজ্জ্বল। সিলেটের যে অংশটি এখন ভারতের অংশ, সে অংশের মানুষও তাদের দেশে বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

www.pathagar.com

সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ত্বের মধ্যে রয়েছেন :

রায় বাহাদুর দুলাল চন্দ্র দেব

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ দুলাল চন্দ্র দেব ১৮৪১ সালে সিলেটের বিয়ানী বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। সিলেট জেলার তৃতীয় গ্র্যাজুয়েট। ১৮৭৯ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ সনে নির্বাচন প্রথা শুরু হলে তিনি সেখানকার ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯০৭ সালে তিনি পূর্ববঙ্গের ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর এম.সি কলেজের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছন।

সৈয়দ আবদুল মজিদ কাপ্তান মিয়া

১৮৭২ সালে সিলেটের কাজী ইলিয়াস নামক স্থানে সৈয়দ আবদুল মজিদ কাপ্তান মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি সিলেট এলাকা হতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম আইন পরিষদে সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন আসামের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। ১৯২২ সালের ২৯ জুন তিনি মারা যান।

জোবেদা রহিম চৌধুরী

জন্ম ঢাকাদক্ষিণে। পিতা খান বাহাদুর শরাফত আলী চৌধুরী। ১৯২৮ সালে তিনি কংগ্রেসে প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সে সময় তিনি সিলেট মহিলা সংঘেরও সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে এবং ১৯৪৮ সালে মহিলা ন্যাশনাল গার্ডে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বি.এন.পি সরকার তাকে সিলেট জেলার ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে তার মৃত্যু ঘটে।

আমীনুর রশীদ চৌধুরী

১৯১৫ সালের ১৭ নভেম্বর আমীনুর রশীদ চৌধুরী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি সিলেটের সাংবাদিকতার পথিকৃত। তিনি 'যুগভেরী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন।

জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী

এম.এ.জি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ১৯১৮ সালে সুনামগঞ্জে জন্ম। ১৯৩৪ সনে উচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগ লাভ। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ভারতের পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ-ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগদান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে রাজনীতিতে সক্রিয়। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে

www.pathagar.com

জয়লাভ। ১৯৭২ সালে মন্ত্রী। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও জয়লাভ। পরবর্তীকালে *জাতীয় জনতা পার্টি* নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন। ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সনে মৃত্যুবরণ।

ব্যারিস্টার আহমদ আলী

আহমদ আলী আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। এতদঞ্চলের রাজনীতিতে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৮২ সালে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেয়া এডমিরাল এম. এ খান তাঁর পুত্র। এম.এ খান ১৯৩৪ সালে শহরের কাজীটুলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার মূল নাম মাহবুব আলী খান। তিনি যোগাযোগ মন্ত্রী থাকা কালে আন্তনগর রেল ব্যবস্থা চালু করেন।

নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী

১৯১৩ সালে মৌলভীবাজারে জন্ম। ছাত্রজীবন থেকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের সংগ্রামে যুক্ত। সুদর্শন, সদালাপী, সুবক্তা, সুলেখক গোস্বামী একাধারে সাংবাদিকতা, রাজনীতি এবং সংকীর্ণতা মুক্ত ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি ১৭ বছর মহাত্মা গান্ধীর অনুচর ও পদাতিক সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন। এক যুগ ধরে সাংবাদিকতা করেছেন। লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন, বারবার কারাবরণও করতে হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দিল্লিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক সংবর্ধিত হন। চিরকুমার এই সাধক ও বিপ্লবী সমগ্র জীবন সমাজ সেবার কাজে সময় ব্যয় করেছেন। সিলেট শহরের চালিবন্দরস্থ বেসরকারী উমেশচন্দ্র নির্মলা ছাত্রী নিবাসের দায়িত্বে ছিলেন মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আছেন দেওয়ান ফরিদ গাজী, ন্যাপের পীর হাবিবুর রহমান, নুরুল ইসলাম নাহিদ উল্লেখযোগ্য।

আবদুস সামাদ আজাদ (১৯২২-২০০৫)

বাংলাদেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের জন্ম সুনামগঞ্জে ১৯২২ সালে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ হন তখন তিনি আর্ন্তজাতিক সমর্থন পেতে সাহায্য করেন এবং নির্বাসিত বাংলাদেশি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে কৃষিমন্ত্রী হন। ২০০৫ সালে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯২৮-২০১০)

১৯২৮ সালে সিলেটে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে স্নাতক শেষ করেন। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন।

www.pathagar.com

তাঁর কূটনৈতিক কর্মজীবনে তিনি রোম বাগদাদ, প্যারিস, জাকার্তা ও নয়াদিল্লিতে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম সেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে তাঁর কূটনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বশান্তিতে অবদান স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার পান। ২০১০ সালে ১০ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শাহ এ এম এস কিবরিয়া (১৯৩১-২০০৫)

অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ শাহ এ এম এস কিবরিয়া ১৯৩১ সালে মৌলভীবাজারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। ১৯৫৪ সালে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে বৈদেশিক বিভাগে যোগদান করেন। কূটনৈতিক মিশনের সদস্য হিসেবে কলকাতা, কয়রো, জাতিসংঘ মিশন, নিউইয়র্ক, তেহরান এবং কাজার্তায় নিয়োজিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯২-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পালন করেন। ২০০১-এ হবিগঞ্জ-৩ এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: মৃদু ভাষণ।

সাইফুর রহমান (১৯৩২-২০০৯)

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ যিনি ১৯৩২ সালে মৌলভী বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর তিনি লন্ডনে চলে যান এবং চাটার্ড একাউনটেন্ট হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ ১২ বার বার্ষিক অর্থ বাজেট পেশ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০৫ সালে একুশে পদক লাভ করেন। তিনি সিলেটে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শিক্ষক প্রশিক্ষক কলেজ ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ২০০৯ সালে ৫ সেপ্টেম্বর এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

ট. মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটেও ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের চিন্তা-চেতনা গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি শাসকদের বৈরি ও বৈষম্যমূলক আচরণই এতদঞ্চলের মানুষকে প্রথমে স্বায়ত্বশাসন এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। ২৫ মার্চের কালো রাত্রি থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অবিরাম সান্ধ্যআইন জারি করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শহর, শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে বাঙালিদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন পরিচালনা করে। পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কারণে টিলাগড়, শিবগঞ্জ, মিরাবাজার, বন্দরবাজার সহ সিলেট শহরের

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্থানে প্রচুর মানুষ নিহত হন। পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করার জন্য কর্নেল রব, সি. আর দত্ত এবং সিলেটের তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজী তাই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। মার্চের শুরুতেই এ. এইচ. সা'দত খানকে আহবায়ক এবং ডা. এম. এ. মালেক এম. পিকে কোষাধ্যক্ষ করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।[২১] এই কমিটির সহায়তায় অন্যান্যরাও সিলেটের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হতে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম থেকেই যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি আব্দুস সামাদ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজী, ইসমত আহমদ চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, সংগ্রাম পরিষদের ডা. নুরুল ইসলাম চঞ্চল, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, ন্যাপের পীর হাবিবুর রহমান, আব্দুল হামীদ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশেষ সাহসের জন্যই জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি আব্দুস সামাদের নামের শেষে আজাদ শব্দটি যুক্ত হয়।[২২]

ওই সময় সিলেটের আতাউল গনি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসেবে এবং হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী কূটনীতিক হিসেবে অসাধারণ ভুমকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেটবাসী প্রবাসী কর্তৃক যুক্তরাজ্যেও কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে সিলেটের আব্দুল মান্নান, তৈয়বুর রহমান ও আয়ুব আলী ছিলেন অন্যতম সদস্য।

সিলেটের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সর্বস্তরের মানুষই এই যুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে দায়িত্বশীল পদেও কাজ করেছেন কয়েকজন। যেমন:

জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী (প্রধান সেনাপতি)
মেজর জেনারেল সি. আর দত্ত (৪নং সেক্টর কমান্ডার)
মেজর জেনারেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ)
কর্নেল এ. আর চৌধুরী (সহকারী চিফ অব স্টাফ)
মেজর আবুল ফাত্তাহ চৌধুরী (স্টাফ অফিসার)

সামরিক বিভাগে আরো যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন, লে. কর্নেল নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেজর আব্দুল আজিজ প্রমুখ।

এতদঞ্চলের ৬জন বীরউত্তম, ১২জন বীরবিক্রম এবং ১৫ জন বীরপ্রতীক পদকে সম্মানিত হয়েছেন।

সিলেট শহরে অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। তন্মধ্যে ডাক্তারও আছেন। সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নিকটে এই শহিদ ডাক্তারদের জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. সামসুদ্দিন আহমদ, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেনডেন্ট লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান, তরুণ ইন্টার্নি ডাক্তার শ্যামল কান্তি লালা, অপারেশন থিয়েটারের নার্স মাহমুদুর রহমান, অ্যাম্বুলেন্স চালক কোরবান আলী মহান মুক্তিযুদ্ধে হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় শহিদ হন। সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. সামসুদ্দিন আহমদ শহিদ হন ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল। অবশিষ্ট চারজন শহিদ হন এর কিছুদিন পর।

অন্যান্য শহিদদের মধ্যে আছেন-আব্দুল বাছিত, মুনাত্তর আলী, ছাত্রনেতা সুলায়মান, সমাজ সেবক বিমলাংশু সেন, চা-বাগান মালিক নির্মল চৌধুরী প্রমুখ।

এছাড়া ঢাকাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জি. সি দেব এবং অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য।

ঠ. বিশিষ্ট গায়ক, শিল্পী ও লোককবি

সিলেটের সাধারণ মানুষের কণ্ঠে এখনো যেসব লোকসংগীত পরিবেশিত হয়, তা থেকে খুব সহজেই অনুমিত হয় যে, এতদঞ্চল একসময় লোকসংগীতের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। কিন্তু সে হিসেবে সংগীত, লোকশিল্পি কিংবা কবিদের পরিচয় যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা বলা যায় না। অদ্যাবধি যেসব সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে অধিকতর সংগ্রহের সম্ভাবনাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী কোনো গবেষক, সংগ্রাহকের দ্বারা এই অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সিলেটের লোকসংগীত শিল্পি ও রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম-পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী (১৭৬৩-১৮৮৮)

জন্ম গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রামে। তিনি একজন উল্লেখযোগ্য সুফি সাধক ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর বেশ কিছু সংগীত অদ্যাবধি জনপ্রিয়।

কারী উসমান আলী (আনুমানিক উনবিংশ শতক)

গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ অঞ্চলের সুনামপুর গ্রামে জন্ম। তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ সুফি সাধক ছিলেন।

শীতালং শাহ (উনবিংশ শতক)

১২০৭ বাংলায় জন্ম, মৃত্যু ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। অসংখ্য মরমি সংগীতের রচয়িতা।

আব্দুল আজিজ (১৮৯৩-১৯৬০)

জন্ম স্থান কানাইঘাট। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা অল্প, তবে তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষা জানতেন এবং সেই সব সাহিত্যের ওপর তার অধিকার ছিল বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

ইব্রাহীম তশ্‌না (১৮৭০-১৯৩০)

পিতৃ দত্ত নাম ইব্রাহীম আলী, *তশ্‌না* সম্ভবত গুরু প্রদত্ত উপাধি। কানাইঘাটের বাটই আইল নামক গ্রামে জন্ম। শাহজালালের অন্যতম সঙ্গী শাহ তকি উদ্দিনের উত্তরসূরি বলে কথিত। তাঁর পিতার নাম শাহ আব্দুর রহমান কাদরি। স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশুনার সূত্রপাত হলেও ভারতের বিভিন্ন স্থানেও পড়াশুনা করেছেন বলে জানা যায়। উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষা জানতেন। সুবক্তা হিসেবে ছিল পরিচিতি। এতদঞ্চলের প্রভাবশালী গীতিকারদের একজন। তাঁর গান একসময় সিলেটের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হতো।

নসিবুর রহমান (১৯০৫-১৯৮৯)

জন্ম কানাইঘাট উপজেলার বীরদল গ্রামে। পড়াশুনা সিলেট ও শিলচরে। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক হিসেবে কাজে যোগদান করে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মূলত ভক্তিমূলক গানের রচয়িতা এবং দেশ বিভাগের পর থেকে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেছেন।

শফিকুল হক (১৯১৫-১৯৫০)

কানাইঘাটে জন্ম। পিতার নাম মোহাম্মদ হামিদ রাজা এবং মাতা সুফিয়া খাতুন। পেশা ছিল বাঁশের বাঁশি তৈরি করা। সুফি ধারার সাধক ছিলেন।

লোকগানের বাইরে অন্যান্য শিল্পিদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম রোমান্টিক গানের গায়ক বলে পরিচিত শুভ্র দেব সিলেটের সন্তান। তাঁর প্রকৃত নাম শৈবালরঞ্জন দেব এবং পিতার নাম শৈলেশরঞ্জন দেব। স্থায়ী নিবাস সুনামগঞ্জ হলেও সিলেট শহরের কাষ্টঘরস্থ নিজ বাসভবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

আমাদের জাতীয় চেতনার মূর্ত প্রতীক অপরাজেয় বাংলার ভাস্কর্যের শিল্পি সৈয়দ আবদুলাহ খালেদ সিলেটের কৃতী সন্তান।

বর্তমান সময়ের কয়েকজন লোকশিল্পির পরিচয়

সিলেট জেলায় কয়েক শতাধিক লোকশিল্পি লোকসংগীত পরিবেশন করছেন। তাদের মধ্যে জাতলোকশিল্পির সংখ্যাই শতাধিক। নাগরিক শিল্পিদেরও অনেকেই লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

এখন যারা সিলেটে জাত লোকসংগীত শিল্পি আছেন তাদের মধ্যে আমীর উদ্দিন, বিরহী কালামিয়া, পাগল কালা মিয়া, রণেশ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অল্প কিছুদিন আগে গত হয়েছেন রুহি ঠাকুর। এরা হচ্ছেন ঐতিহ্যগতভাবে লোকশিল্পি। তবে অন্যান্য অর্থাৎ নাগরিক ধারার লোকসংগীত শিল্পিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ বিদিত লাল দাস। কিংবদন্তিতুল্য প্রবীণ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পি রামকানাই দাস, প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পি হিমাংশু বিশ্বাস এবং বিমেলেন্দু রায়ও লোকসংগীতের অসাধারণ গায়ক। তবে জামাল উদ্দিন হাসান বান্না ও মালতী পাল কেবল লোকসংগীত পরিবেশন করেই কিংবদন্তির মর্যাদা লাভ করেছেন। নতুনদের মধ্যে লাভলি দে, মরিয়ম বেগম সুরমা, পংকজ দে, মিতালী চক্রবর্তী, সম্পা চন্দ, নেভি তালুকদার, জলি তালুকদার, পপি কর

www.pathagar.com

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারীও অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে লোকসংগীত পরিবেশন করেন। নজরুল সংগীতের শিল্পি শাশ্বতী চক্রবর্তী লোকসংগীতেরও উঁচু মানসম্পন্ন শিল্পি।

সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষিত হলেও তার আগ্রহ ছিল লোকধারার সংগীত সৃষ্টির দিকে। একাজে তিনি সফল ছিলেন। বহু জনপ্রিয় মরমী ও আঞ্চলিক গান সৃষ্টি করে তিনি সিলেটবাসীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

বিদিতলাল দাস

তিনি সিলেটের লোকসংগীতের কিংবদন্তিতুল্য প্রবীণ কণ্ঠশিল্পি। প্রখ্যাত এই লোকসংগীত শিল্পির জন্ম সিলেটের এক ধনাঢ্য পরিবারে। তবে লোকসংগীতকে ভালবেসে এই গানের প্রতি মনোযোগী হন এবং আজীবন লোকসংগীত পরিবেশন করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্র এবং টেলিভিশনেও সংগীত পরিবেশন করতেন। দেশের প্রায় শতাধিক জনপ্রিয় লোকগানের সুরকার। সিলেটের মরমী লোককবি হাসন রাজা, গিয়াস উদ্দিন, ধামাইল গানের জনক বা শ্রেষ্ঠরচয়িতা রাধারমণ দত্ত, সাম্প্রতিক সময়ের শ্রেষ্ঠ লোকশিল্পি শাহ্ আব্দুল করিম সহ অনেক বড় বড় লোককবির লেখা গানে তিনি নতুন করে সুর দিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগি' গানটির সুরকারও তিনি নিজে বলে সংগ্রাহককে পরিজ্ঞাত করেছেন। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। উচ্চাঙ্গ ও লোকসংগীত শিল্পি রামকানাই দাসও নিজেকে এই গানের সুরকার বলে দাবি করেন। দেশের প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দী একসময় তাঁর সংগীত দলের সদস্য ছিলেন।

মস্তফা আহমদ

বালাগঞ্জের এসময়ের একজন বড় লোককবি মস্তফা আহমদ। তিনি ১৯৪৬ খ্রি. বালাগঞ্জ থানাধীন পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়নের কায়স্থঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম হরমুজ আলী ও মাতার নাম আয়শা খাতুন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খানিকটা ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন বিধায়, নানামুখী প্রতিকূলতার কারণে অল্প বয়সে তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে তিনি অবশ্য তখন থেকেই রচনা করতে থাকেন বিভিন্ন গান। পেশায় কৃষিজীবী ও নিতান্ত দরিদ্র মস্তফা আহমদ এ পর্যন্ত রচনা করেছেন অসংখ্য মরমী ও দেশাত্মবোধক গান। স্বভাব কবিদের মতো উপস্থিত যে কোনো বিষয় নিয়েই তিনি গান রচনা করতে পারেন। মস্তফা আহমদ রচিত কয়েকটি গান লোকসংগীত অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আপ্তাব মিয়া

ফেঞ্চুগঞ্জের মরমী গায়কদের মধ্যে অন্যতম হলেন— আপ্তাব মিয়া। তিনি ১৯৪৮ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ২নং-মাইজগাঁও ইউনিয়নের পাঠানটিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তাঁর পিতার নাম মেহরাব মিয়া এবং মাতা মানিকা খাতুন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন লোক গানের ভক্ত। তাঁর দাদা শেখ কুটি মিয়া ছিলেন লোকশিল্পী। দাদার হাতেই তার সংগীতে হাতেখড়ি হয়। দাদা ও বাবার একান্ত আগ্রহে তিনি এই ধারায় আসেন। ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে তিনি দাদার সাথে লোক গান গাইতেন।

একুশ বছর বয়সে তিনি প্রথম মঞ্চে ফকিরি (সুফি প্রভাবিত) গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ফকিরি গানে তিনি ফেঞ্চুগঞ্জের সেরা। ফেঞ্চুগঞ্জের মাইজগাঁওয়ের বাউল আসরে, উপজেলার বিভিন্ন লোকসংগীতের অনুষ্ঠানে, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ এবং সিলেট সদরে তিনি ফকিরি এবং বাউল গান পরিবেশন করেছেন। আপ্তাব মিয়া প্রায় ৪২ বছর যাবৎ এই লোকসংগীতে যুক্ত। তিনি ডপ্‌কি বা ডুগডুগি বাজিয়ে গান করেন। বেহালাও বাজাতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জনক আপ্তাব মিয়া। তার এক ছেলেকে লোকসংগীতে পারদর্শী করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। বর্তমানে ৬৩ বছর বয়সেও অত্যন্ত মধুর ও সুরেলা কণ্ঠ তাঁর। শাহ্ আব্দুল করিম, রাধারমণের পাশাপাশি আপ্তাব মিয়া সবচেয়ে বেশি গান করেন ছাতকের প্রয়াত মরমী শিল্পী দুরবীন শাহ্- এর গান। এছাড়া স্বল্পশিক্ষিত আপ্তাব মিয়া নিজেও রচনা করেছেন অসংখ্য মরমী গান। তার রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মরমী গান লোকসংগীত অংশে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি ৭ অক্টোবর ২০১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যনির্দেশ

১. দুর্গাদাস লাহিড়ী; পৃথিবীর ইতিহাস-ভারতবর্ষ-প্রাচীনযুগ (২য় খণ্ড); পৃ. ২২৩

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; প্রবন্ধ পুস্তক; দ্বিতীয় ভাগ 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ'; শীর্ষক প্রবন্ধ

৩. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত; পূর্বাংশ; দ্বিতীয়ভাগ; প্রথম খণ্ড; প্রথম অধ্যায় পৃ. ১৫৪-১৫৫

৪. হৃষীকেশ চৌধুরী; পূর্বোক্ত; (*শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিকথা*; শ্রীহট্টের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রূপরেখা); পৃ. ২২

৫. নীহাররঞ্জন রায়; বাঙ্গালীর ইতিহাস; আদি পর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭৩; পৃ. ৬৩

৬. Kamala Kanta Gupta; Cupper Plates of Sylhet; Vol-1 Sylhet-1967; P: 81-128 এবং দীনেশচন্দ্র সরকার, এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস ইন ইস্ট পাকিস্তান; কলকাতা-১৯৭৩

৭. প্রাগুক্ত

৮. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি; পূর্বোক্ত; পূর্বাংশ; দ্বিতীয়ভাগ; প্রথম খণ্ড; ষষ্ঠ অধ্যায়; পরিমার্জিত দ্বিতীয় উৎস সংস্করণ পৃ. ২০১

৯. সুজিৎ চৌধুরী; (কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর উদ্ধৃতি); শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস; ২০০৬; পৃ. ১৪৪

www.pathagar.com

১০. প্রাগুক্ত।
১১. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; সিলেটের লোকগীতি ও লোকনাট্যের ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য এবং পরিবেশনারীতি; পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; শিক্ষাবর্ষ: ২০০১-০২; নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,সাভার ঢাকা; ভূমিকা অংশ
১২. গ্রিন এক্সপ্লোর সোসাইটি, ফরেস্ট্রি বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট-এর সভাপতি অনিমেষ ঘোষ এর সৌজন্যে
১৩. হৃষীকেশ চৌধুরী; শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিকথা; প্রথম অধ্যায়; ১৪০৫ বঙ্গাব্দ; (শ্রীহট্টের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেও রূপরেখা); পৃ. ২২-২৪
১৪. Ramesh C Dutta; Civilization in Ancient India; (It apparently included in those modernAssam, Manipur, and Kachar, Mymensingh and Sylhet.)
১৫. কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী; শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস; ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ; পৃ. ০২
১৬. ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; বাঙালির নৃতত্ত্ব ও হিন্দু সভ্যতা; ২০১২; রোদেলা প্রকাশনী; পৃ. ২৮-৩৩
১৭. উত্তম কুমার দেবনাথ (বাংলা একাডেমী সংগ্রাহক), কয়েছ মাহমুদ, মো. সানাউল্লাহ; 'সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ ও ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পাত্র সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক সেমিনার পেপার। উক্ত পেপার ৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টারে পড়াকালীন (২০১১খ্রি.) বাংলা বিভাগে উপস্থাপিত হয়।
১৮. চা-শ্রমিকদের তথ্য ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭-৩১ থেকে সংগৃহীত।
১৯. আবদুল করিম; মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; জানুয়ারি-১৯৯৪; পৃ. ৫১
২০. এ. এইচ. সাদত খান; স্বাধীনতা যুদ্ধে সিলেট শীর্ষক প্রবন্ধ; জেলা পরিক্রমা সিলেট (১৯৯৪) পৃ.৮২
২১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৪

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বিদ্যা প্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত সাহিত্যকে লোকসাহিত্য বলে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বিদ্যা প্রাপ্ত নন বলে যে তাঁকে নিরক্ষর হতে হবে এবং এ কারণে যে এই সাহিত্যের উৎপত্তি অবশ্যই মৌখিকভাবে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে অধিকাংশ লোকসাহিত্য-ই মৌখিকরীতিতে রচিত বলে গবেষকগণ ধারণা করেন।

লোকসাহিত্যিকগণ প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বিদ্যা প্রাপ্ত হন না, এমনকি এদের অনেকের অক্ষর জ্ঞানও থাকেনা, কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, এরা বিদ্যাহীন। গুরু বা প্রকৃতি থেকে তাঁদের কেউ কেউ অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন বলেই লোকসাহিত্য ভিন্নদেশের জ্ঞানীগুণিদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।

যেসব দেশে শতভাগ লোক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদ্যা অর্জন করেছেন; তাদের কাছে লোকসাহিত্য একধরনের প্রাচীন সাহিত্য। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে লোকসাহিত্য অদ্যাবধি জীবন্ত। সিলেট জেলায় বর্তমানে প্রচলিত কিছু লোকসাহিত্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

সুমতি ব্রতের কাহিনি

সুমতি-১

কাহিনির মূল বক্তব্য: সৎ চিন্তা থাকলে দেবীর কৃপা লাভ করা যায়।

একজন বিধবা মহিলা ছোট ছেলেকে বিয়ে করিয়ে মাত্রই নতুন বউ বাড়ি এনেছেন। এরই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে একদিন তাকে বাড়ির বাইরে যাবার প্রয়োজন পড়লো। যাবার আগে বউকে তিনি বলে গেলেন, যাতে সে সুমতিকে পান দেয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ না করে। বাড়ির সব পুরুষ কাজের লোককেও তিনি সেদিন ছুটি দিয়ে দিলেন। রইলো শুধু একজন বয়স্ক কাজের মহিলা।

বিধবা চলে যাওয়ার পর বউ চিন্তা করে দেখলো, ঘরের কাজ সে নিজেই করতে পারবে, অযথা পরিশ্রান্ত শ্বাশুড়িকে সে কষ্ট দিতে দেবেনা। আর তাই সব লোকের জন্য রান্না-বান্না সহ যাবতীয় কাজ সে নিজেই করতে লাগলো। কিন্তু অনভ্যস্ত কিশোরীবধূ যে কাজই করতে চায়, সে কাজেই বিঘ্ন ঘটে। এমনকি বেশ কয়েকটি মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। এতে সে ভীত হয়ে পড়ে এবং কাঁদতে থাকে।

কান্না শুনে পাশের ঘর থেকে কাজের মহিলা এগিয়ে আসেন এবং ভয় না পেয়ে স্নান করে আগে সুমতি দেবীকে পান দেয়ার (ব্রতকরা) কথা বলেন। কিশোরী বধূর

www.pathagar.com

তখন সুমতি দেবীর কথা মনে হয় এবং কাজের মহিলার কথামতো স্নান করে সুমতি দেবীর ব্রতাচার সম্পন্ন করেন। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর কিশোরীবধূ পুনরায় নিজ কাজে যায় এবং এবার তার সব কাজ ঠিকঠাক মতো থাকে। এমনকি যেসব দ্রব্য ভেঙ্গে গিয়েছিল সেগুলোও আগের মতো হয়ে যায়।

এদিকে শ্বাশুড়ির কাজ নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসেন এবং সব কিছু দেখে বিস্ময়ে ফেটে পড়েন। এই সময়ের মধ্যে এত কাজ ! তাও আবার এত নিখুত ভাবে ! কাজের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন 'আমি তো কিছু জানিনা, আমি তো কিছু বলিনি।' তবে আড়াল থেকে দেখে মনে হয়েছে আপনার বধু একজন যাদুকর বা ডাইনি। তিনি একবার কাঁদেন, আবার হাসেন। একবার যে জিনিস ভাঙেন, পরে সেই জিনিসই পূর্বের মতো জোরা লাগান।

বধূকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা বলেন তাতে তার বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কারণ কাজের মহিলা তো ভুল করেও রান্না ঘরে ঢুকবেনা। তার মানে সব কিছু সুমতি মা করেছেন! এমনকি ভাঙ্গা জিনিসও আগের মতো !

শ্বাশুড়ি-মা বধূকে ডেকে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন -'মা তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছো। এতদিন ব্রত করেও আমি সুমতি মায়ের দেখা পাইনি, আর তুমি এই বয়সেই তার সাক্ষাৎ পেয়েছো। তোমার মন আমার চেয়ে বড় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর।'

এই কাহিনি বাইরে প্রকাশ পাওয়ার পর, সুমতি দেবীর মাহাত্ম্যও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাঁয়ের সকলে তাঁর ব্রতাচার পালন করতে থাকে।

সুমতি-২

সুমতি (শক্তি) দেবীর কৃপায়, এক ভয়ানক দস্যুর সজ্জনে পরিণত হওয়ার কাহিনি এই ব্রতকথায় উপস্থাপিত হয়েছে।

একজন সওদাগরের ছিল সাত পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটিকে পিসির খুব ভাল লাগায় তিনি বাল্যকালেই তাকে তার কাছে নিয়ে যান। বড় হওয়ার পর পিসি না জেনে এক দস্যুর কাছে কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেন। এই দস্যু স্ত্রীকে বিয়ের পর তার পিত্রালয় বা পিসির বাড়ি কোথাও যেতে দেয়নি। আর তাই নিকট আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তার চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে।

এদিকে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায়, বার্ধক্যজনিত কারণে সওদাগরের মৃত্যু ঘটে এবং তার ছেলেরা সংসারের হাল ধরে। তারা বাণিজ্যের জন্য বড় বড় ৭টি নৌকা নিয়ে জলপথে রওয়ানা হয়। প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন করে তারা যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কারণে নৌকা ডুবে যায় এবং নিরুপায় হয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়।

নাটকীয় বিষয় এই যে, এই বাড়িটি ছিল তার বোনের বাড়ি। একথাটি যেমন ভাইয়েরা জানতোনা, তেমনি জানতোনা এদের বোনের স্বামী একজন ডাকাত। বোনও জানতোনা অতিথিরা তার ভাই। নাটকীয় এরকম একটি মুহূর্তে বাড়ির সুন্দরী বধূ অর্থাৎ

www.pathagar.com

অতিথিদের বোন এসে তাদের সতর্ক থাকতে বলে এবং রাতের মধ্যেই পালিয়ে যাবার জন্য পরামর্শ দেয়।

সওদাগরের ছেলেরা গৃহকর্তাহীন বাড়িতে সুন্দরী বধূর পরিচয় নিয়ে জানতে পারে এ তাদের বোন। কিন্তু পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেও কুমতির কারণে মহিলাটি যে তাদের বোন; একথাটি বিশ্বাস করতে পারলো না। আর তাই তাকে রেখেই ভাইয়েরা বাড়িতে ফিরে আসে।

মৃত সওদাগরের বিধবা স্ত্রী প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সুমতি দেবীর ব্রত পালন করতেন। পুত্রদের কণ্ঠে বিপদ থেকে উদ্ধারের কাহিনি শুনে তাই তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এটা সুমতি মায়ের কৃপার কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কুমতির প্রভাবও একেবারে কেটে যায়নি। আর এই জন্যই নিজের বোনকে তারা চিনতে পারেনি এবং বোনও বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেনি।

সুমতি দেবীর প্রতি সওদাগরের স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ফলে তিনি এবার ঘটা করে এই দেবীর পূজানুষ্ঠানের উদ্যোগ নিলেন এবং সেখানে তার কন্যা ও তার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভাইয়েরা জানতো তাদের বোনের স্বামী একজন কঠিন দস্যু। সে মানুষ পর্যন্ত হত্যা করে। আর তাই প্রথমে মায়ের কথায় সম্মত না হয়ে তারা তাকে আক্রমণ করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু সুমতি দেবীর কৃপায় সওদাগরের স্ত্রীর মনে সব সময় সুচিন্তা থাকে, আর তাই তার সিদ্ধান্তও সবসময় হয় সুচিন্তিত। মা সন্তানদের বোঝালেন যে, টাকার জন্যই তাদেও স্বামী দস্যুতা করে। আর তাই টাকার লোভ দেখালে অবশ্যই সে এখানে আসবে।

কৌশলে কাজ হলো। টাকার জন্য শুধু সস্ত্রীকই নয়, মা এবং সকল ভাই, এমনকি তাদের স্ত্রীদেরও নিয়ে দস্যু, সওদাগরের বাড়িতে আসলো। সুমতি মায়ের প্রসাদ এবং বাড়ির সকলের আপ্যায়ন এবং প্রচুর অর্থ লাভ করে দস্যুর মনে ভাবান্তর ঘটলো এবং দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে সে-ও শ্যালকদের মতো বাণিজ্য শুরু করলো।

সুমতি দেবীর এই মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে পড়তেই অনেকে তাঁর ব্রতাচার শুরু করলো।

সচরাচর শুক্রবার দিন সুমতি ব্রতাচারের পর, এই আখ্যানটি সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় ব্রতী বা তার সহযোগী কেউ উপস্থাপন করেন। পাড়া-প্রতিবেশীগণ বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই কাহিনি শ্রবণ করেন এবং উপস্থাপন শেষ হওয়ার পর উলুধ্বনি দেন।

সংকট তারিণী দেবীর ব্রতকথা

রাজ্যের রাজার সাত পুত্র ছিল, কিন্তু ছিলনা কোন কন্যা সন্তান। অনেক দাস থাকলেও দাসী ছিল একজন। সে প্রতিদিন ভোরে রাজবাড়িতে এসে গৃহের নানা কাজ সম্পাদন করত। ভিন্ন রাজ্যে এই দাসীর একজন গুরু ছিলেন। একদিন দাসীর রাজ্যে গুরুদেব এলে, দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন ভোরে সে কোথায় যায়? দাসীর মুখে তথ্য জেনে গুরুদেব বললেন -'যেহেতু রাজার সাতপুত্র, কিন্তু কোনো কন্যা সন্তান নেই, তাই তিনি

www.pathagar.com

উত্তম পুরুষ নন। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই তুমি উত্তম পুরুষ দেখার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ রাজার বাড়িতে তুমি আর একটু বিলম্বে প্রবেশ করবে।'

গুরুর উপদেশ শুনে পরদিন থেকে দাসী একটু বেলা করে রাজবাড়িতে গমন করতে থাকল। একদিন রাজা দাসীকে দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞস করলে সে বলল- *যদি অভয় দিন তবেই বলব।*

রাজার অভয় পেয়ে সে প্রকৃত সত্যি রাজাকে খুলে বলল। রাজা এ কথা শুনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন এবং বললেন, আর এ মুখ তিনি কাউকে দেখাবেন না। যেই বলা, সেই কাজ। রাজা তাঁর মন্দিরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলেন।

রাজা যখন মন্দিরে ধ্যানস্থ্ হয়ে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে ঠিক করলেন-তখন সেখানে দৈববাণী হল। রাজা শুনলেন, কেউ বলছেন-*দূর বোকা। এভাবে দুঃখ করে জীবন নাশ করার কোন মানে আছে নাকি। যাও তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, শঙ্কট দূর করার জন্য শঙ্কটতারিণীর ব্রত করতে। আর যে কলা তুমি আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছ, তা তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে খাওয়াও।*

রাজা একথা শুনে মন্দিরের দরজা খুললেন এবং দৈববাণী অনুযায়ী স্ত্রীকে কলা খাওয়ালেন। কিছুদিন পরই রাণী গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময় তার একটি কন্যা সন্তান হল।

কন্যা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকল, সঙ্গে খেলাধুলা এবং পড়ালেখাও চলল সমান ভাবে। ব্রতও শুরু করে দিল সে সময় মতই।

এদিকে সাত পুত্রের বিয়ে দিয়ে রাজা মারা গেলেন, রাণীরও মৃত্যু হল কিছুদিন পর। সাতপুত্রের মধ্যে বড়জন হলেন রাজ্যের নতুন রাজা। নতুন রাজা অভিষেকের পর ভাইদের নিয়ে গেলেন ভিন্ন রাজ্যে, আনন্দভ্রমণে।

সাত ভাইয়ের স্ত্রীরা খুব ভাল ছিলেন। তারা ছোট ননদটিকে খুব যত্ন করেই দেখাশুনা করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন ঘটে গেল অভাবনীয় একটি কাণ্ড। রাজবাড়িতে এক সাহায্যপ্রার্থী আসলে, রাণী তাকে জানালেন তাদের স্বামী, ননদিনী, কেউ বাড়িতে নেই। স্বামী দেবররা ভিন্ন রাজ্যে, আর ননদিনী মন্ত্রী কন্যার সঙ্গে খেলতে গেছে, কাজেই সে যেন পরেরদিন আসে। একথা শুনে সাহায্যপ্রার্থী খুব অবাক হল। *স্বামী বাড়িতে নেই, সে কথা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ননদিনীর কথা কেন রাণীকে শুনতে হবে ?*

সাহায্যপ্রার্থী বোঝাল-এটা ঠিক নয়। তাকে সাহায্য না করুক, সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু একটি বালিকার অনুমতি কেন তারা নেবে? রাণী ও তার দেবর বধূদের কি এ রাজ্যে কোন মূল্য নেই ?

রাজার ছোট ভাতৃবধূ, ননদিনীর সমবয়সী ছিলেন, তাই তার কাছে বিষয়টি অতটা অর্থবহ হলনা। কিন্তু অবশিষ্ট ৬ জনের মনে সাহায্যপ্রার্থীর কথা খুব দাগ কাটল। ননদিনীকে তারা এরপর থেকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।

ঘটনা এখানেই শেষ হলনা। ননদিনীকে দেখলে অযথা শত্রু শত্রু মনে হতে থাকায়, রাজ বাড়ির ৬ স্ত্রী ও ননদিনীর সম্পর্ক খুবই বিপজ্জনক হয়ে গেল। এমনকি তারা ননদিনীকে মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু করে দিল।

www.pathagar.com

তাদের ষড়যন্ত্র একদিন সাফল্যের মুখ দেখল। স্নান করানোর উদ্দেশ্যে বাড়ির প্রকাণ্ড একটি দিঘিতে নিয়ে ননদিনীকে তারা জলে ফেলে প্রাসাদে চলে এল।

রাজবাড়ির ছোট বউ দূর থেকে ঘটনা দেখে তাড়াতাড়ি একটি প্রকাণ্ড কোল-বালিশ নিয়ে আসলো এবং সবার অলক্ষে ওটা ননদিনীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল। ননদিনী বালিশ ধরে প্রাসাদের সীমানার বাইরে চলে গেল।

রাজ বাড়ির বড় বধূরা ভাবলো এবার আমরা স্বাধীন। এখন আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো। কাজেই তারা উৎসবের আয়োজন করতে থাকলো।

রাজার বোন জলে ভেসে বিরাট দিঘির একেবারে শেষপ্রান্তের একটি অরণ্যে এসে আটকে গেল। বিমর্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিন দিন কেটে যাওয়ার পর দৈববাণী শুনা গেল—এভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অর্থহীন জীবন-যাপনের কোন মানে নেই। তুমি সংকট তারিণীর ব্রত কর, শরীরে বল পাবে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাও, দেরি করনা।

রাজার বোন একথা শুনার পর মনে শক্তি পেল, কিন্তু ব্রত করার মতো কোন উপকরণ দেখতে পেলনা।

আবার দৈববাণী হল-যখন যা পাওয়া যায় তা দিয়েই সংকটতারিণীর ব্রত করা যায়। তুমি তিন দিনের উপবাসে আছো, সংকটতারিণীকে স্মরণ করে উপবাস ভঙ্গ কর।

রাজার বোন তথা রাণীর ননদিনী আশেপাশে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো কাছাকাছি কেবল টেরা পাতা, জবা ফুল আর শসা। ওইগুলো দিয়েই সে দেবীর ব্রত পালন করলো এবং একা একাই সুউচ্চ কণ্ঠে উলুধ্বনি দিল।

রাজা ও তার ভাইয়েরা বাণিজ্য ও ভ্রমণক্লান্ত হয়ে যখন রাজবাড়ির কাছাকাছি এল; তখন কাছে খুব পরিচিত উলুধ্বনি শুনতে পেল। মনে হলো এ যেন তাদের বোনের কণ্ঠ। পরে ভাবলো এ হতে পারেনা। কারণ এখানে তো বোন আসার কথা নয়। তবু কৌতূহল বশত জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়া থামিয়ে গেলো সেই দিঘির পাড় ঘেষা অরণ্যে।

বেশ কিছুদিনের অদেখার মধ্যে বোনের শারীরিক ও চেহারার পরিবর্তন ঘটার কারণে এবং কয়েক দিনের অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, দুশ্চিন্তার কারণে বোনকে দেখে প্রথম বড় রাজপুত্র চিনতে পারলো না। তবে বোন চিনতে পেরে সব ঘটনা খুলে বললে রাজা অবাক হলো এবং তাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইল। প্রথমে সে ভাইদের সঙ্গে যেতে না চাইলেও পরে তাদের সঙ্গে গেল এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা ছোটবউ ফাঁস করে দিল।

রাজা ও রাজভ্রাতারা তাদের স্ত্রীদের অপরাধের কথা বুঝতে পারলো। কিন্তু তারা এও ভাবলো—এটা হলো কী করে? বধূরা তো এমন ছিলনা।

বধূরা তখন ভিখারির কথা খুলে বললো এবং সংকটতারিণীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তার করুণা ভিক্ষা চাইল। রাজা এবং তার ভাইদের নিকটও ক্ষমা চাইল।

www.pathagar.com

রাজা তখন বেশ খানিকক্ষণ ভাবলেন এবং বললেন—ঠিক আছে, তোমাদের স্বাধীনতার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এজন্য এমন জঘন্য কাজও তোমরা করতে পার না। তোমাদের আমি একটা সুযোগ দিলাম। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে ছ-মাসের বনবাস দিলাম। মাত্র ছ'মাস তোমরা অরণ্য বাস করবে। যদি এই ছ'মাসে তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের পরিবর্তন আসে, তবে রাজপ্রাসাদে পূর্ণ স্বাধীনতাসহ ফিরে আসবে।

ছয় বধূ মাথা নিচু করে বনবাস গেল, সেখানে সংকটতারিণীর ব্রত করলো, আর ছয় মাস পর ফিরে আসলো সকল অধিকার নিয়ে।

ভাইয়েরা বললো—আইন ও মন সঠিক ও পবিত্র হলে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করা যায়।

কৌতুক কথা

(সিলেটে একসময় পই ও কৌতুককথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে এধরনের কৌতুককথার প্রচলন খুব কম। নিম্নে স্বল্পপ্রচলিত একটি কৌতুককথা উদ্ধৃত করা হলো।)

শিক্ষক ছাত্রের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু ছাত্র তাকে সালাম দেয়নি। শিক্ষক তখন ছাত্রকে বললেন, কিরে তোদের বাড়িতে আগে ছালাম আলী থাকত, এখন কি থাকে না?

শিক্ষক চলে গেলে, ছাত্র এ বিষয়টি তার বাবাকে বলল ।

বাবা ছেলেকে বললেন, তুই কি স্যারকে ছালাম দিয়েছিলে?

ছেলে বলল না।

বাবা বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে। আগে আমাদের বাড়িতে ছালাম আলি থাকতো। এখন আর থাকে না।

খ. কিংবদন্তি

প্রাচীনকালে কোনো ভোজ উৎসবে বর্ণিত ধর্মগুরু বা সন্ন্যাসীর মহৎ বা অলৌকিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনাকে কিংবদন্তি বলা হতো। সত্যের সঙ্গে এতে অনেকখানি আবেগ সংযুক্ত থাকতো। পরবর্তীতে ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অনেক বিষয় এর সাথে যুক্ত হয়। অলৌকিক হলেও এর সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অনেক ঐতিহাসিক তাই কিংবদন্তি থেকে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

জালালি-কবুতর ও গজার মাছ

হযরত শাহজালাল একজন সুফি সাধক ছিলেন। অন্যান্য সুফি সাধকের মতো তিনি ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। কথিত হয় যে তিনি চিরকুমার ও নিরামিষ ভোজী ছিলেন। আর তাই দিলিতে অবস্থানকালে সেখানকার বাদশা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া তাকে গজার মাছ ও কবুতর উপহার দিলে তিনি তা না খেয়ে সিলেট পর্যন্ত নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে এতদঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে সেগুলো লালন পালন করেন। বর্তমানে মাজার ও তার আশে পাশে ভিন্নধর্মী যেসব কবুতর দেখা যায়, সেগুলো ওই

www.pathagar.com

কবুতর এবং পুকুরে যে মাছ প্রত্যক্ষ হয়, তা সেই মাছের বংশধর বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

হযরত শাহজালালের সিলেট আগমন

কথিত হয়ে থাকে, হযরত শাহজালালকে তাঁর মামা এক টুকরো মাটি দান করে বলেছিলেন যে, উক্ত মৃত্তিকা সদৃশ মাটি যে স্থানে তিনি প্রত্যক্ষ করবেন, সেখানে যেন তিনি তাঁর আস্তানা গড়েন। সিলেটের মাটির সাথে সেই মৃত্তিকার সাদৃশ্য থাকাতেই তিনি এখানে অবস্থান করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

সুরমা নদী ও জায়নামাজ

বোরহান্ উদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তি সিলেটের প্রথম মুসলিম বলে কথিত। তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা জানা না গেলেও মনে করা হয় খুব ধার্মিক ছিলেন। ধারণা মতে, তখন সেখানকার রাজা ছিলেন গৌড় গোবিন্দ এবং তিনি খুব অত্যাচারী ছিলেন। তার অত্যাচারের কারণে মানুষ ছিল অতিষ্ট। তিনি রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। বোরহান উদ্দিন তার পুত্রের আকিকার সময় গো-হত্যা করেন বিধায় গৌড় গোবিন্দ সেই ছেলেকে হত্যা ও বোরহানের হাত কর্তন করেন। শাহজালাল-এর নিকট এই বার্তা পৌঁছালে তিনি সিকান্দার গাজীর সহায়তায় সিলেট আগমন করেন এবং গৌড়-গোবিন্দের প্রাসাদ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রাজা সুরমা নদী থেকে সকল যান-বাহন তুলে নিয়ে শাহজালালকে নদীর পাড়ে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। শাহজালাল তখন জায়নামাজে বসে সুরমা নদী পাড়ি দেন।

সাততলা ভেঙে পড়া

কথিত হয় যে, রাজা গৌড়-গোবিন্দের সাততলা প্রাসাদ ছিল। শাহজালাল সিলেটে এসে আজান দেয়া মাত্র সেই সাততলা ভেঙে পড়ে।

পায়রা-পালকের উড়াল দেয়া

কথিত হয়, শাহজালাল তাঁর ভাগ্নে শাহপরানকে কয়েকটি পায়রা উপহার দেন। কিন্তু শাহপরান মামার নিষেধ অমান্য করে সেই পায়রা ভক্ষণ করেন। ক্রুদ্ধ শাহজালাল এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শাহপরান বলেন এগুলো জীবিত আছে। তিনি দেখতে চাইলে পায়রার কয়েকটি পালক ফুঁ দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দেন। ততক্ষণাৎ পালকগুলো পায়রা হয়ে উড়ে যায়।

সিলেটের নামকরণ

হযরত শাহজালাল সিলেট আগমন করলে, রাজা গৌড় গোবিন্দ যাদু বিদ্যার সাহায্যে অনেক বড় বড় পাথর তার আগমন পথে ফেলে রাখেন। শাহজালাল তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-*শিল (পাথর) হট্ যা*। এই *শিল হট্* থেকে সিলেট নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা।

www.pathagar.com

গাড়িউলি ছড়া

গাড়িউল নামের এক সাপুড়ে শরিফগঞ্জের এক ধন্যাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে বসবাস করতো। সে প্রতিদিন মালিককে *বাইন* মাছ এনে খাওয়াত। একদিন মালিক তাকে অভিযোগ করে বলে যে, সে প্রতিদিন তাকে সাপ এনে খাওয়ায়। তখন গাড়িউল তার প্রতিবাদ করে এবং মালিককে প্রমাণ দিবে বলে জানায়। কিন্তু প্রমাণ করতে না পারায়, মালিকের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, সে সাপই খেয়েছিল। তাই গাড়িউলকে সে অমানুষিক অত্যাচার করে। সদয় হয়ে অন্য এক সাপুড়ে তখন গাড়িউলকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে চলে যায়। দুঃখ মিশ্রিত অশ্রু চলতি পথে গড়িয়ে পড়ে একটি *ছড়া* তৈরি করে এবং তা নূরপুর হয়ে কুশিয়ারায় চলে যায়। তারপর থেকে এর নামকরণ হয় গাড়িউলি ছড়া।

গায়েবি মসজিদ

গায়েবী মসজিদ বালাগঞ্জ উপজেলা উছমানপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। এই মসজিদের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কথিত আছে- হযরত শাহজালাল (রাঃ) এর সিলেট আগমনের পূর্বে সিলেটের টুলটিকরে হযরত বোরহান উদ্দিন বা নুরুদ্দিন সিলেটে আসেন । শাহজালাল আসার পূর্বেও এখানে মসজিদ ছিল। তবে কারা এটি তৈরি করেন তা জানা যায়নি। প্রাচীনকালে নির্মিত এই মসজিদ এক সময় বন জঙ্গল ও উইপোকার মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। শাহজালালের সিলেট আগমন কালে তার অন্যতম সফরসঙ্গী সৈয়দ উম্মর ছমর খন্দের তিন ছেলের মধ্যে সৈয়দ মাহবুব খন্দকার সৈয়দ তাহির খন্দকার ও অপর সফর সঙ্গী সৈয়দ ওসমান বাগদাদী উছমানপুর আসেন। তখন এখানে হিন্দু পুরকায়স্থ জনগোষ্ঠী বাস করতেন। এই অঞ্চলে একটি উঁচু টিলাও ছিল। টিলাটি অনেকক্ষণ কাঁটার পর একটি পাকা অংশ বেরুল। তারা ভাবলেন এটি মসজিদ। কিন্তু পুরকায়স্থরা বললেন তা মন্দির। এই নিয়ে দুদলের তর্কে এক পর্যায়ে স্থির হল মসজিদ হলে মুসলমানরা আর মন্দির হলে হিন্দুরা থাকবে। নয়তো চিরদিনের মতো চলে যেতে হবে। এই নিয়ে একটি চুক্তিও হলো। চুক্তি অনুযায়ী টিলা কাটা শুরু হলে আত্মপ্রকাশ ঘটলো গায়েবী মসজিদের। পুরকায়স্থরা এখান থেকে চলে গেলেন।

গায়েবী মসজিদের শিল্পকলা অনেক প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। এর ইট, একটি সাধারণ ইটের তিন ভাগের এক ভাগ হবে। মসজিদের দেয়ালের প্রস্থ প্রায় আড়াই হাত।

সতী পীঠ

পৌরাণিক কাহিনি ও লোকবিশ্বাস মতে, দেবতাদের এক সভাস্থল যখন ঋষি ও দেবতা দ্বারা পরিপূর্ণ, ঠিক তখন সেখানে উপস্থিত হন প্রতাপশালী দক্ষ। তাঁর আগমন ঘটা মাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ব্যতীত সকলে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। দক্ষ এতে আনন্দিত হলেও শিবের না দাঁড়ানোর বিষয়টি তাঁকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে। তিনি ভাবলেন ব্রহ্মা জনক, বিষ্ণু পালক, তাঁদের না দাঁড়ানোর বিষয়টি মেনে নেয়া যায়। কিন্তু শিব

www.pathagar.com

যত বড় দেবতাই হন না কেন; তিনি তাঁর কন্যার বর, কাজেই ওঁর না দাঁড়ানোর বিষয়টি অপমানজনক।

প্রটোকলের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে রাজা দক্ষ একসময় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন এবং কয়েকদিন পর নিজ বাড়িতে করলেন বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। বলাবাহুল্য; ওই অনুষ্ঠানের কথা তিনি সতী ও শিবের কাছে রাখলেন গোপন।

পিতৃগৃহের যজ্ঞের কথা অবশ্য সতীর নিকট লুকিয়ে রাখা গেলনা। বিষয়টি তিনি একসময় জানলেন এবং সেখানে যাবার জন্য হলেন ব্যাকুল। কিন্তু নিমন্ত্রণ না করায়; অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হতে সতীকে বারণ করলেন শিব। বাবার বাড়ির অনুষ্ঠান, আর তাই নিমন্ত্রণের কী প্রয়োজন? সতী প্রথমে বোঝালেন, পরে কাঁদলেন আর তাঁরপর ক্রুদ্ধ হয়ে ধারণ করলেন ভয়ঙ্কর রূপ।

শিব সতীর এই রূপ দেখে বিস্মিত হলেন, ভয়ও পেলেন কিছুটা। আর তাই দিয়ে দিলেন বাবার বাড়িতে যাবার অনুমতি। কিন্তু সতী পিতার বাড়িতে যাওয়া মাত্র সেখানকার সবাই তাকে নানা ভাবে অপমান করতে লাগলো। একসময় শিবের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্বের কথা শুনিয়ে সতীকে ভয়াবহ আক্রমণ করলেন কেউ কেউ। সতী·প্রথম প্রথম নীরব ছিলেন। কিন্তু পরে স্বামীর অপমান ও পতিনিন্দা সইতে না পেরে মূর্চ্ছা যান। শিবের কানে এ খবর পৌঁছামাত্র তিনি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেন এবং শ্বশুর বাড়িতে অগমন পূর্বক বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন। ঝগড়ার একপর্যায় তিনি সতীর দেহ হাতে নিয়ে তাণ্ডব লীলা শুরু করে দিলেন। এ দৃশ্যে সকল দেবতা ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাঁরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু দেখলেন যতক্ষণ শিবের হাতে সতীর দেহ থাকবে ততক্ষণ বিপদ, তাই তিনি তাঁর হাত থেকে সতীকে নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সক্ষম না হয়ে ছুঁড়ে দিলেন তাঁর সুদর্শন চক্র। এই চক্রের আঘাতে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পড়লো। যেসব স্থানে দেহখণ্ড পতিত হলো তার নাম হলো সতী পীঠস্থান। সিলেটের জৈন্তায় বামজঙ্ঘা এবং খাদিমের কালাগুল ও গোটাটিকরে গ্রীবা পতিত হওয়ায় এই সমস্ত স্থানকে যথাক্রমে বামজঙ্ঘাপীঠ ও গ্রীবা পীঠস্থান বলা হয়ে থাকে।

চৈতন্যের মাতৃগর্ভে আগমন

কথিত হয়, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেও সিলেটেই মাতৃগর্ভে আগমন করেছিলেন। বাল্যকালে সংযম পরীক্ষারজন্য গুরু তাঁর জিহ্বায় চিনি রাখেন। ৫ মিনিট পর গুরু নির্দেশ দিলে চৈতন্য সেই চিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন।

গোলাপগঞ্জের নামকরণ

অন্যান্য অনেক স্থানের মতো গোলাপগঞ্জের নামকরণের ইতিহাসও রহস্যাবৃত। আজ অবধি এমন কোনো তথ্য/প্রমাণ হস্তগত হয়নি, যা দ্বারা নামকরণ সংক্রান্ত কোনো একটি মতকে চূড়ান্ত ভাবে স্বীকার করে নেয়া যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কাহিনিই তাই ইতিহাসের একমাত্র উপজীব্য বিষয়।

একটি সূত্র মতে, এখানে বাহারি জাতের গোলাপের উৎপাদন ছিল। নবদ্বীপের সঙ্গে একদিকে সমগ্র ভারতের মানুষের, আবার অন্যদিকে ঢাকাদক্ষিণ অঞ্চলের

www.pathagar.com

মেধাবীজনগোষ্ঠীর যোগাযোগ থাকায়, এতদঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গোলাপ ফুল ও গাছের আমদানি ঘটে থাকতে পারে। স্থানীয় বাজারে ঢাকাদক্ষিণের বিখ্যাত গোলাপ ফুল ও ফুলগাছের চারা পাওয়া যেত বলে এখানকার নাম গোলাপগঞ্জ বাজার হয়েছে বলে বলে কিছু সংখ্যক জনসাধারণের ধারণা।

পাঠান আমল থেকে সিলেট জেলায় দেওয়ান পদমর্যাদার একজন স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তা অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন দিল্লি সম্রাটের প্রতিনিধি। রাজা গিরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ বহুদিন এ পদে আসীন থাকার পর পাঠান সম্রাট শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ সুরের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিঃ) গোলাব রায় নামে একজন নতুন দেওয়ান এ পদে অভিষিক্ত হন। সুরমা নদীর তীরে তিনি যে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, তার নামানুসারেই গোলাবগঞ্জ বাজার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তিতে গোলাপগঞ্জ নামে পরিচিতি পায় বলে কারো কারো ধারণা।

অন্য একটি সূত্র মতে, জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি গোলাপ দেওয়ানের নামানুসারে গোলাপগঞ্জ নামের উৎপত্তি। হেতিমগঞ্জ থেকে ঢাকাদক্ষিণ পর্যন্ত তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সড়কও এই জন্যই দেওয়ানের সড়ক নামে পরিচিত বলে তাদের ধারণা। উক্ত সড়কে অবস্থিত নাতিদীর্ঘ ব্রিজটিও *দেওয়ানের পুল* নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

সতের শতকের মধ্যভাগে সরস্বতী গ্রামে গোলাপ শাহ পীরের প্রভাবে এতদঞ্চলে সুফিবাদ তথা ইসলাম প্রচারের যে কাহিনি প্রচলিত আছে এর সঙ্গেও গোলাপগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠার সূত্র পাওয়া যায়। কাউকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানকালে অথবা ধর্মান্তরিত হওয়ার পর শুভেচ্ছা জানাতে পীর গোলাপফুল ব্যবহার করতেন এবং এ কারণে তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে তার মাজারে ফুল নিয়ে যেতেন এবং তজন্যে সেখানে গোলাপ ফুলের বাজারের প্রতিষ্ঠা ও এতদঞ্চল গোলাপগঞ্জ নামকরণে ভূষিত হয়েছে বলে সেই সূত্রের দাবি। অবশ্য সম্রাট আকবরের সময়কার একটি সেটেলমেন্ট জরিপের রেকর্ডেও গোলাপগঞ্জ নামের অস্তিত্ব রয়েছে বলে কারো কারো অভিমত। বৃটিশ শাসন আমলের একটি সরকারি মানচিত্রে গোলাপগঞ্জ থানার উল্লেখ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত কিংবদন্তির কয়েকটি সম্পর্কে সিলেটে অনেক সংগীত প্রচলিত আছে। যেমন :

১

সিলেট পরথম আজান ধ্বনি বাবায় দিয়াছে
যে ধ্বনিতে পাথর গইলা পানি হইয়াছে ॥

ইমনি (ইয়ামেনি) শাজলাল বাবা
সঙ্গে তিনশ ষাইটা ছাবা রে
বোরহানের দাওয়াতে গো বাবা
সিলট আইসাছে ॥

রাজা ছিলা গৌড়গোবিন্দ
বাবার পথ করিলা বন্ধ রে

www.pathagar.com

হায়রে জায়নামাজ বিছাইয়া গো সুরমা
পাড়ি দিয়াছে ॥

আওরে যত মুরিদান
আগে লই বাবারই নাম রে
আরে আসরে আসিয়া গো বাবা
উদয় হইয়াছে ॥

সদ্যপ্রয়াত বিদিতলাল দাস এই গানের মূল সুরকার। রামকানাই দাস পরবর্তীতে এই সুরকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন বলে জানা গেছে। একসময় গানটি খুব জনপ্রিয় ছিল।

২
কইতর (কবুতর) উড়িলরে
দুই পাংখা মেলিয়া
পালকেতে ফুঁ দিলা
শাহপরান আউলিয়া ॥

বিছমিল্লার বরকতে পায়রায়
দেহে পাইল জান
কেরামতি জাহির হৈল
কামিল শাহপরান
সেই কেরামত জাহির আছে
সয়াল জুড়িয়া॥

শাহজালালকে পায়রা দিল
নিজাম উদ্দিন পীর
সেই পায়রাগণ সিলেটেতে
বান্ধে সুখের নীড়
আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির পড়ে
তারা সবে বইয়া ॥

চটুল তাল বিশিষ্ট এই সংগীত সিলেট অঞ্চলে একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

গ. লোককবিতা

সিলেটের লোককবিতা সম্ভবত সিলেট তথা বাংলার লোকসাহিত্যাঙ্গনের এক অভিনব সৃষ্টি। এ সময়ে এর একমাত্র রচয়িতা সয়াল শাহ্। বাল্যকালে সয়াল গাঁয়ে বসবাস করতেন, পরে সিলেট শহরে স্থায়ী হন। কিন্তু সিলেটে স্থায়ী হলেও তাঁর কোনো স্থায়ী নিবাস নেই। হযরত শাহজালাল, শাহপরানের মাজার কিংবা বিভিন্ন সজ্জনের বাসায় তিনি রাত কাটান। তাঁর জন্ম ১৯৫৪ সনে, সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে। এখনো কবিতা ও সংগীত রচনা করছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার। তাঁর সংগীত

www.pathagar.com

মূলত আধ্যাত্মিক হলেও কবিতা সম্পূর্ণই স্মৃতিচারণমূলক। সিলেট জেলার প্রধান সমন্বয়কারীর কর্মস্থল এবং বাসভবনে তিনি মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন, আর এ কারণেই তাঁর অসংখ্য কবিতার কয়েকটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

১.

আমার মনে পড়ে ভুলাভুলির কথা (ভোলাভুলি)
কাতি মাস যাইতে আগন মাস আইতে
ওই রাইতরে ভুলাভুলির রাইত কইতা (বলতো)
ভোলার দিন আছতা গাউর মাইনসে (সম্পূর্ণ গ্রামের মানুষে)
কাপড় চুপর ধইয়া দিতা
ঘর দুয়ার লেপা পুছা করতা (গোবর দিয়ে লেপা, জল দিয়ে মোছা/ করতেন)
আদি চাটি ধইয়া দিতা । (দিতেন)
দাইদ্যে কইতা ভোলার দিন (দাদি বলতেন)
না ধইলে ব্যামারে ছাড়েনা
আছরর আযানোর বাদে
মুগ্‌রিবোর আগে
নেড়াবন জাইলাইয়া বাড়ির পিছে
ঘ্বরোর সামনে ধুমা দিতা। (ঘরের)
কইতা, ধুমা না দিলে বাড়িত্
ভূত পেরতে বাসা করবা।
মানুষে শয়তান বানাইয়া পুড়তো
শয়তানোর পুড়া ছালি
গাঙ্গো নিয়া ফালাইতো
মুরুব্বি অখলে কইতা ভুলার দিন
ভুলাভুলি ছাড়ানি লাগে
ভুলাভুলি না ছাড়াইলে মানুষরে
বে-ভুলায় লাগাল পায়।
দাদিয়ে দেখতাম কলার ডাক্‌লারে
আতো লইয়া ঘ্বরোর বাইরে
উটানো উবাইয়া থাখতা।
মানুষ আইয়া ভুলাভুলি ছাড়াইয়া যাইত
গরু বাছুরেরও ভুলাভুলি ছাড়াইয়া যাইত
ছাড়াইবার সময় বচন কইতা
'ভুলা ছাড় ভুলি ছাড়, বারো মাইয়া পিছাইয়া ছাড়'
'ভাত খাইয়া লড়বড়, পানি খাইয়া পেট ভর'
'খাইয়া না খাইয়া ফুল, আজার টেকার মূল'
বচন কইয়া শরিল পুইচ্ছা, কলার ডাকলারে
পানিত নিয়া ফালাইত।

www.pathagar.com

ভুলার রাইত মাইনসে খুলা পিঠা খাইতো
কইতো *খুলা পিঠা খাইলে গালফুলা ব্যামার অয়না*
আরো দেখতাম ভুলার দিন মাইনসে
'আলারমের সিন্নি' বাইট্টা দিত।
আগোর পীর ফকিরে দেখতাম
ভুলার রাইত আইলে *ফকির মেলা* দিতা
অনের মানুষ আগোর কুন্তা মানেনা (এখনকার মানুষ/ কিছুই)
এর লাগি ব্যামার-টেমারও ছাড়েনা।

২.

জন্মিয়া দেখলাম কিতা
ভাবি মনে মনে
কত জাতর মাছ খাইছি
চইত মাস আইলে।
বড় বড় বিল বাদাল
পল বাওয়া অইতো
পল বাইয়া বেটাইনতে
কত মাছ আনতো।
আমরাও খাইছি মানুষরেও দিছি
বড় বড় হৌল গজার জিয়াইয়াও থইছি
থাল লইয়া খাইতাম
রউ মাছর মাথা
আচতে অচতে মনো অয় (ধীরে ধীরে)
পুরান কাইল্যা কতা।
আগোর মানুষ ব্বালা আচিল (ভাল)
বিল বাদাল হিছতোনা (সেচতো না)
অনে গোলামর পুয়াইনতে (পোলা-রা)
কুনতাউ রাখেনা। (কোন কিছুই)
মিসিন লাগাইয়া হিছিয়া খাইলায়
ইনছাফ বিচার কুনতা নাই
বারের আকাল (বাড়ছে)
ঘ্বরে ঘ্বরে ভরা অনে
নেতা খেতার পাল।
ময়মুরব্বির মুখো হুনতাম, কইতা-
সুবুদ্ধি ভাই মরনে
দেশ পাইল অরানে
চুরায় গাইল নেয়
ঘন ঘন জিরানে।

www.pathagar.com

অন্যান্য কবিতা নিম্নরূপ-

১.

আমার মনে পড়ে পৌষ মাইয়া কথা—
গাঁও দেশের মানুষে বুরো খেতো গরুর আল বাইতো।
পৌষ মাইয়া শীতো মুরগার বাংগ আলও যাইত।
উক্কা-চুঙ্গা, আইল্যা আত থাকত,
খান্দ কইরা লাঙ্গল-জোয়াল নিত।
খেতের আইলো বইয়া আগে থাকুম খাইত
পরে আল জুড়ত পৌষ মাইয়া শীতের মাঝে
আটু পানির আল বাইত।
এক রাইত বন্দ যাইত,
আরক রাইত বাড়িত আইত।
ব্যায়ানের ভাত বন্দ যাইত,
খেতের আইল বইয়া খাইত।
ভাত খাইয়া খেতের পানি মানুষে খাইত।
পৌষ মাইয়া কামের বড় আনন্দ আছিল-
মানুষে শেষ রোয়া দিতো, দিনে -রাইতে খাম করত।
পৌষ মাসের বিশ পঁচিশ তারিখ অইলে
শেষ রোয়া'র ধুম পড়ত।
তিন চাইর গিরস্তে এক দিনে 'শেষ রোয়া দিত।
আস্তা গাঁর মানুষরে কামলা চাইত,
মানুষ দলে দলে কামলা যাইত।
কার আগে কেলায় রোয়া শেষ করত
তাড়াতাড়ি উড়াউড়ি লাগত।
একজনে আরেক জনরে 'গোফ' দিত,
ফূর্তি আমোদ করত।
খেথ রোয়া শেষ অইবার আগে হক্কলতায়
এক্কান ধলা অইয়াশেষ রোয়ার 'ডাক' কইত-
'শাহ গাজি মুরামনি,
থলে পর্ব্বতে ধ্বনি,
সংকটে গাজীর নাম
লওরে ভাই আলার নাম
আলা নিগাবান,
বলরে ভাই মমিন,
আল্লাহ-রসুল,
আল্লাহ- আল্লাহ
কইয়া খেত রোয়া শেষ করত।

www.pathagar.com

শেষ রোয়ার বড় খানি থাকত—
বিরুণ ভাত আর মরসা গুড়ের সাসনি।
বিরুণ ভাত-মরছা গুরের সাসনি না থাকলে
শেষ রোয়ার কামলা মানুষ যাইত না,
কামলা চাইলেও কেউ পাইত না।
আগের মানুষে পৌষ মাস আইলে
বুগনি খাইত, পুরিপিঠা খাইত,
আগন মাস ধান ঘেড়া কইরা পালাইত।
ঐ ঘেড়া ধানরে পুকাইয়া থইত,
পোষে মাঘে বুগনি কইরা খাইত,
পিঠা কইরা খাইত।
অনের মানুষে ইতা চিনে না,
বুগনি পিঠাও খায় না॥

২.
দুই জালের মনের কথা
নিরাই চিরাই বইলে মনে কত কথা পড়ে
চুরের মায় কান্দেনা মনে মনে ঝুরে।
মাঘ মাস ফুরাইয়া গেল, মরছা গুরের কির
খাইআ দেখলাম না।
আগে পালের নাইয়া ঘাট নাও লইআ আইত
উরদানার গুও আনত
পাচটেকা চাইরানা অইলে এক আরা গুর রাখন গেছে।
শীতের দিন আইলে মানুষে আলাদ কইরা
বিরুণ চাউল দিয়া মরছা গুরের কির কইরা খাইছে।
বার পয়সা তিন আনা অইলে
এক সের গুও পাওয়া গেছে।
মাঘ মাস আইলে দেখতাম
কত খানের পীর ফকির আইত
বেটাইতে আস্তা রাইত ফকির মেলা দিত,
লাউ ডপকি বাজাইয়া পীর মুরশিদী গান গাইত।
মরছা গুরের চা খাইআ বেটাইন অত খুশি অইত।
বড় ডেগ ভইরা মরছা গুরের কির সিন্নি করত।
পিরফকিরের সিন্নিকইআ
মানুষে খুশিঅইআ খাইত
অনে আগের পির ফকির দেকিনা
মরছা গুরের সিন্নিও করিনা ॥

www.pathagar.com

৩.

গাঁওদেশো আর একটা চল আছিল
মাঘ মাসের তের তারিখ মেঘ না অইলে
ইন্দু বেটাইনতে বাগাই সিন্নির দল করত
বেটারে বেটি বানাইয়া আনত।
রাইত অইলে ফামলাইট জ্বালাইয়া
ঢুল করতাল লইয়া গাঁও গাঁও যাইত
কইতো ঐ ঘর কে জাগেরে, বাগাই সিন্নি মাগেরে
কইয়া গান গাইত।
ঘরে বাত্তি জ্বালায় বউ দিদিগো দরজা খুল চাই,
দরজা খুলিয়া দেখ বাগাই সিন্নি গাই।
দামা গেলো লামার বন্ধে ডেমি খাইবার আশে
চিতরা ফাকরা বাঘে গিয়া লেংগুর ধইরা টানে।
আরও বচন কইতো-
চাউল কার চাউল কার গিরস্তের ঝি
সিন্নি আদায় কর যাই তাড়াতাড়ি
সিন্নি আদায় করিতে যে করবে হেলা
দুই চক্ষু খাইবে তার দুইপরি বেলা।
আগের মানুষে আদি রুছুম মানত-অনে আট মাইয়া
খরা আইলেও বাগাই সিন্নির দল করে না ফুরুতায়ও
ব্যাঙা ব্যাঙির গীত গায় না॥

৪.

আমার মনে পরে ফুরু রাইতের কথা-
মুরুব্বি অকলেই কইতো
আর নাইগো চৈত
হানকী ভইরা খাইত
আমরা ইন্দু মসলমানে এক গাঁও আছিল
পুষ মাস যাইতে মাঘ মাস আইতে
ইন্দুবাড়িত সংরানতি অইত।
কুল-করতাল বাঝাইয়া, আত তালি দিয়া
ইন্দু বেটিনত দামালি নাইছ নাচত।
আর গাছের তলে অরিলুট দিত
তিউলা, বাতেশা, কদমা আরও কথতা
আমি ইন্দু বেটিনতের লগে নাচতাম
অরিবল কইতাম (হরিবল)
অরিলুটের ইতা থুকাইয়া আইন্যা খাইতাম
রইদ না দিলে কইতাম—

www.pathagar.com

'রইদ রাজারে রইদ তুইল্যা দে
ইন্দুবাড়ির সুন্দর কইন্যারে চাল তুইল্যা দে
গাছেরতলে কাটাটুটি
গাই পড়ইছে দরা ঢেকি
গাইর নাম চম্পা, বাছুরের নাম ফুল
উঠান ফাটাইয়া রইদ তুল'॥

৫.

মাঘ মাস বিদায়া অইয়া
ফালগুন মাস আইল
বসন্তরে লগে লইয়া কাঠাল পাইক্যা আইল
ফাগুন মাস আইলে দেশো
কাঠল পাইক্যা আয়
দুই তিন মাস বাদে পাইক্যা কই গিয়া লুকায়
গাও দেশের মাইনষে কোকিলরে
কাঠর পাইক্যা কয়,
কাঠল পাইক্যায় ডাকলে-আগের মাইনষে কইত
'কাঠর পাকছে, লোকে দেখছে
ভাইরে ঝংলার বাঘে খাইছে'
আগের মানুষ আছিল সহজ সরল
কাঠল পাইক্যা ডাকলে কইত-
দুই আছির এক ভাইরে
বাঘে খাইলিছে মনের দুঃখ লাইয়া
দেশে দেশে ঘুরে।
আরও মনে পড়ে, পুলাপুরি ঘমত উইট্টা
বরই গাছের তলে যাইতাম
বরই তুকাইয়া খাইতাম।
বুলবুইল্যা পাইক্যা দেখলে খইতাম
'বুলবুইল্যারে ভাই তর পুকটি খেনে লাল?
আল্লায় বানাইয়া দিছইন ইন্দু মুসলমান।'

৬.

আগে গাও দেশো কুচি পুরার চল আছিল
চাইর পুরায় এক পালি খইত
চাইর পাইল্যে এক ভূতা অইত।
আগের মানষের কুড়ি কুড়ি গনত
ম্যাচরে দেশলী কইত
খড়ির মইয়মো নুন লইয়া খাইত

www.pathagar.com

আগের মানুষ বাজারে গেলে
তেলে বোতল আত কির নিত
আধ পাওয়া, এক ছটাক,
আধা ছটাক তেল আনত।
আগের মানুষে সুটা দিয়া কাপড় চোপর ধইত।
বুরপাড়া গেলে সুটা দিয়া মাথা গসাইত
আগের মানুষে খালি পায়ে আটত
ঘুমাইবার সময় পাও ধইয়া ঘুমাইত
আগের মানুষে খেতা উইরা ঘুমাইত
কুটুম কেশ গেলে খেতা চাইয়া নিত।
আগে গাঁও দেশে জমিদারি চল আছিল
বিচার অইলে জমিদার বাড়ির মানুষ আইত
জমিদার চেয়ারে বইত,
তালুকদার অখল বেরেইনচিত বইত
আরতা উবাচুবা থাকত। (অন্যরা দাঁড়ানো-টারানো)
জমিদারে রায় করতো মানুষ খুশি অইয়া
মাইন্যা বাড়িত আইত।
আগে মানুষ জমিদারের সামনে চেয়ারে বইত না
জমিদাররে বাঘের মতো ডরাইতো।
আগের মানুষ মাটিতে ঘুমাইত
বেড়ানিত গেলে বইবার দায় খাট দিত।
আগের মানুষ খরম পাও দিত,
খুটুম বাড়ি গেলে গতরের সার্টরে খান্দ কইরা নিত
বাড়ির দাড়কাছে গেলে গতর দিত।
আগের মানুষে গামছা কান্দ রাখত।
বুড়া বেট্টিয়ান্তে কাপড় টুকরাইয়া পিনত
গাঁও দেশো বিচার অইলে আসামি অখলতে
বিচারের রায় না মানলে
পাঁচের বাদ কইরা আগুন পানি নিষেধ নিত।
একঘর কইরা রাখত।
আগুন পানি চাইলে কেউ দিত না
অনে আগের ইতা রইছে না
আগের লাগান মানুষে মুরব্বিও মানে না॥

৭.

দুই জালের আদি কথা
বইশাগ মাস আইলে গাও দেশো
সিতলা বেমার আইয়া দেখা দিত

www.pathagar.com

মানুষ বেমার পড়লে সিতলা
বেমারির ধারো কেউ যাইতো না
সেতলা বেমারিরে মলারি টাংগাইয়া কলাপাতাত থইত।
বইসাগ মাইয়া দিন বাঘে বইশে কাম করছি
খলাত ধান ফুকাইছিএক গাইল ধান
পার দিয়া মাদানের ভাত বন্দ দিছি
আগে গাও দেশো অতথা ডাকতর আছিল না।
কোনো কোনো বছর বইসাগ মাস আইলে
কলেরা বেমারে দেখা দিত
একদিনে দশ/বার জন মানুষ মরত।
গাও দেশের মানুষও মরত
আন কট্টোয়া বেপারি বেশি মরতো।
গাঁও দেশো কলেরা বেমার অইলে
মানুষ পীর ফকির তুকাইয়া আনত
পীর ফকিরে দেখতাম রাইত অইলে
মানুষ লইয়া ঢুল ডপকি বাঝাইয়া
হযরত আলী সাবের দুয়াই দিয়া গাও বেড়াইত।
ইয়া-আলী, ইয়া-আলী কইত, বলায়ও দোয়াই মানত।
বইসাগ মাইয়া দিন মানুষে কইত
'মা মরা কোলা আয়র'
বইসাগ মাস মানুস মরলে মাটি দেউরা
মানুষ পাওয়া যাইত না
বইসাগ মাস এক রাইত মানুষ বন্দ যাইত
আরক রাইত বাড়িত আইত
অনেক মানুষে আগের লাকান বইসাগি কাম করেনা
রাইত থাকতে বন্দ যায় না।

পানচিনির কথা

আগে মানুষে আষার শাওন মাস আইলে
বিয়াসাদির ধুমধাম লাগাইত
দামান দেখা গেলে নাও বুঝাই দিয়া মুনুষ যাইত
ফুরু মানুষ একজন লগে নিত
দামানরে জিগাইত নমাজ ক'মন ফরজ কটা, কলিমা কটা
এক আল জমিন গিরচতি করলে বিচ লাগে ক'মন।
এক কিয়ার জমিন আল বাইলে আওয়াজ লাগে ক'টা।
কইন্যা দেখা গেলে কইন্যারে জিগাইত
রোজা রাখনি, কোরান পড়ছনি

www.pathagar.com

আদি চাটি পাকা বানাইতা চিননি।
কইন্যা বেটিরে বাইর বউ দুজনে ধইরা আনত
কইন্যা বেটির মাথাত গোমটা থাকত
মুখ দেখাইলে গোমটা আলাইয়া মুখ দেখাইত
কইন্যা বেটি চৌক মুইজ্যা থাকত চাইত না।
বিয়া ঠিক অইলে মাস পনর দিন
বেট্টাইতে বিয়ার গীত কইত, ধামাইল দিত
কইন্যার মারে দামানদের মারে লইয়া পেক খেইল খেলত
উঠানো ফালইয়া পেখো গরাইত
বিয়ার বাজার আট করবার দায়
গণগুষ্ঠি দলা অইত আরিপরিরেও কইত
আগের মানুষে গুরের চা খাইত
চা জাল দিলে আটিবাড়ি তুকাইয়া চার কাপ আনত।
কেউ কেউ দেখতাম মাটির কট্টায় চা খাইত।
বিয়ার বাজারও গেলে উদাম নাও যাইত
ডেগ ভইরা ভাত নিত বাজার গিয়া কলা কিইন্যা ভাত খাইত
বাড়িত আইবার সময় বংগুলা ফুটাইয়া ফুটাইয়া ঘাট আইত
বিয়ার বাজার গেলে ফুরু মানুষ ছাড়া যাইত না।

বিয়াশাদীর কথা

আগের দিনও বিয়ার বৈরাতি মানুষ গেছে
তফন চাইয়া আনছে,
জুতা চাইয়া আনছে, কেউ সাটও চাইয়া নিচে
বুরা বেটাইতে পাঞ্জাবি কান্দ লইয়া নাও উঠছে
কইন্যার বাড়ির ধারে কাছে গেলে পাঞ্জাবি গতর দিছে।
দামানদের পাও দিবার দায় চামড়ার জুতা
তুকাইয়া পাওয়া যাইত না।
নিজের গাঁও না পাইলে কুটুমবাড়িত খবর দিত
কুটুমে লইয়া আইত।
জুতা বড় অইলে জুতার ভিতরে
তেনা বইর‍্যা দামানরে পিন্দাইছে।
কোন কোন দামনদের নাও
কলের গান বাজাইয়া গেলে
গাও গেরামের মানুষ কলে গানের ইওয়াজ হুইন্যা
দৌড়িয়া গাংগের পার আইত, ছিলাইয়া বাড়ি জিগাইত।
পাংসি নায় দামান গেলে
বেটাবেটি হক্কলতায় ঘাটের পার
উবাইয়া তমসা দেখত

www.pathagar.com

দামানদের নাও কইন্যার বাড়ি গেলে
ঘাটে নাও বিরাইবার লাগি দিত না
এক ঘণ্টা বাদে দামান বাড়িত তুলত।
আগের মাইনষে কলা গাছ দিয়া গেইট বানাইত
গেইটো দামানরে বেন্দা ধইরা আটকাইত
দামান্দে টেকা দিয়া ছুইট্যা যাইত।
হালাহাইল্যে চার দোকান দিত
দুলাভাইরে চা-পান খাবাইত
ইচ্ছামত টেকা রাখত।
দামান্দের লগে নাও বুঝাই দিয়া বৈরাতি যাইত।
হারা রাইত বৈরাতির পালে উমউমি ডাকত।
ফামলাইট জালাইয়া বাড়ি ফর করত।
দামান্দের লগে ছিলক কউড়া নিত
ফুইন্তের পাল পান্দান লইয়া
দামান্দের ধার আইত, ছিলক কইত॥ .

ছিলক

আসমান থাক থাক
জমিনের দুআই
আপনার লাগি আনছি পানদান
থইতাম কোয়াই।

ভাঙ্গানি

আনছ হাওয়ার ভরে
থও পানদান মাটি ভরে।

ছিলক

অরা খাইলায় বরা খাইলায়
আরও খাইলায় দই
সংগে কইরা নিতায় আইছ
মা না মই

ভাঙ্গানি

অরা খাইলায় বরা খাইলায়
আরও খাইলাম বিরি
সংগে কইরা নিতাম আইছি
আপনার স্ত্রী।

www.pathagar.com

ছিলক

আসসালামুলাইকুম ভাই এলে
দামান আইছইন শশুর বাড়ি
তুমরা আইছ কেনে।

ভাঙ্গানি

আসসালামুলাইকুম ভাই উবা
দামান আইছর শশুর বাড়ি
আমরা আইছি শুভা।

ছিলক

ইঝলের জড়ি মরি
পিতলের ছানি
কোনদেশে দেইক্কা আইছি
গাছের আগাত পানি

ভাঙ্গানি

নাইকল (নারিকেল)।

ঘ. লোকছড়া

এক. রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ছড়া

১.

পশমর ঘরর দুয়ার খোলা
খাগায় ধান খাইলোরে
ডাকাইবার মানুষ নাই,
খাইবার বেলায় আছে মানুষ
কাজের বেলায় নাই।

২.

জাননি আমি কিতা করি ?
গুয়া গাছ দি দাঁত মাজি
কইলে কইবা গফ করি
তাল গাছ আমার আতর ছড়ি ॥ (হাতের)

আমার নাম মঙ্গল
দেখলাম হ-গালাত্ জঙ্গল
জঙ্গল-অ গিয়া দেখি

www.pathagar.com

মস্ত বড় এক সাপ।
সাপরে দিলাম এখান লাথি
অই গেলগি হাতি
হাতিরে দিলাম মোড়া
অই গেলগি ঘোড়া
ঘোড়ার উপরে উঠিয়া
গেলাম হউর বাড়ি
হউর বাড়ি গিয়া দেখলাম
হালাহালি তিন কুড়ি।

হালিয়ে আইন্যা দিল
বোয়াল মাছোর পেটি
আমি কি আর বেটি
খাওয়া ছাড়ি উঠি
হ্উরে দিল কুদাম্
অই গেলাম উদাম্
মারল আমারে থাবা
অই গেলাম হাবা॥

➢ সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই ছড়া একে অপরকে বলে।

যদি দুই ভাইয়ের নামের শেষ বর্ণের মিল থাকে, তাহলে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে ছড়া আবৃত্তি হয়—

যেমন—
শফিক রফিক দুই ভাই
পথ বইয়া খাইয়া যাই
শফিকে কয় খাই লাই (খেয়ে ফেলি)
রফিকে কয় লইলাই। (নিয়ে যাই)

একজন অপরজনকে ব্যঙ্গ করে এ ধরনের ছড়াও বলে—

ইলিশ মাছর তিরিশ কাটা (মাছের)
বোয়াল মাছর দাড়ি
সানিয়ে ভিক্ষা করে
রশিদর বাড়ি। (রশিদের)

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাস্টারের কাছে পড়তে যেতে বললে নিম্নোক্ত ছড়া বলে-

মাস্টার মাস্টার কয় আলি (হালি)
ডিম পাড়ে ছয় আলি
একটা ডিম ভাঙ্গা
মাস্টারর হড়ির হাঙ্গা। (মাস্টারের)

ছোট ছেলেমেয়েরা খেয়াল বশত কখনো কখনো নিম্নোক্ত ধরনের ছড়া বলে-

www.pathagar.com

১.

ওয়ান টু থিরি
পাইলাম একটা বিড়ি
বিড়িত নাই আগুন
পাইলাম একটা বেগুন
বেগুনো নাই বিচি বেগুনে
পাইলাম একটা কাচি
কাচিত্ নাই ধার
পাইলাম একটা হার
ঘারো নাই লকেট ঘরে
পাইলাম একটা পকেট
পকেটো নাই টাকা
কেমনে যাইমু ঢাকা
ঢাকাত নাই গাড়ি
কেমনে যাইমু বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
মারলাম একটা পাদ
পাদো নাই গন্দ
হাইস্কুল বন্দ
হাইস্কুলে গেলাম না
বেতোর বাড়ি খাইলাম না
বেত গেলো উড়িয়া
মাস্টর গেলো কান্দিয়া।

২

আইজ ইস্কুল বন্ধ
গোলাপ ফুলর গন্ধ
গোলাপ ফুল সাদা
মাস্টর বাবু গাধা

৩

আমার নাম মিতা
চুলো বান্দি ফিতা বাঁধি
কানো পিন্দি দুল পরিধান করি
লাল গোলাপের ফুল।

৪

ও বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলিনা
তাইর লগে আড়ি

www.pathagar.com

যাই না তাইর বাড়ি
তাইর বাড়ি দু'তলা
কাক ডাকে ইশারা
এাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল লইয়া খেলা করি
পুতুলের মাথাত লম্বা চুল
বাইন্ধা দিমু গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলো পোকা
জামাইবাবু বোকা।

৫
উরি পাতা ঝনঝন
দুলাভাই তোর তিন জন
আমি বেটি গরীব বেটি.
লবন কিনিয়া খাই
আতির উপরে পাড়া দিয়া — হাতি
বাপর বাড়ি যাই।

৬
টুনটুনি ভাই পাখি
নাচোতো দেখি,
নারে বাবা নাচতাম্ না — নাচবো
পড়ি গেলে বাচতাম্ না — বাঁচব
বড় আফার বিয়া
কসকো সাবান দিয়া
কসকো সাবান বালা না — ভালো
আফার বিয়া অইলো না।

৭
আমার একটা মুরগী ছিল
হঠাৎ করি মারা গেল
হায় আল্লা কিতা অইল
ধান তাকি চাউল অইল
চাল অইল ভাঙ্গা
কুদাল দিয়া চাঙ্গা
কুদাল অইল বাকা
কামাল গেল ঢাকা।

www.pathagar.com

৮

ভটলা ভটলি দারোগা (স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতী)
ডিম পাড়ে তেরোটা
একটা ডিম নষ্ট
ভটলা ভটলির কষ্ট।

৯

এক দুই তিন
পাইলাম একান বিন (বীণ)
বিন-অ নাই বাঁশি (বীণে)
পাইলাম একান কাঁচি
কাঁচির মাঝে নাই ধার
পাইলাম একান হার। (একখান)
হারো নাই লকেট (হারে)
পাইলাম একান পকেট
পকেটো নাই টেকা (টাকা) (পকেটে)
কিলা যাইতাম ঢাকা (কী করে)
ঢাকাত নাই গাড়ি (ঢাকাতে)
কিলা যাইতাম বাড়ি
বাড়িত নাই ছাগল
আমি অইলাম পাগল ॥

জামাল বা কামাল নামের কাউকে ক্ষেপানোর জন্য

জামাল কামাল দুই ভাই
পতো পাইল মরা গাই (পথে পেল)
চলো মিলে ভাজা খাই।

সানি নামের কাউকে ব্যঙ্গ করে

ইলিশ মাছর তিরিশ কাটা

অন্য কাউকে ক্ষ্যাপানোর জন্য

ক.

অউ হালারে ধর
চুঙ্গার মাঝে ভর
চুঙ্গা নিছে চামারে
বাপ কইছ আমারে।

খ.

দাঁত পড়া বান্দর
বইলো গাছোর গুড়িত্

www.pathagar.com

পাতি কাউয়ায় বিট্টা দিল
ভাংগা গাছোর গুড়িত্।

গ.

বাবু রাম দাস
কাটে সোনার ঘাস
খায় ঘোড়ার লেদা
বাবু রাম ভেদা।

অধিক শীতের সময় আগুনের পাশে বসে শিশু কিশোররা বলে—

শীত করেগো বুড়ি মাই
কাতার তলে জেগা নাই
কাতা নিল শিয়ালে
আইন্যা দিল বিয়ালে।

ভিন্ন পাঠ—
সিত করে গো বুড়ি মাই (শীত)
খেতার তলে জাগা নাই (কাঁথা)
খেতা নিল হিয়ালে
আইন্যা দিল বিয়ালে। (শৃগাল/বিকাল)
--প্রচণ্ড শীতের সময় এ ছড়াটি বলে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়।

অন্যান্য রসাত্মক ছড়া—

১
উগার তলে বিরইন ধান (বিন্নি)
ঝম্‌ঝমাইয়া মেঘ আন। (উগার-ধানের ভাড়ার)
--- প্রচণ্ড খড়ার সময় বৃষ্টির প্রার্থনা করে এ ছড়াটি বলা হয়।

২.
পরানোর ভাই নিতাই
টিকি জ্বালাইয়া তামাক খাই
তামাক কেনে জ্বলেনা
টিকি কেনে পুড়েনা।

৩.
আয়রে ভাই সবাই
দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আই
রাষ্ট্র গেরামের মাঝে
সুন্দর কইন্যা নাই।

www.pathagar.com

ঘরে আছে সুন্দর নারী
পিনতো চায় ঢাকার শাড়ি
ঢাকার শাড়ির নাল মোটা
ধইতে লাগে আধমন ছুটা
পাড়ার লোকে দেয় খুটা
এ বড় লজ্জা।
ভাটি পাড়ার আফতর আলী
ঘরে বসি মাতে কথা
তার ঘাটে গি লাগছে টিয়া
বলদ বেচি করে বিয়া
মাউগে গছেনা।
শুনরে ভাই লোকজন
দেশে আইল বিজ্ঞাপন
কলের সূতা গলে দিয়া
জাতে ভরা মন।

আহম্মক সম্পর্কে বাণী

আড়ুয়া (আহাম্মক) নাম্বার এক
বড় লোকের সাথে ধরে ট্যাক
আড়ুয়া নাম্বার দুই
পতর পুকুর-অ (পথের পুকুরে) ফলায় (চাষ করে) রুই।
আড়ুয়া নাম্বার তিন
ছোট লোকের কাছে করে ঋণ।
আড়ুয়া নাম্বর চার
ঘরের কথা করে বার (বাহির)।
আড়ুয়া নাম্বার পাঁচ
সীমানায় রয় (রোপণ করে) গাছ।
আড়ুয়া নাম্বার ছয়
হকল কথাত্ (সব কথায়) কয় (বলে) অয় (হ্যাঁ)।
আড়ুয়া নাম্বার সাত
বউয়ের লগে (সাথে) রাগ করি খায়না ভাত।
আড়ুয়া নাম্বার আট
কথার নাই কোনো বাট (বুদ্ধি)।
আড়ুয়া নাম্বার নয়
বউয়ের কাছে গোপন কথা কয়।
আড়ুয়া নাম্বার দশ
বউয়ে করে বশ।

www.pathagar.com

বিদ্রুপাত্মক ছড়া

গাং দেখলে মুত আয় (নদী, প্রশ্রাব ধরে)
লাং দেখলে আসি আয়। (প্রেমিক, হাসি আসে)
----নদী দেখলে প্রশ্রাব করার ইচ্ছে জাগে; প্রেমিককে দেখলে হাসি আসে

বিয়ের রঙ্গ বিষয়ক ছড়া

বিয়ের সময় বরপক্ষ কনের বাড়িতে আসলে কোনো কোনো বিয়ে বাড়িতে নিম্নরূপ কৌতুকপ্রদ ছড়া প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। প্রথমে কনেপক্ষ জিজ্ঞেস করে—

পান খাও পণ্ডিত মশাই
কথা কও ধীরে
এই পান জন্ম লইছে
কোন কোন স্থানে
যদি না কইতায় (বলতে) পার
পানের এই বারতা
বড়বড়ি ছাগল হইয়া
খাইবায় (খাবে) শেওরার পাতা।

বরপক্ষ এই ধাঁধা বা পই এর উত্তরে বলে-

আকল গাছের বাকল পাতা
ধর্ম গাছর (গাছের) লতা।
কোন ছাগিয়ে জিগায় গো (জিজ্ঞাসা করে) বইন (বোন)
পান সুপারির কথা
আমি তো ছাগল নায় (নই) গো বইন (বোন)
খাইতাম শেওরার পাতা
মানুষ হইয়া জিগায়রায় (জিজ্ঞাসা করছ)
বানরামি কথা।

কনেপক্ষ তখন বলে-

দুলাভাই,
ডেকার হইছেনা অঙ্গ-জল
ডেকির হইছেনা বিয়া
আফনার (আপনার) লাগি আনছি শরবত
পুঙ্গা গাইর দুধ দিয়া।

বরপক্ষ উত্তরে বলে-

ডেকার হইছে অঙ্গজল
ডেকির হইছে বিয়া
শালিগো আম্রার (আমাদের) লাগি আনছ শরবত
কালার গাইর দুধ দিয়া।

www.pathagar.com

নতুন বর এলে কনে পক্ষ বলে কিংবা শ্যালক শ্যালিকারা বলে–

কনে পক্ষ– আসসালামালাইকুম, ভাইছাব হকল (সকল)
পানর (পানের) বাটা (পানদানি) তেরা (বাঁকা)
খাইয়া যাও বিদেশি মেরা (ভেড়া)।

বরপক্ষ/ ছেলেপক্ষ বলে–

পানর বাটা (পানদানি) ভাই
ই-ঘরর (এই ঘরের) বান্দি দেখি নাই?

বিবাহ আসরের রঙ্গ

১.
নানি গো নানি-
চাঙো কিতায় লড়ে
মাতিছ নাগো হারামজাদি
মুরগে এন্ডা পারে।
মুরগে দিল ফাল
খাইলায়নিরে-
বইরাতির পাল।

২.
বেশ বেশ দুলাভাই
বেস্তে আপনার বাসা
অতো দিনে দুলাভাইর
পুরলো মনোর আশা।
গান হুনো মিষ্টি মিষ্টি
পয়সা লাগেনা
পকেটেতে টেকা থইয়া
বুকে মানেনা।
তিনশ টেকা চলিশ টেকা
এরুই বড় ধন
এলাগি দুলাভাইর
বেজার অইল মন।
দশ টেকা পাচ টেকা
কচু পাতার পানি
এর লাগি দুলাভাইয়ে
করইন কানাকানি।

www.pathagar.com

দুই. ক্রীড়া বিষয়ক ছড়া

বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন রকম ছড়ার প্রচলন আজো দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন: **ইরি বিরি** খেলার একটি ছড়া।

ইরি বিড়ি বিননাথ
তিড়ি বিরি গাছ
বাড়ির পিছনে চব্বিশ গাছ
যারে সেখানে পাইমু
ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইমু
ছাড়লাম ডাক
লুকাইয়া থাক।

ইচিং-বিচিং খেলার ছড়া-

ইচিং বিচিং তিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
এক <u>লাটি</u> চন্দন পাটি (লাঠি)
চন্দন বলে কা কা
চড়ুই পাখি দারোগা
ডিম পারে তেরটা
একটা ডিম নষ্ট
চড়ুই পাখির কষ্ট।

বিভিন্ন খেলাকে কেন্দ্র করে এধরনের আরো বহু ছড়া সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত। যেমন:

১.

আকাশে তিন তারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি
ঠাণ্ডা লেবুর পানি
আমার আব্বু কালা
দূরের সকুল ভালা
আম আম আম
কাঁচা মিচি আম
বাজারে গিয়া দেখি
পাঁচ টাকা দাম
জাম জাম জাম
কাঁচা মিচা জাম
বাজারে গিয়া দেখি
পাঁচ টাকা দাম।

www.pathagar.com

২.

এ পেস টু পেস টু
নাইন টেন টেস টু
সুলতানা বিবি আনা
রাজবাড়ির বৈঠক খানা
রাজবাড়িতে যাব
পান সুপারি খাব
পানের আগায় মরিচ বাঁটা
ইস্কাবনের ছবি আঁকা
আমার নাম রেনুবালা
মালা মালা মালা।

ভিন্ন পাঠ—

এভেনটু বাস্টু
নাইন টেন টেস্টু
সুলতানা বেবিআনা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বাবু এসেছে
পান সুপারি খেয়েছে
পানের আগা মরিচ বাটা
যার নাম বেনু আলা
তারে দেব মুক্তার মালা।

মেয়েরা খেলার সময় গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে এই ছড়া বলে।

অন্যান্য ছড়া—

হাওয়ায় মেলো
ছিলো ছালো
কি কী ছিল
লেবু ছিল
কী লেবু
বাতি লেবু
কী বাতি
মোম বাতি
কী মোম
সাদা মোম
কী সাদা
দুধ সাদা

www.pathagar.com

কী দুধ
ফেনা দুধ
কী ফেনা
সাবান ফেনা
কী সাবান
বল সাবান
কী বল
ফুটবল
কী ফুট
সেন্টার ফুট
কী সেন্টার
বাটা সেন্টার
কী বাটা
মরিচ বাটা
কী মরিচ
লাল মরিচ
কী লাল
রক্ত লাল
কী রক্ত
মানুষের রক্ত
কোন মানুষ
দেশের মানুষ
কোন দেশ
বাংলাদেশ
কী বাংলা
সোনার বাংলা।

–দু'ই বা ততোধিক ছেলে মেয়ে একে অপরের হাতে তালি দিয়ে এই ছড়াটি বলে।

আজি এলনা বেলনা
লাইলার পাতার ঝুম
আজি সালাইনা মালাইনা
সালামালাইকুম্।

–এ ছড়াটি বলে মুখ বন্ধ করে চুপ থাকতে হবে, এমনকি হাত-পা পর্যন্ত নাড়ানো যাবে না। কথা বললে বা হাত-পা নাড়ালে হেরে যাবে।

একধরনের ছোঁয়াছোঁয়ি খেলার পূর্বে নিম্নোক্ত ছড়াটি বলে—

হাতে কী
কমলা লেবু

www.pathagar.com

খাওনা কেনে
চুকা লাগে — টক্
ফালাও না কেনে — লাফ দেয়া
মায়া লাগে
যাকে তোমার ভালো লাগে
তাকে তুমি ছুঁয়ে ফেলো।

মেয়েদের খেলায় উদ্ধৃত অন্যান্য ছড়ার মধ্যে আছে—

১.

মেলা গো মেলা
আমরা সবাই খেলা
পুকুর পারে একটি মেয়ে বসে আছে
তার কোন সাথী নেই
ওঠো গো ওঠো
চোখের পানি মুছো

২.

টম এন্ড জেরি
ফিলা ফিজা ভেরি
বাকবা উহ্ উহ্ উহ্
বাবা আহ্ আহ্ আহ্
বাবা আহ্ বাবা উহ্
অরেঞ্জ কমলার রস

৩

সি মে ছিয়া ছিয়া
নম্বর ফাইভ ফ্যাট ফ্যাট
মেক্সিকলা ম্যাগাজিন
সানডে ইজ এ নো পাপা
–ছড়াটি চারবার চার বিশেষ ভঙ্গিমায় তালে তালে বলতে হয়।

৪

আই এম সরি
লাম্বা লাম্বা দাড়ি
বাত্তি বাত্তি মুছ — বেটে বেটে
তুই আমার দোছ
আমার বাবা অফিসার
আমার মা ডাক্তার

www.pathagar.com

আমার বোন নাচুম নাচুম
আমার ভাই ডুসুম ডুসুম।
–হাত-পা দুলিয়ে ছড়াটি বলতে হয়।

৫

ওয়ান টু থ্রি স্ট্রাট
কাবি উপরে কাবি নীচে
কাবি উল্টো
কাবি ভাইটল
কাবি এছে
কাবি বেছে
কাবি হেনছিপ
কাবি ভাই ভাই

৬

আও মেলো ছিলো ছালো
রেডি বয় রেডি গার্ল
পিং পং
রিক্সাওয়ালা
চাইনিজওয়ালা
গাড়িওয়ালা
সাইকেলওয়ালা
সাত সমুদ্র পেরিয়ে
মামা এল বেড়িয়ে
ভাইকে বলনা
চিড়িয়াখানায় চলনা
চিড়িয়াখানায় হাতি
তুই আমার সাথী।

৭

উরি পাতা খেরাইয়া
ব্যাটা ওসতে ধর আইয়া
–কাবাডি (হাডুডু) খেলায় এ ছড়াটি বলা হয়।

৮

ফুল ফুলটি
একে দুলটি
তেলটি
জাম জামটি

www.pathagar.com

একে দুর জামটি
সুসাম সুসাম সুসামটি
একে দুর সুসামটি
কদম কদম কদমটি
একে দুর কদমটি
বকুল বকুল বকুলটি
একে দুর বকুলটি
তারুজাম তারুজামটি
একে দুর তারু জামটি
মুক কাচা মুক কাচাটি
একে দুর মুক কাচাটি

৯

সাচ্চা হার ফুলবাহার ফুলবাহারটি
লন্ট মুড়ি কণ্ঠ তুরি কণ্ঠ তুলিটি
সারি সাজাইলাম ঘুঁটি বসাইলাম
ঘুঁটির নাম চন্দন
যাইবে ঘুঁটি লন্ডন।

১০

একে একা
দুইয়ে ধোকা
তিনে তেনা
চাইরে চানা
পঞ্চে পাখা
ছয়ে রিকা
সাতে সাবনা
আটে বেদনা
নয়ে নবঘোড়া
দশে পালাজোড়া
এগারোয় একটি
বারোয় জাপটি
তেরয় তেলি কাটা
চৌদ্দয় রূপার বাটা
পনেরয় পান খাই
ষোলয় গান গাই
সতেরয় সোয়া ধন
আটারয় কাটিয়াল

www.pathagar.com

উনিশে এম
বিশে গেম
একুশে উল
বাইশে বুল
তেইশে নদীর কুল
চব্বিশে কদম ফুল
পঁচিশে পদ্মফুল
ছাব্বিশে ছাবিয়া তোল
সাতাইশে স্বাধীনতা
আটাইশে আটুভাঙ্গা
ঊনত্রিশে অয়বাংলা
ত্রিশে জয় বাংলা
একত্রিশে একটি তুলি
বত্রিশে ঘঁটি তুলি
—ছাক্কুট
ছাক্কুট একটা পানের বাটা
থুক্কু দিয়া পাচ গেছা।
—সিলেটের মেয়েরা ছোট নুড়ি পাথর দিয়ে খেলার সময় এই ছড়া বলে।

১১

নুনতা এক
নুনতা দুই
নুনতা তিন
নুনতা চার
নুনতা পাঁচ
নুনতা ছয়

১২

আমার ঘরে কেটারে
আমিরে
কি খাই
লবন খাই
লবনর সের কত
এইটা এইটা (বুড়ি আংগুল দেখিয়ে)
আমারে একটা দিবেনি
<u>ছইতে পারছেতে</u> নিবে গি। (ছুঁইতে পারিস তো নিয়ে যাবি)
—ছোঁয়াছোঁয়ি খেলা। দৌড়তে হবে। বসলে ছোঁয়া যাবেনা।

www.pathagar.com

কুৎকুৎ খেলার ছড়া

চল কুৎ কুৎ আনাইয়া
নৌকা দিমু বানাইয়া
যদি নৌকা উড়ে
বিয়া দিমু দূরে।

তিন. বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে রচিত ছড়া

সচরাচর প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে একটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতে বলে, ২য়জন সেই শব্দটি উচ্চারণ করলে ১ম জন উত্তরে ২য়জনকে একটি অপমানসূচক সম্পূর্ণ বাক্য (২য় পঙক্তি) বলে। যেমনঃ

১. ক-চাইন দেখি (বলতো দেখি)– **চুঙ্গা**
তোর হড়ি (শাশুড়ি) পুঙ্গা।
২. ক-চাইন দেখি (বলতো দেখি)– **রেলের ডাব্বা**
খবিছ বেটা (মন্দ লোক) তোর আব্বা।
৩. -চাইন দেখি–**পুরইল** (এক প্রকার সবজি)
তার শাশুড়ির পায়ে ধুরল (সাপ)।
৪. ক-চাইন দেখি –**কাঁচি**
ধুরিণ (খারাপ মহিলা) তর (তোর) চাচি। প্রভৃতি।

প্রথম বালক, দ্বিতীয় বালককে উদ্দেশ্য করে যদি বলে:<u>ক-চাইন</u> ইয়া। (<u>বলতো</u> ইয়া)

কোনো কিছু বুঝে বা না বুঝে বা জেনে শুনেই দ্বিতীয় বালক যখন ওই শব্দটি বলে, তখন উত্তরে প্রথম বালক বলে-

কাইল তোর বিয়া।

যেমনঃ

১.

১ম জনঃ ক-চাইন ইয়া
২য় জনঃ ইয়া
১ম জনঃ কাইল তোর বিয়া।
এরূপ---

২.

ক-চাইন ভেঙ্গা
ভেঙ্গা
কাইল তোর হেঙ্গা।

৩.

ক-চাইন আমার।
আমার
তুই আমার চামার।

www.pathagar.com

৪.

ক-চাইন সাপ
সাপ
ভিক্ষা বেটা তোর বাপ।

৫.

ক-চাইন আকর
আকর
তুই আমার চাকর।

অর্থাৎ প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে একটি শব্দ বলতে বলে। দ্বিতীয়জন শব্দটি উচ্চারণ করামাত্র প্রথমজন একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলে তাকে জব্দ করে বা বোকা বানায়।

চার. উদ্দেশ্যহীন বা সাধারণ ছড়া

১.

পাঁচ টাকা দাম
জাম জাম জাম
কাঁচা মিচা জাম
বাজারে গিয়া দেখি
পাঁচ টাকা দাম।

২.

সাধু সাবধান
ভাঙ্গা লাঠির আধাখান
লাউয়ে লাবড়া বিচিয়ে বড়া
সাধু বড় কপাল পোড়া।

৩.

বাঁশের পাতা চিকন চিকন
বাটির পাতা গুল
ব্যাদা ছেলের লগে জাইন্যো
পিরিত করা ভুল।

৪.

ইচা-
কুটলে মিছা
রানলে বউরা
খাইলায় হউররা ॥

৫.

কিবা দেশে আইলাম রেবা
কিবা তার গুণ,

www.pathagar.com

একই গাছে পান সুপারি
একই গাছে চুন।

৬.

নানি গো নানি
বইষে ধান খায় মহিষে
পুবর বাতাসে নানির পূর্ব দিকের
গোলাক নাড়া যায়।
এক পাতলা কচুর মাঝে
তিন পাতলা পানি
হাড়িকর উপরে বিলাইয়ে নাচে
হুইন্‌না যাওগো নানি।

৭.

গেছলাম উত্তরে
ঢোল বাজায় ভিত্তরে
ঢোলে ঘুমাঘুম
মাদারিয়ার ছাও
কেনে কুররা জল বাও।

৮

আসমানে চান উঠে
লগে লইয়া তারা
আমি কি থাকতে পারি
বন্ধু তোমায় ছাড়া।

৯

বাঁশের পাতা চিকন চিকন
বাটির পাতা গুল
ব্যাদা ছেলের লগেরে ভাই
প্রেম করা ভুল।

পাঁচ. ভাই ফোঁটা উপলক্ষে

১.

যমুনিয়ে দেয় যমরে ফোঁটা
আমি দেই আমার ভাইরে ফোঁটা
আইজতাকি আমার ভাই বেটা
যম দুয়ারে দিলাম কাঁটা
হাটে যাইও মাঠে যাইও
বইনের কাছে ফিরিয়া আইও ॥

www.pathagar.com

২.
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা
অগস্ত্য মুনির আয়ু পাইও
বছরে বছরে বইনের হাতে ফোঁটা খাইও ॥

বর্ষায় নিচু জায়গায় জল এলে ডিঙি নৌকায় চড়ে কিশোর রা বলে—
এলং মাছর তেলং তেলং
পাইব্যা (পাবদা) মাছর গছা (কাটা)
নয়া কইন্যার বুড়া জামাই
নিত্য করে গুসা (রাগ) রে
রঙের নাও রঙের বৈঠা।

কিস্‌সা বলার আগে কথক এধরনের ছড়া বলেন—
এক ঘটি পানি
কিচ্ছা আনি
এক ঘটি নুন
কিচ্ছা হুন
এক ঘটি খই
কিচ্ছা কই
এক ঘটি তেল
কিচ্ছা গেল।

ঙ. পাঁচালি

সিলেট অঞ্চলের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ধরনের ব্রত অদ্যাবধি প্রচলিত থাকায়, সেই ব্রত উপলক্ষে পাঁচালি পাঠেরও প্রয়োজন পড়ে। সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই কারো না কারো বাসায় ব্রত অনুষ্ঠিত হয় এবং পঠিত হয় পাঁচালি। নিম্নে এধরনের কয়েকটি পাঁচালী উপস্থাপন করা হল :

১. শ্রী শনিদেবের পাঁচালী

বন্দনা : নমঃ শ্রীগনেশায় নমঃ
নমঃ নারায়ণং নমস্কৃতং নরোশ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততোজয় মুদিরয়েৎ।
বেদে রামায়ণশ্চৈব পুরাণে ভারতে স্তথা।
আদৌ চন্দ্রে চ অন্তেচ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে।
নমঃ নারায়ণায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমঃ।
বন্দিদেব গজানন পার্ব্বতী নন্দন।

www.pathagar.com

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর আর দেবগণ।
সর্ববিঘ্নে নাশ হয় তোমায় শরণে।
অগ্রেতে তোমার পূজা করিনু যতনে।
আদিদেব নিরঞ্জন ক্ষীরোদ শয়ন।
বন্দিলাম ভূমি লুণ্ঠিত তাঁহার চরণ।
যাঁহার হুঙ্কারে সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ।
ত্রিনয়নী তাহার বিন্দনু চরণ।
বেসমাতা সরস্বতী লহনু শরণ।
বন্দিলাম করজোড়ে পদ কমলার।
বৃন্দাবনে বন্দিলাম রাধাশক্তিকার।
সকলের পাদপদ্মে করিলাম নতি।
সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর কহিব ভারতী।
যাঁহার শরণে হয় সর্ব্বদুঃখ জয়।
যাঁহার শরণে গ্রহে লক্ষ্মী স্থায়ী রয়।
তাঁহার চরিত্রগুণ করিব বর্ণন।
সকলেতে মন দিয়া করহ শ্রবণ।
স্কন্দ পুরাণেতে লিখেছেন মুনিবর।
শনির চরিত্র গুণ অতি মনোহর।
জপ-তপ-উপচারে যেই পূজা করে।
সেইজন সুখী হয় শনৈশ্চর বরে।
অপুত্র হইলে তার পুত্র জন্মে ঘরে
সর্বসুখে সুখী হয় সেই শনিবরে।
সেবক লিখিল গ্রন্থ করিয়া সন্ধান।
শনির পাঁচালী কথার পুরাণ আখ্যান।

ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

শ্রীহরি নামেতে এক ছিল বিপ্রবর
করিতে ব্রাহ্মণ সেবা ছিল তাঁর মন ।
নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পুরণ
তাহাতে দ্বিজ সেবাও হয় অনুক্ষণ।
বিনা চিন্তামনি চিন্তা, অন্য চিন্তা নাই
কেমনে সে চিন্তামনি চিনিবারে পাই।
অন্তরে সদাই সুখি অন্ন নাই পেটে
তথাপি কৃষ্ণের নাম লয় অকপটে।
হেনকালে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল
হেরিয়া তাহার মুখ আনন্দে ভাসিল।

www.pathagar.com

হরিদাস পুত্র নাম রাখিল ব্রাহ্মণ
পাঠশালে দেন তারে করিতে পঠন।
হরিদাস সুশীল সকলে গুণ গায়
অল্পদিন মাঝে সে শিখে সমুদয়।
শাস্ত্রজ্ঞ হইল ক্রমে শাস্ত্র আলোচনে
পণ্ডিত বলিয়া তারে সকলেই গণে।
কিন্তু তার কিছুতেই নাই অন্য মতি
সদা চিন্তা কিসে পাবে কমলার পতি।
সকল বিদ্যায় ক্রমে হইলে নিপুণ
চারিদিকে সকলেতে গায় তার গুণ।
কালেতে সকলি হয় এক করে খণ্ডন
পড়িল শনির দৃষ্টি দ্বিজের নন্দন।
শনিতে হরিল বল, বুদ্ধি গেল দূরে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিজ গেল বহু দূরে।
যে দশাতে আপনি পড়িয়া ভগবান
গণ্ডকীতে শীলাকাটি পাইলেক ত্রাণ।
চতুর্দ্দশ গবর্ষ যে শীলা কাটছিল
শালগ্রাম তাহাতে শীলা নাম হৈল।
ইন্দ্র অঙ্গে ভগের যে চিহ্ন হয়েছিল
সেই শনি কোপে পড়ে ভ্রমিতে লাগিল।
বিদর্ভ নগরে গিয়ে হ'ল উপনীত
আশ্চর্য্য হইল দেখি রাজার চরিত।

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

সেখানে রাজা হয় শ্রীবৎস ভূপতি।
সর্ব্বগুণে গুণাকর সদা ধর্ম্মে মতি।
তাঁহার সভায় দ্বিজ হ'ল উপনীত।
অভ্যর্থনা করে রাজা হ'য়ে হরষিত।
কোথায় নিবাস বলি কহ নরপতি।
কোন বংশে জাত হও বল হে সম্প্রতি।
শুনিয়া দ্বিজের পুত্র কহে সমাচার।
হরিদাস নাম ধরি সাধু ব্যবহার।
অতি দীন দুঃখী আমি নাহি পিতামাতা।
স্বদেশে বিদেশে থাকি যাই যথা তথা।
বাতুলের প্রায় আমি ভ্রমি দেশে দেশে।
জীবন ধারণ করি অতি কায় ক্লেশে।
শ্রীবৎস বলেন দ্বিজ চিন্তা পরিহর।
আমার আলয় থাকি মোরে কৃপা কর।

www.pathagar.com

শাস্ত্রেতে নিপুণ তুমি বুঝি অনুমানে।
আমারে করহ তুষ্ট বাক্যের সন্ধানে।
আমার আছয়ে দুই যুগল নন্দন।
তব স্থানে পড়াইব এই আকিঞ্চন।
কোন কষ্ট নাহি তার সদা সুখে রয়।
রাজ পণ্ডিত বলি লোক হ'ল পরিচয়।
মিষ্টভাষী সদা করে মিষ্ট আলাপন।
নৃপতির পুত্রদ্বয় করে অধ্যয়ন।
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত।
বালকের বেশে শনি হইল উপনীত।
হরিদাস নিকটেতে দিল দরশন।
পড়ুয়ার মত শনি চিনে কোন জন।
চিনিতে নারিকেল দ্বিজ শনির ছলনা।
শনির রূপেতে মন হইল মগনা।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর কহ বাছাধন।
কোন কার্য হেতু তব হ'ল আগমন।
শনি বলে মহাশয় কর অবধান।
পড়িতে আইনু আমি তোমা বিদ্যমান।
বিপ্র বলে যথাসুখে কর বিদ্যাভ্যাস।
যত্নের সহিত তোমায় পড়াব বিশাষ।
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য সন্তুষ্ট হইল।
তাহার নিকটে শনি পড়িতে লাগিল।
ব্যাকরণ স্মৃতি কাব্য সাঙ্খ্য দরশন।
অল্পদিন মধ্যে সব কৈল অধ্যয়ন।
সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ হইল শনি।
বিপ্রবর পরিচয় চাইল তখনি।
শনি বলে শুন কিবা নিজ পরিচয়।
শনৈশ্চর নাম মম সূর্যের তনয়।
শুনিয়া তাহার বাক্য বিপ্রবর কয়।
বড় সৌভাগ্য আমার শুনি পরিচয়।
গ্রহের প্রধান তুমি মান্য দেবতা।
আমাকে করিলে কৃপা কি কহিব আহা।
যদি হে প্রসন্ন দেব হলে আমা' পরে।
কিসে কষ্ট দূর মম হইবার পারে।
তাহার সন্ধান কথা কহ দেখি শুনি।
ব্যথায় ব্যথিত বড় আকুল পরাণি।
আমার রাশিতে আছে তোমার কটাক্ষ।

www.pathagar.com

কিসে যাবে বল দেখি হইয়া সপক্ষ।
শনি বলে বলি তব শুন মহাশয়।
মম ভোগ দশ বর্ষ কাল মাত্র রয়।
আর অবশিষ্ট ভোগ দশ মাস আছে।
দশদণ্ড যাবে না আসিবে পাছে।
সেই দশদণ্ড তুমি পাবে অতিকষ্ট।
পশ্চাতে যাইলে ক্লেশ ঘুচিবে অরিষ্ট।
সপ্তম দিবসে গিয়ে ভাগীরথী তীরে।
এক মনে এক ধ্যানে ভজ মুরারিরে।
মম কোপ হতে পাবে অবশ্যই মুক্তি।
কহিলাম সত্য আমি এই স্থির যুক্তি।
এতবলি শনিদেব হল অন্তর্দ্ধান।
আর না দেখিতে পায় বিপ্রের সন্তান।
শনি আজ্ঞা মত পরে গিয়া গঙ্গাতীরে।
একমনে নারায়ণ বসে ভজিবারে।
দশদণ্ড পূর্ণ হইল হেন জ্ঞান করি।
উঠিয়া দাঁড়ায় বলি শ্রীহরি শ্রীহরি।
দশদণ্ড পূর্ণ নহে দেখিল যখন।
নয়ন মুদিয়া পুনঃ ভজে নারায়ণ।
সূর্য-পুত্র মনে কোপাবিষ্ট হল।
নারায়ণে সাক্ষী করি তখন বলিল।
আপনার দোষে কষ্ট পাইবে ব্রাহ্মণ।
মম কিবা দোষ ইথে দৈবের ঘটন।
আমি যা কৈনু তার কৈল বিপরীত।
বুঝে-পড়ে শাস্তি দিব যা হয় বিহিত।
যে দুই রাজার পুত্রে পড়াইতে দ্বিজে।
মায়াকরি দুই পুত্র হরি নিল নিজে।
নিজমায়া মন্ত্রে দুই শিশুমুণ্ড গড়ি।
বিপ্রের নিকটে লয়ে গেল তারা করি।
নয়ন মুদিয়া ধ্যান করে দ্বিজবর।
ফেলিয়া দিলেন মুণ্ড উরুর উপর।
হেথায় শ্রীবৎস রাজা শয়নেতে ছিল।
পুত্র অমঙ্গল যত স্বপনে দেখিল।
স্বপন দেখিয়া রাজা শশব্যস্ত হ'য়ে।
বিপ্রের নিকটে দ্রুবত চলিলেক ধেয়ে।
দেখিয়া বিপ্রের কোলে পুত্র মুণ্ডদ্বয়।

www.pathagar.com

হাহাকার করি রাজা ভূতলে গড়ায়।
সেবক কহিছে রাজা কেন হও ভ্রান্ত।
অচিরে পাইবে পুত্র না জান বৃত্তান্ত।

দীর্ঘ ত্রিপদী

রাজা অতি দুঃখ মনে শিরে করাঘাত হানে,
কাঁদিয়া করে হাহাকার।
হায়রে দারুণ বিধি, এই কি হ'ল বিধি,
প্রাণনিধি করিল সংহার।
বিদ্যাবন্ত জন দেখি, তাহারে সাদরে রাখি,
পড়িবারে দিনু যত্ন করি।
হবে পুত্র গুণবাণ, সুখেতে জুড়াবে প্রাণ,
এই বাঞ্ছা সদা মনে করি।
হিতে হল বিপরীত, বিপ্র হয়ে দস্যুরীত,
আমায় করিল সর্বনাশ।
স্মরিতি বাছার মুখ, বিদরিয়া যার বুক,
ভাল কর্ম্ম করিলে প্রকাশ।
হেথা অন্তঃপুরে রাণী, একথা শ্রবণি শুনি,
এলে থেলো পাগলিনী প্রায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, নয়ন নীরেতে ভাসে,
বলে মম হৃদি ফেটে যায়।
আমি রে ভজঙ্গফণি, তুইরে আমার মনি,
মরি আমি তোমার বিহনে।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, মা মা বলিয়ে ডাক,
শ্রবণে জুড়াইব মন-প্রাণ।
কান্দন শ্রীবৎসরাজ, জীবনেতে কিবা কাজ,
যদি গেল মম পুত্র নিধি।
কোথা বাপ পুত্র ধন, কোলে আয় যাদুধন,
তোর শোকে কান্দি নিরবধি।
ক্রোধে হল অঙ্গ ভারি, আর না সহিতে পারি,
চরে ডাকি দিল অনুমতি।
শুন ওরে চরগণ, কর রে বিপ্রে বন্দন,
কারাগারে রাখহ সম্প্রতি।
সেবক কাতরে কন, না কর বিপ্রে নন্দন,
বিপ্র হ'ন সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
আজ্ঞামাত্র চরগণ ব্রাহ্মণে বান্ধিল।
গলা ধাক্কা দিয়ে তারে কারাগারে নিল।
বিপ্রের নয়ন বারি ঝরে অবিরত।

www.pathagar.com

বলে হায় একি ঘোর প্রমাদ ঘটিল।
শুনিছে আপদ নাশে ভবানী চরণ।
সকল বিপদ হন্তা শ্রীমধুসূদন।
রক্ষা কর দয়াময় এ ঘোর সঙ্কটে।
ভূপতির ক্রোধ দেখে মম হৃদি ফাঁটে।
বিদেশে এসেছি আমি নাহি জানি ছল।
এ দুঃখ কহিব আর কাহারে বল।
এইরূপে বিপ্রবর কারাগারে কান্দে।
শুনিলে ফাটে হৃদয় কিবা কব ছন্দে।
অতঃপর শুন সবে হয়ে একমন।
দশদণ্ড বেলা পূর্ণ হইল যখন।
পুত্র শোকে নৃপবর আছেন কাতর।
হেন কালে দুই পুত্র আইল সত্বর।
চরণে প্রণাম করি পড়ে লুটাইয়া।
পিতা-মাতা বলি ডাকে ব্যাকুল হইয়া।
রাজা বলে কোথা ছিলে অন্ধের নয়ন।
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ।
দুই পুত্র বলেছিনু করিয়া শয়ন।
দূতগণে কহে রাজা আনহ ব্রাহ্মণ।
ইহার বৃত্তান্ত কথা জানে সেই দ্বিজে।
বিপ্রেরে দিলাম কষ্ট না বুঝিয়া নিজে।
আজ্ঞামাত্র দূতগণ আনে বিপ্রবরে।
শীর্ণ কলেবর বিপ্র কান্দেন কাতরে।
ভূপতি সে বিপ্রবের করে নানাস্তুতি।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি মহামতি।
না জেনে তোমারে কষ্ট দিলাম যে আমি।
সকলের নিকট আমি হলাম বদনামী।
ত্বরায় করহ মম সন্দেহ ভঞ্জন।
কোন শিশু মুণ্ডদ্বয় দেখিনু তখন।
বিপ্র কহে মহারাজ করি নিবেদন।
কিছুমাত্র নাহি জানি তাহার কারণ।
শনি দোষে কষ্ট পাই ঘটায় প্রমাদ।
শনির সে খেলা ভূপ মম পরিবাদ।
সকলি ঈশ্বর-ইচ্ছা ঘটব অঘটন ।
আর কেন সেই কথা কর উত্থাপন।
রাজা বলে সত্য করি মানি।
গ্রহ দোষে নানা কষ্ট ভালরূপ জানি।

www.pathagar.com

যদি হে কখনও হয় শনি দরশন।
পূজিয়ে তাঁহার পদ করি নিবারণ।
ষোড়শোপচারে পূঁজি নানা উপচারে।
ভক্তিতে সাধনা করি বিধি ব্যবহারে।
বিপ্র বলে মহারাজ স্থির কর মতি।
এখনি জানাব আমি শনি গ্রহ-পতি।
এত বলি বিপ্রবর করিল স্তবন।
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি দিল দরশন।
শনির চরণে রাজা পড়ে লুটাইয়া।
বহুবিধ স্তব করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তোমার করিব পূজা করিয়াছি মন।
এ-দাসের অপরাধ কর বিমোচন।
তুমি হে গ্রহের শ্রেষ্ঠ দেব শনৈশ্চর।
রাখ মার সবই পার ইচ্ছায় তোমার।
আমি অতি নরাধম কি জানি মহিমা।
নিজগুণে কর প্রভু সব দোষ ক্ষমা।
তপন তনয় তুমি সর্ব গুণধাম।
তোমায় যে চিনে তার পুরে মনস্কাম।
করিব তোমারই পূজা করিয়াছি মন।
অনুগ্রহ করি দেব করহে গ্রহণ।
পূজার পদ্ধতি প্রভু কভু নাহি জানি।
নিজ মুখে কহ তাহা জুড়াক হৃদয়মণি।
শুনিয়া রাজার স্তব শনিগ্রহ কয়।
ক্ষমিলার অপরাধ নাহি আর ভয়।
পূজার নিয়ম মম শুনহ ভূপতি।
তুমি অতি বুদ্ধিমান সুজ্ঞান সুমতি।
আমার বারেতে শুদ্ধ পরিয়া বসন।
করিবে আমার ব্রত হয়ে শুদ্ধ মন।
নীলবস্ত্র তিল তৈল লৌহের আসন।
মাষকলাই আদি করিবে আয়োজন।
কৃষ্ণবর্ণ ঘট চাই করিতে স্থাপন।
পঞ্চ জাতি ফল ফুলে করিবে অর্চ্চন।
দরিদ্র বিধান তার কহিলাম সার।
ভক্তিই প্রধান কার কি কহিব আর।
ভক্তি করি যেবা করে আমার পূজন।
ক্ষণমাত্রে হয় তার দুঃখ বিমোচন।
পূজা অন্তে করিবেক আমায় প্রণাম।

www.pathagar.com

নবগ্রহ স্তোত্র পাঠে লইবেক নাম।
পরেতে প্রসাদ খাবে করিয়া ভকতি।
পাপ-তাপ যাইবে দূরে পাইবে মুকতি।
রাত্রিতে লইবে প্রসাদ বাসি না করিবে।
অভক্তিতে নিলে পরে প্রমাদ ঘটিবে।
আমার পূজাতে যারা করে অনাদর।
চিরকাল দুঃখে তারা হইবে কাতর।
এই কথা বলে শনি হ'ল অন্তর্দ্ধান।
ভক্তিতে করেন রাজা শনির পূজন।
প্রতি শনিবারে পূজা করে নববর।
ধন দিয়া বিপ্রগণের তুষিল অন্তর।
ইন্দ্রের অধিক ধন হইল তাঁহার।
সুখের নাহিক সীমা ঐশ্বর্য অপার।

শঙ্খপতি সওদাগরের উপাখ্যান

শনির প্রভাব দেখি এক ডোমনারী।
মানস করিল বহু স্তুতি ভক্তি করি।
আমার দুহিতাসহ সাধু সদাগ্ররে।
বিবাহ হইলে শনি পূজির সত্বরে।
শনির সকল কার্য্য অতীব অদ্ভুত।
বাণিজ্যে আইল এক সওদাগর সুত।
বিবাহ করিয়া সেই ডোমের কুমারী।
বাণিজ্যে চলিল পুনঃ শুভযাত্রা করি।
শনি পূজা করিবারে শাশুড়ি কহিল।
বাণিজ্যে পূজিব বলি সাধু চলি গেল।
দক্ষিণ রাজার দেশে হ'ল উপনীত।
বেচাকিনী করে সদা আশা অতিরিক্ত।
বহুদিন লভ্য হয় ধন রত্ন হার।
নাহি পূজে শনিশ্চয়ে সদা অহঙ্কার।
দেখিয়া সাধুর রীতি, শনি ক্রোধে জ্বলে।
নিশিযোগে রাজাকে বলেন স্বপ্ন ছলে।
তব ভাণ্ডারের সব চুনি মুক্তা ধন।
চুরি করি নিয়ে যায় সাধু মহাজন।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কহে কোটালেতে।
সদাগর বান্ধি আন আমার সাক্ষাতে।
আজ্ঞা মাত্র সদাগরে বান্ধিয়া আনিল।
কারাগারে রাখিবারে রাজা আজ্ঞা দিল।

www.pathagar.com

কাঁদিয়া সাধুর সুত বন্দীঘরে যায়।
মনে ভাবে শনির সেবায় আছি বড় দায়ে।
এত বলি শনৈশ্চরে করে আরাধন।
বন্ধন মুক্ত কর পূজিব চরণ।
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু নিজ দাসে।
তব পূজা করি নৌকা ভাসাইব দেশে।
তুষ্ট হয়ে শনি পুনঃ ভূপে আদেশিল।
সাধু সুত চোর নয় মম কোপে ছিল।
স্বপ্ন দেখি করে রাজা সাধুকে বিদায়।
পূজা করি সওদাগরে নিজ বাসে যায়।
শাশুড়িকে প্রণমিয়া ধন ঘরে নিল।
বহুবিধ উপাচারে শনিকে পূজিল।
এই মতে শনি পূজা যেই জন করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দূরে।
শনির পাঁচালী গ্রন্থ গৃহে থাকে যার।
সুখ শান্তিময় তার হইবে সংসার।
অতএব বন্ধুগণ ধরহ বচন।
ভক্তি করি শনিগ্রহ করিবে গঠন।
সকল বিপদ হতে পাবে পরিত্রাণ।
বেদেতে সকল কথা আছয়ে প্রমাণ।
হরি হরি মুখে বল যত বন্ধুগণ।
শনির পাঁচালী কথা হল সমাপন।

২. মনসার পাঁচালী

বন্দনা

মাতাপিতার চরণ বন্দি অমূল্য রতন॥
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই
গুরুতে ভাবিয়া মনে প্রণামও জানাই॥
দেব বন্দি দেবী বন্দি বন্দি পদ্মাবতী
বন্দি তাহার মাতাপিতা শঙ্কর ও পার্বতী॥
আস্তিক মুনি বন্দিলাম আমি সর্প ভয় যায় দূরে।
নাগ-নাগিনী বন্দিলাম এবার ভক্তিভরে অন্তরে॥
নাগ সংক্রান্তি ব্রতকথা বলিব এখন।
ব্রতকথা দিয়া মন শুন ব্রতীগণ॥

মায়ার উপখ্যান

বহুগুনে গুণী সাধু উজানিতে বাস।
ধনে জনে অপার তার নাই কোন ত্রাস॥

www.pathagar.com

সাত পুতের পিতা সাধু ধনে ধনঞ্জয়।
বৃন্দা নামে পত্নী তার সে সদয়॥
ধর্মশালী পত্নী তাহার আছে ধন জন।
সাত পুতের জননী হইয়া সদায় খুশী মন॥
সুন্দরের সুন্দর কুমার তারা সাত ভাই।
খাওয়া পরা চলা ফেরার কোন অভাব নাই॥
সবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদাম নাম ধরে।
প্রাপ্ত বয়সের কালে বিবাহ দিল তারে॥
একে একে ছয় ভাই আগে করে বিয়া।
শ্যামলা বিমলা বধূ কোকিলা বিজয়া॥
আলোমতি চিত্রমতি বধূর নাম ধরে।
সবার ছোট বধুর নাম মায়া ডাকে তারে॥
একদিন মায়া জল আনিতে গেল জলের ঘাটে।
ডিম্ব দুই দেখিল মায়া পড়ে রইছে তটে॥
কৌতুহল বশত: আনিল বাড়িতে।
গোপন স্থানে রাখে ডিম্ব মাটির এক হাঁড়িতে॥
যেমনে রাখিল ডিম্ব লক্ষ নাই আর তায়।
হঠাৎ একদিন হাড়ির ভেতর গর্জন শোনা যায়॥
গর্জন শুনিয়া মায়া দেখে হাড়ি খোলে।
অষ্টফনা নাগের ছানা গর্জে আর খেলে॥
লাঠি হাতে নিয়া বধু মারিবারে যায়।
নাগ ছানার মুখে কথা শুনিবারে পায়॥
বধিও না গো মায়া ভগিনী আমার।
আমারে পুষিয়া রাখো পাইবে সহায়॥
নাগ ছানার কথা মায়া করিয়া শ্রবণ।
গোপনে রাখিয়া ছানা করিছে পালন॥
ধীরে ধীরে অষ্ট নাগ বড় হইয়া গেল।
মনে মনে মায়ারে তারা আপনও ভাবিল॥
স্বভাব বশে অষ্ট নাগ ফোঁস ফোঁস শব্দ করে।
মায়া বধূ চিন্তা করে কেমনে রাখি তারে॥
শব্দ শুনে ঘরে বাইরে সর্ব জনে খোঁজে।
দেখে মায়া পড়িল অতি ভীষনও লাজে॥
গোপনে গিয়া মায়া কহিল নাগের ঠাই।
এমন করে তোমায় বল কেমনে রাখি ভাই॥
অরন্য জঙ্গলে যাও ভাই তুমি চলি।
না হয় স্বজন মিলে মারিবে তোমায় মিলে॥
অষ্টনাগে শুনিয়া তবে বলিলা তখন।

www.pathagar.com

চিন্তা নাহি কর ভগ্নি চলি যাই এখন।
বিপদে পড়িলে ভগ্নি করিবায় স্মরণ।
তোমার শত্রু যত আছে করিব নিধন॥
এই বলিয়া অষ্টনাগে ছাড়িলা ভূবন।
মনসার কাছে গিয়া কহে বিবরণ॥
আমারে যতন করি পুষিলা মা মায়া।
ভগ্নি বলি জানি তারে রাখিও মা দয়া॥
এ জগতে কোন কথা গোপন নাহি রয়।
ধীরে ধীরে শাশুড়ী তার জানিলা নিশ্চয়॥
নাগ পুষিল মায়া বধূ মারিল গৃহের মান।
যদি নাগে ছোবল দিব যাইত কত প্রাণ॥
নানা মতে কত কথা কহিতে লাগিল।
শাশুড়ীর কটু কথা নিরবে সহিল॥
দৈববানী শুনি একদিন ঘরের বাহির হইল।
বাহির হইয়া ঘরের ধারে এক স্বর্ণ আংটি পাইল॥
যতনে রাখিল মায়া স্বর্ণ আংটিখানি।
যখনি ঘষিবে আংটি নাগ আসে তখনি॥
মায়ার হাতে আংটি দেখে বিমলা ভাবিল।
মায়া এই স্বর্ণের আংটি কোথায় পাইল॥
বিমলা জানাইল গিয়া শ্রীদামের কাছে।
তোমার প্রেয়সীর কাছে আংটি এক আছে॥
কোথা হইতে পাইল মায়া এই স্বর্ণধন।
যাও শ্রীদাম জিজ্ঞেস কর মায়ারে এখন॥
রাগে দন্ত কটকট করে বলে শ্রীদাম।
পরের দেওয়া আংটি হাতে থাকি আমার ধাম॥
কোনজনে দিল আংটি বলিবা এখন।
শ্রীদামে মায়ার প্রতি করিছে গর্জন॥
মিনতি করিয়া বলে স্বামীর কাছে মায়া।
পন্থে পাইলাম আংটি হইও না নিদয়া॥
লোকের কথায় কেন তুমি কর কানাকানি।
তোমার ছাড়া ওগো স্বামী অন্য নাহি জানি॥
এমন ব্যবহারে দুঃখ তোমাতে আমি পাই।
বল স্বামী তুমি বিনে আমি কার কাছে যাই॥
নীতি বাক্য না শুনে শ্রীদাম ক্রোধিত হইয়া।
মারিবারে যায় স্ত্রীর চুলেতে ধরিয়া॥
স্বজন আসিয়া পরে মুক্ত করল তারে।
সময় সময় অল্প দোষে মায়ারে শ্রীধাম মারে॥

www.pathagar.com

নানা সময়ে গৃহজনে কটু বাক্য কয়।
নির্দোষী মায়া বধু নিরবে তাহা সয়॥
একদিন একরাতে শ্রীধাম ঘরের কপাট খুলে।
গলাধাক্কা দিয়া তারে দিল বাহিরে ফেলে॥
বাহিরে রাখিয়া দিল কপাটে তালা।
কত দুঃখ দিল শ্রীধাম যায় না মুখে বলা ॥
মনের দুঃখে মায়া কান্দে বাহিরে বসিয়া।
হেনকালে নিদ্রা দেবী দিল ঘুম পাড়িয়া॥
মৃত্তিকার উপরে মায়া সুখে নিদ্রা যায়।
স্বপনে পদ্মাবতী দেখা দিলা তায়॥
এত কষ্ট কেন কর মায়া বধুরাণী।
অষ্টনাগে স্মরণ কর আংটি ঘষে তুমি॥
ঘুমের ঘোরে পদ্মাবতী প্রণামও করিল।
কোন দেবী তুমি মাগো জানিতে চাহিল॥
পদ্মাবতী বলিলেন এখন নাহি কই।
আমি এক দেবী বটে সাপের রানী হই॥
অষ্টনাগে স্মরণ কর মনেতে ভাবিয়া।
অষ্টনাগে মম স্থানে যাইব তব লইয়া॥
এই বলিয়া পদ্মাবতী অন্তর্ধান হইল।
অষ্টনাগে ডাকিয়া মায়া সব কথা কইল॥
ঘুমের ঘোরে মায়া বধূ বলে নাগের ঠাই।
তুমি অষ্টনাগের কারণ আমি দুঃখ পাই॥
ভগ্নি বলি জানো যদি উদ্ধার কর মোরে।
অকাতরে বিনয় করি ডাকি যে তোমারে॥
ডাক শুনিয়া অষ্টনাগে বলিল তখন।
এত দুঃখ পাইলে বোনগো কেন কও এখন॥
কাল প্রভাতে আসিব বোনগো তোমারে লইতে।
ভাই বলি পরিচয় দিল আসিলে বাড়িতে॥
মনসার আজ্ঞা নিয়া অষ্টফনাধারী।
মনুষ্যরূপ ধরি আইল মায়ার বাড়ি॥
ভগ্নি ভগ্নি ডাকি ডাকি গেল মায়ার ঠাই।
আসিয়াছি আমি ভগ্নি আর দুঃখ নাই॥
শাশুড়িরে মাঐ ডাকে মায়ার লয় মতে।
ভগ্নি নাইওর নিতে আইলাম ঐ ঐরাবতে॥
হাতি দেখি নতুন পুরুষ কানাকানি করে।
তাড়াতাড়ি সাজাও বধূ লইয়া যাউক পরে॥
ছয় জালে পরে বলে দেও বিদায় করি।

www.pathagar.com

আর যেনো কোনদিন আসেনা সে বাড়ি॥
শ্রীধামে দিল আজ্ঞা আমার বাধা নাই।
পরপুরুষে ভালোবাসে চলিয়া যাউক তাই॥
প্রণাম করিল মায়া সকলেরে বিধি মতে।
ত্বরাকরি উঠিল গিয়া ঐ ঐরাবতে॥
মায়া যায় তারা চায় আড়ে আড়ে থাকি।
লুকাইয়া শ্রীধাম গেল কি হয় যাই দেখি॥
কিছু দূরে গিয়া নাগে আসল রূপ ধরে।
শূন্যে উড়া দিয়া চলে মায়া পিঠে চড়ে॥
মায়ারূপি হাতি ছিল গেল উধাও হইয়া।
বাতাসে মিশিল হাতি দেখে শ্রীধাম বইয়া॥
সব দেখি হতবাক শ্রীধাম হইল।
খুলিয়া বৃত্তান্ত গিয়া সবার কাছে কইল॥
এদিকে মায়া গেল অষ্টনাগ চড়ি।
অষ্টনাগে লইয়া গেল মনসার পুরী॥
প্রণাম জানাইল মায়া মায়ের পদ ধরি।
মনসা বলিলা মায়া থাকো আমায় স্মরি॥
কিছুদিন থাকিয়া মায়া জানো মোর অন্তর।
পরে যাইবা তুমি আপন স্বামীর ঘর॥
নাগমাতা আমি জানো বলিলাম তোমারে।
মনসা পদ্মাবতী কেউ ডাকে আমারে॥
আমারে করিলে ভক্তি পুরে মনস্কাম।
ধনে জনে অপার হয় সুখে থাকে ধাম॥
আমাকে পূজিতে অতি দুর্লভ নয়।
মনফুল জলে পূজা আমায় দিলে হয়॥
সর্বদা যে ডাকে মোরে আমি তাকে দেখি।
সর্প ভয় দূরে থাকে ধনেজনে রাখি॥
যে যা চায় তারে দেই ভান্ডার ভরি।
অবজ্ঞা করিলে যেই নাশ করি তারে॥
কিছুদিন থাকিলে মায়া মনসা মন্দিরে।
পদ্মাবতী বলইন মায়া যাও মর্ত্যপুরে॥
তোমার ঘরে কর পূজা প্রচারও সংসারে।
আমার কৃপা আছে মায়া যাও তোমার তরে॥
পৌছাইয়া দিল নাগ মায়ার স্বামীর বাড়ি।
প্রণামিল মায়া গিয়া সবে ভূমি পড়ি।
শাশুড়িরে বলে মায়া পদ্মাবতী পূজি॥
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় মায়ের পদে পূঁজি॥

www.pathagar.com

অবজ্ঞা করিলা বৃন্দা বধূর কথা শুনি।
সর্প পূজা করিয়া আমি হইতে চাইনা ধনী॥
যেদিন তোমার শশুর মইলা রাখিয়া গেলা ধন।
বড় সুখে যাইবা আমার সাত পুতের জীবন॥
তুমি আসি ঘরে আমার ঘটাইলা প্রমাদ।
সোনার সংসারে আমার মিশাইলা খাদ।
সর্প পূজা করিলে মান যাইব মোর।
সাবধান করিলাম বধূ না পুজিও ঘর॥
কটুবাক্য শুনিল মায়া শাশুড়ির তরে।
মনসা স্মরিয়া কয় স্তুতি ভক্তি করে॥
মা তোমার আদেশ আমি রাখিতে না পারি।
ক্ষমা কর অপরাধ মা তব পদে ধরি।
অযোনি সম্ভবা মা জানিল মনের কথা।
নিশিকালে সর্পসৈন্য পাঠাইল তথা॥
একে একে সাত পুত্র করিল নিধন।
পড়িল ক্রন্দনের রোল সর্ব বধূঁজন॥
কাদিঁয়া মুর্ছা যায় কেউ করে হায় হায়।
ধরনী লুটাইয়া কান্দে অভাগিনী মায়॥
পয়ারও ছাড়িয়া এবার লাচাড়িতে ধরি।
যত আছো দিয়া মন শুন সর্ব পুরি॥

লাচাড়ি বৃন্তার বিলাপ

হায়রে মোর কি হইল সাত পুত্র মরিল
ধরনী লুটাইয়া কাঁন্দে মায়॥
নিদয়া হইল বিধি কেবা আমায় হইলায় বাদি
পুত্র থইয়া নিলায় না আমায়॥
সাত বধু বিধবা হইল সংসারে দু:খ আইল
অন্তর যে মোর পুড়িয়া যায়॥
জ্বাল বধু চিতা জ্বাল তাতে কিছু ঘৃত ঢাল
আমারে আগে পোড়াও গো চিতায়॥
এ জীবনের নাই মায়া কি হবে বাঁচিয়া
যাই আমি সংসারও ত্যাজিয়া॥
যে মায়ের পুতমরে সে বুঝে তার কেমন করে
দেখ তোরা অল্পেতে ভাবিয়া॥
কেন আমার এমন হইল কে মোর এমন কইল
অভাগীনির মন বুঝিয়া॥
তার কি গো নাই পুত কেন ডাকে যমদূত
আমায় গেল প্রাণে মারিয়া॥

www.pathagar.com

কান্দিয়া ব্যাকুল হইল   অনলে ঝাঁপ দিতে গেল
কেউ পারেনা রাখিতে ধরিয়া॥
ছাড়ো বধু আমায় ছাড়ো   তোমরাও জ্বলিয়া মরো
কি হবে বিধবা জীবন দিয়া॥
অঝোরে ঝরিছে নয়ন   কান্দে সাত বধুগন
উপায় কিছু পায়না খুজিয়া॥
পুতে দাহ করিবারে   কেই আসেনা দেখিবারে
কি জানি ধরে মনসায়॥
কি করে কোথায় যায়   ভাবিয়া না কিছু পায়
সাত বধূ পড়িল বিপাকে॥
একে তো স্বামীর শোক   আর দেখি শাশুড়ির মুখ
পাড়াপড়শি আসেনারে দেখে॥
এমন সময় দৈববানী   শুনিল অভাগিনী
এ তোমার অবজ্ঞারও ফল॥
তাড়াতাড়ি বাসনা কর   মনসার চরণ ধরো
ফিরে পাইবে সকল॥
আনো ঘটের জল পুরি   মনসার পূজা করি
ঘটের জল দিবায় ছিটাইয়া॥
জিও জিও জিও বলি   পূজার ঘটের জল তুলি
সর্ব অঙ্গে দিবায় মাখিয়া॥
বধুদের কইও তায়   স্মরণ বাখিতে আমায়
বিপদ যাইবে দেখ পালাইয়া॥
তোমার পুতে মা ডাকিয়া   উঠিবে জাগিয়া
দেখো একবার আমারে পুজিয়া॥
শ্রাবণী সংক্রান্তি এলে   মর্ত্যলোকে দিও বলে
একচিত্তে পূজিতে আমায়॥
ত্রুটি বিনা পূজা করি   যাইবে সেজন তরি
ধনে জনে অপার দিমু তায়॥
কর্ণেতে শুনিয়া বানী   কহিল বধুতের আনি
কর সবে মনসার পূজা॥
কোন ধন চাইনা তবে   সাত পুত্র ফিরাও ভবে
চরণে ফুল দিমু বোঝাবোঝা॥
মা তোরে স্মরণ করি   আগে বুঝিতে নারি
ক্ষমা করো মম অপরাধ॥
তুমি করিলে দয়া   আর দুঃখ দিমুনা মায়া
মিটাইয়া নে মা তোর বাদ॥
এভাবে মার নাম ধরে   আকুতি মিনতি করে
দয়া করো মনসা মা মোরে

www.pathagar.com

আর না ভুলিব আমি অগতির গতি তুমি
এ মা বলি মাথায় হাত মারে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা গেলা সবে জল ভরা
মুখেতে মনসা দেবী স্মরে॥
হইল পূজার আয়োজন সবাই দিল পূজায় মন
আনিল ঘটের জল ভরে॥
কান্দিয়া কয় কর ক্ষমা নাগমাতা মনসা মা
আছি গো মা তব পদ ধরে॥
বউ শাশুড়ি স্তুতি করে কান্দিয়া মনসার তরে
দেখিয়া মার দয়া উপজিল॥
লাচাড়ি করিলাম শেষ ধরিলাম পয়ারের বেশ
ধন্য হই মা অপরাধ ক্ষমিলে
প্রবীর বলে মা মনসা পুরাও গো মা মনের আশা
চাইয়া বইলাম তোমার পদপানে॥
অযোনী সম্ভবা তুমি তুমি মাগো নাগ জননী
আমায় রাখিও মা ধনে জনে মানে॥

পয়ার

সাত বধূ শাশুড়ি মিলে মনসা পূজা করে।
ভুলত্রুটি ক্ষমা দিতে বলে বারেবারে॥
পূজা কার্য শেষ করে হাতে ঘট নিয়া।
ঘটের জল ছিটাই দিলা জিও জিও বলিয়া॥
মা মা ডাকি সাতপুত্র উঠিল এক সাথে ।
মনসা প্রণাম করে তারা মায়ের আজ্ঞামতে॥
উপস্থিত ব্রতিগণ উলুধ্বনি দিলা।
সেই মতে মনসা দেবীর পূজা আরম্ভিলা॥
ঘরে ঘরে যাইয়া বৃন্দা মনসাগুণ গায়।
সবার কাছে মিনতি করে পূজিবারে তায়॥
ধীরে ধীরে মনসাপূজা ভুবনে প্রচার হয়।
যে জন করে মনসা পূজা নাই তার সর্প ভয়॥
আপদে বিপতে মা ডাকিবে যখন।
সকলে করে দয়া মজাইলে মন॥
চাঁদ সদাগরের কথা পদ্মপুরাণে কয়।
না মানিয়া পদ্মাবতী কত জ্বালা তার হয়॥
পুত গের ডিঙ্গা গেল গেল ধনজন।
বিপুলার কারণে তার ফিরিল মন॥
অবশেষে পূজা করে পাইল সকল।
সবাকারে বলি তাই কর মায়ের বল॥

www.pathagar.com

ইচ্ছা হইলে পদ্মপুরান পড়িয়া ব্রত কর।
সময় সংকীর্ণ হলে এই পাঁচালী ধর॥
প্রতি বছর শ্রাবণীতে পদ্মা পূজা দিও।
মা মনসা ক্ষনে ক্ষনে স্বরণ রাখিও॥
সর্পভয় থাকে যদি দোহাই দিও মার।
মায়ের দোহাই দিলে ভয় থাকিবেনা আর॥
অবজ্ঞা করিলে মার দুর্দশায় ভোগে।
তাই আর অবজ্ঞা নয় বলি আগে ভাগে॥
পদ্মপুরাণের কথা জানে সর্বজনে।
পদ্মামায়ের গুনের কথা আছে গানে গানে॥
চাঁদ সওদাগরের দশায় অতি দুঃখ পাই।
কৃপা করিয়া দুঃখ গুছাইলা মা তাই॥
আগেভাগে মায়ে পূজা করিত যদি সে জন।
এত দুঃখ পাইত না চাঁদ হইত না তার এমন॥
বিপুলা তার মরা স্বামী ফিরিয়া পাইল।
ভাগ্যগুণে দেবপুরি তার দেখাও হইল॥
এমন গুণবতী নারী ত্রিভুবনে নাই।
মনসা মায়ের কোলে সেজন পাইল ঠাঁই॥
দেখিয়া শুনিয়া সবে অন্ধ চক্ষু খোল।
মনসা দেবীরে কভু আর নাহি ভুলো॥
মা মনসার পদে করিলাম অশেষ।
পাঁচালীর বিশেষ কথা এবার করি শেষ॥
মনেতে বাসনা ছিল মায়ের কথা বলি
প্রবীর বলে মায়ের কৃপায় লেখিলাম পাঁচালি॥
প্রণামী মা তব পদে হাজার হাজার বার।
সাধ্যমতে মায়ের পূজা বছরে একবার॥
সব নারী উলুধ্বনি দিতে নাহি ভুল।
উচ্চঃস্বরে জয় মনসা এবার সবে বল॥
অপরাধ ক্ষমিতে বল মা মনসার কাছে।
মানস করিয়া লও যার যা মনে আছে॥
মায়ের প্রণাম মন্ত্র সবে মুখেতে স্মরি।
দণ্ডবৎ কর মনসা ভূমিতে পড়ি॥

মনসাদেবীর পাঁচালী রচনা করেছেন–প্রবীর দেবনাথ।

৩. শ্রী শ্রী দুর্গার শতনাম

সিলেট অঞ্চলে একসময় শ্রী দুর্গার শতনাম প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায় হলেও সুনামগঞ্জের সাবেক স্কুল শিক্ষক বর্তমানে সিলেটের সুবিদবাজার নিবাসী

www.pathagar.com

বিদ্যুৎজ্যোতি চক্রবর্তী মহাশয়ের সহায়তায় শতনামের একটি হস্তরচিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বানান, ছন্দ ও বাক্যগঠন অবিকৃত রেখে পাণ্ডুলিপিটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

শতনামটি পাঁচালি রীতিতে পাঠ করা হত।

শ্রী শ্রী দুর্গার শতনাম

জয় দুর্গা দুঃখ হরা কৃতান্ত দলনী
মহামায়া কাল জায়া মাগো কাত্যায়নী।
জগৎ জননী উমা ভবেশ ঘরণী
কর দয়া দয়াময়ী ত্রিদিব জননী।
কালরাত্রি করালিনী কপাল মালিকে
কাতরে করুণা জয় মা কালীকে।
কৃত্তিবাস প্রিয়া মাগো মহারাণী মহোদেবী
মহারাণী সুরেশ্বরী নমো মা শঙ্করী।
ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি শিবের শিবানী
প্রণর্মামী পদে মাগো সত্য সনাতনী।
কাতর দেখিয়া কৃপা কর মা ভবানী
অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী জগৎ তারিণী।
সর্ব্বরূপ ধাত্রী মাগো তুমি ভগবতী
কৃপা কর মহেশ্বরি অগতির গতি
নমস্তে সর্বাগী মাগো ঈশানী ঈন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া গণেশ জননী।
দিগম্বরের ঘরনি দেবী দিগম্বরী
দুর্গে দুঃখ হরি করাল কেশী
শিবে শবারুঢ়া চণ্ডি চন্দ্র চূড়া
ঘোর রূপা এল কেশী।

সারদা বরদা, শুভদা, সুখদা,
অন্নদা কালিকে শ্যামা,
মৃগেশ বাহিনী মহেশ ভামিনী
সুরেশ বন্দিনী বামা।

কামাক্ষা রুদ্রাণী হরা হর রাণী
ঘররামা কাত্যায়নী
শমন ত্রাশিনী অরিষ্ট নাশিনী
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।

ত্রিতাপ হারিণী ত্রিগুণ তারিণী

www.pathagar.com

গুণময়ী গুণাত্তিকে
কৌশিকি কমলা করালি বিমলা
অভয়া অম্বে অম্বিকে।

ভবে ভবরাণী তারিণী ভবানী
ভবানী ভব মনহরা।
ব্রহ্মাণী রুদ্রানী কৌমারী সর্বানী
ভয়ঙ্করী শিব করা।

চামুণ্ডে চণ্ডিকে নৃমুণ্ড মালিকে
নারায়ণী শিবদারা।
শ্রান্তি কান্তি করি ক্ষমা ক্ষেমংঙ্করী
ত্রিলোক তারিণী তারা ॥

মহা মহেশ্বরী প্রিয়ে প্রিয়ঙ্করী
শুভঙ্করী কপালিনী।
জগৎ জননী মৃগঙ্ক আননী
ঋমে নৃমুণ্ড মালিনী ॥

গিরিন্দ্র নন্দীনি গীরিশ বন্দিনী
গো-মাতা গৌরী গান্ধারী
গো গজ জননী গজেন্দ্র গামিনী
গীতা গোপেশ কুমারী ।

গোবিন্দ ভগিনী যোর্জগেশী যোগিনী
দেবকী গর্ভ শ্রাবণী।
পরা পরায়িনি দেবী দাক্ষায়নী
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী।
উগ্রচণ্ডা উমা আশুতোষ বামা
অপরাজিতা উর্বশী
রাজে রাজেশ্বরী ক্ষীতিক্ষেত্র ক্ষেঙ্ককরী
শঙ্করি শিবে ষোড়ষী।

হের মা পার্ব্বতী উমা ভগবতী
ওগো মহামায়া
আমি দীনহীন অতি জানি মোরে মূঢ় মতি
কর মা মোরে দয়া। ...

সিলেটে এখন আর কবিগানের আসর বসেনা। পুথি পাঠের আসরও অপ্রত্যক্ষগোচর। কানাইঘাট, গোয়াইন ঘাটের কোনো কোনো বাড়িতে পারিবারিক ভাবে পুথিপাঠ অনুষ্ঠিত হলেও তার সংখ্যা খুবই কম। মহররম উপলক্ষে কোনো কোনো বাড়িতে যে

www.pathagar.com

পুথিপাঠ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে শ্রোতা কেবল পরিবারের মানুষই হয়ে থাকেন। কেউ কেউ পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ধর্ম বিষয়ক পুথি পাঠ করেন। কিন্তু এসব পুথির পাঠক বয়োবৃদ্ধ পুরুষ এবং তিনি ধর্মীয় সোয়াব লাভের প্রত্যাশ্যায় এই কাজে ক্রিয়াশীল হন।

চ. লোকপুরাণ

বিশাখা

ধনী পরিবারের মেয়ে বিশাখা। বাবার অনেক জমি-জিরাত আছে। থাকলে কি হবে শিক্ষার দিকে একেবারে নেই বললেই চলে। আগে বাবার তেমন কিছু ছিল না। বাবা ছিলেন খুব পরিশ্রমী। তাই আস্তে আস্তে সম্পদ বাড়তে থাকে। এভাবে একদিন বিশাখার বাবা অনেক জমির মালিক হয়ে উঠেন। তিন ভাই বোনের মধ্যে বিশাখা সবার বড়। অগ্রহায়ণ মাসে বাড়িতে ক্ষেতের ধানে পাহাড় সমতুল্য হয়ে যেত। আর এই ক্ষেতের ধানই ছিলো লক্ষ্মী। প্রতি বৎসর জমি ক্রয় করতেন বাবা। তিনি নিজেও জানতেন না কোথায় কতো জমি আছে তার। প্রায় দশ বারো জন খেটে প্রাণ রক্ষা করতো তার এখানেই। আস্তে আস্তে বিশাখা বড় হতে লাগলো। এক সময় বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেল বিশাখা। এদিকে বাবার এখন প্রায়ই অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। আগের মতো গায়ে আর তেমন বল নাই। মানুষের যৌবন ফুরিয়ে গেলে যেমনটি হয়। তিনি এখন তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেশ ভাবেন। হঠাৎ যদি তার কিছু হয়ে যায়, তাহলে এরা চলবে কি করে? একদিন পরিবারের সকলকে ডেকে এনে সিদ্ধান্ত নিলেন বিশাখাকে তিনি ঘরেই বিয়ে দিবেন। যাতে তার অনুপস্থিতিতে মেয়ের জামাই এ সংসার ধরে রাখতে পারে। ছেলে দুটি এখনো বেশ ছোট, আর স্ত্রী একটু বোকা বোকা ভাব। মানে একেবারেই সহজ সরল। এক সাথে বিশ টাকার ভাংতি দিলে গোনা তার পক্ষে একেবারেই মুশকিল। তাই বাবা ভাবলেন তিনি বিহনে এই পরিবারে একজন পুরুষ লোকের দরকার। বিশাখা যদিও প্রথমে বিয়েতে রাজী ছিলনা পরে বাবার কথায় রাজী হলো। বিশাখা বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসতো। সবসময় বাবার পাশে পাশে থাকতো। তাই ধীরে ধীরে বিশাখা খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠে। বাবা বিশাখার স্বামী হিসাবে এমন সুপুরুষ খুজে পাচিছলেন না। এমন পুরুষ যার কাছে মেয়ে বিয়ে দিলে ভালো হয়। তার মেয়ে সুখের সংসার করতে পারবে। শুধু মেয়ের সুখের দিকে লক্ষ্য নয় তার। এত বড় সংসার ধরে রাখার জন্য একজন দক্ষ পুরুষের দরকার তার। অবশেষে তার ঘরেই কাজ করতো এমন একজনকে বেছে নিলেন বিশাখার স্বামী হিসাবে। ছেলেটির আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই সংসারে। এই ঘরে শুধু পেটে-ভাতে বহুদিন ধরে আছে এবং খুবই কর্মী ছেলে। বছর শেষে মালিকের কাছ থেকে কোনো টাকা নিতো না। দিলেও বলতো প্রয়োজনে চেয়ে নিবো। তাই ছেলেটিকে নিঃস্বার্থ লোক হিসাবে বেছে নিলেন বাবা। বিয়েও হয়ে গেলো বিশাখার ঐ ছেলের সঙ্গে। বিশাখার বিয়ের কিছুদিন পরই বাবা শয্যাশায়ী হলেন। এভাবে থাকতে থাকতে একদিন বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সংসারের হাল ধরলেন বিশাখা ও তার

www.pathagar.com

স্বামী। সুন্দর ভাবে চলছিল তাদের সংসার। বছর বছর আয় হচেছ আগের মতো। বিশাখার হাতে অনেক টাকা জমাও হয়ে গেলো। ছোট দুই ভাইকে স্কুলেও ভর্তি করালেন। বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষকও রাখলেন ছোট ভাইদের জন্য। কিছুদিন পর মায়ের অসুখ হলো। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোন লাভ হলো না। একদিন মাকেও হারালেন বিশাখা। এতিমের মত সংসারে তিন ভাই বোন মিলে স্বামীর হাতের দিকে চেয়ে দিন কাটতে লাগল বিশাখার। বিশাখার বিয়ের প্রায় ১০ বছর হয়ে গেল কিন্তু কোন সন্তানাদি এলো না তাদের সংসারে। এ নিয়ে কোন চিন্তা নেই বিশাখার। দুই ভাইকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেন। তাদেরকে মানুষের মত মানুষ করতে চান তিনি। এদিকে এখন ক্ষেতে খামারে প্রায়ই ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। বিশাখারা জমিতে ফসল ফলান আর ফসল ঘরে তোলার সময় অন্যরা তাদের জমি দাবি করে ফসল কেটে নেয়। গ্রামের প্রায় লোকই দাবি নিয়ে আসতো এ জমি আমার, সে জমি আমার। শুরু হলো বিচার আদালত, কিছুতেই কিছু হলো না। চতুর্মুখী বিপদ এসে দাঁড়ালো বিশাখার সামনে। বাবার সম্পদ রাখা দায় হয়ে পড়লো। বিশাখার স্বামীও হতাশায় ভুগছেন এ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। অফিস আদালতে দৌড়াতে দৌড়াতে তার অবস্থা একেবারেই কাহিল। এভাবে একদিন জমি-জিরাত অনেকটা শেষ হতে লাগলো। কিছু কিছু জমির কাগজপত্র ঠিক থাকলেও অনেক জমির কাগজ ঠিক ছিলো না। এমনকি অনেক জমির কাগজপত্র একবারেই পাওয়া গেলো না, অফিস আদালতে তফসিলে। গ্রামের লোক হিসেবে হয়তো দরিলপত্র ছাড়াই টাকা দিয়েছিলেন বাবা। আগেকার লোক এরকমই ছিলেন। বাবা যাদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছিলেন, এদের অনেকেই পরপারে চলে গেছেন। ছিলেন শুধু তাদের ছেলে নাতিরা। আর যারা বেঁচে আছেন তারা যদিও বিশাখাদের পক্ষে কথা বলেন কিন্তু কাগজপত্র না থাকায় সালিশে রায় চলে যায় বিপক্ষের দিকে। গ্রামের সবাই বলে বিশাখার বাবা কোনো সময়ই বাজে লোক ছিলেন না। অন্যের জমি এমনি এমনি দখল করা তো দূরের কথা, তিনি বেঁচে থাকতে অনেক লোক টাকা ধার নিয়েও ফেরত দেয়নি। তবুও কোনোদিন কারো সাথে ঝগড়া বা কটু কথা বলতে শুনেননি তারা। এতো সব সুনামেও এখন আর কাজ হবে না। জমি বা সম্পদ টিকিয়ে রাখতে হলে সঠিক দলিলের প্রয়োজন। কি আর করা নিমিষেই সব শেষ হয়ে গেলো। আর যে জমিগুলোর কাগজপত্র ঠিক ছিলো, এতো সব ভেজাল সামাল দিতে গিয়ে বিক্রয় করতে হয়েছে। তাই এগুলোও সীমিত হয়ে গেছে। আগের মতো আর কিছুই রইলো না তাদের। কোনো রকমে সংসার চলে তাদের। বাড়ির সামনে কিছু ক্ষেতের জমি ছিলো তাদের। একদিন ঐ জমি নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে ঝগড়া বাঁধে। এক পর্যায়ে এই বিবাদ বিরাট আকার ধারণ করে। এ নিয়ে একদিন হাল চাষের সময় দুইপক্ষে মারামারি বাঁধে। একপর্যায়ে বিশাখার স্বামীর মাথায় বিরোধী দলের লাঠির আঘাত লাগে, আর এতেই বিশাখার স্বামী ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিশাখার স্বামী মারা যাওয়ায় বিশাখার আর কিছুই রইলো না পৃথিবীতে। সে যেন পাগল প্রায়। সবসময় দা-বটি নিয়ে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো। যারা এই জমি নিয়ে বিবাদ করেছিলো তাদের কোনো স্বজন দেখলেই বটি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। যতক্ষণ চোখে দেখা যায়। গ্রামের সবাই বিশাখা পাগলকে ভয় পেত। এরপর থেকে আর কেউ তাদের জমি

www.pathagar.com

ক্ষেত নিয়ে কোনোদিনই বিশাখার ভয়ে বিবাদ করতো না। স্বামী হত্যায় থানা পুলিশ হয়েছে, তবে বিরোধী দলের টাকা থাকায় এবং বিশাখার দিকে পরিচালকের অভাবে কিছুই হয়নি। বিশাখা স্বামীর জন্য কিছুই করতে পারেনি। তবে বাবার জমির দাবি নিয়ে আর কেউ আসতে পারেনি। কেউ যদি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলত এবং তা বিশাখার কানে গেলেই আর রেহাই নেই। সেই বটি নিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে যেতো। বিশাখার ভয়ে সব ঘর ছেড়ে পালাতো। ক্ষমা চাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের খুঁজে বেড়াতো বিশাখা। বিশাখা যতই পাগলামো করুক না কেন ভাইদের লেখাপড়ার প্রতি কিন্তু নজর রাখে। সারাদিন জমির আশেপাশে ঘোরাঘুরি, ভাইদের খেয়াল রাখা আর যখন যা পায় তাই রান্না করে ভাইদের নিয়ে খেয়ে দিন চলে যেতো। মাঝে মাঝে হাউমাউ করে কাঁদাই ছিলো তার কাজ।

সংগ্রাহক : সঞ্জয় নাথ কর্তৃক প্রবীরের নিকট থেকে সংগৃহীত।

তথ্যদাতা

১. রেণুবালা চন্দ, পিতাঃ ঈশ্বর চন্দ, মাতাঃ বিনোদিনী চন্দ, বিনোদপুর, গৌরীপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট
২. সন্ধ্যা রাণী দেবী, পিতাঃ মতিলাল শীল, মাতাঃ অবলা রাণী শীল, ৫৯ বৎসর, নাথ কলোনী, ফেঞ্চুগঞ্জ
৩. জয়ন্তী রাণী নাথ, স্বামীঃ বোল নাথ, বয়সঃ ৬৩ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
৪. বীণা রাণী নাথ, স্বামীঃ সুধীর নাথ, বয়সঃ ৪৬ বৎসর, নাথকলোনী, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
৫. প্রবীর দেবনাথ, পিতাঃ প্রফুল্ল দেবনাথ, মাতাঃ শৈবলিনি দেবী, বয়সঃ ৫৮, বহর নওয়া গাঁও, শাহপরাণ গেইট, সিলেট
৬. মো. জাকির হোসেন বেগ, পিতাঃ আদন বেগ, মাতা : সুরুতন নেছা, মুসলিমাবাদ পূর্ব গৌরীপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট
৭. মো. কামাল মিয়া, পিতাঃ কনাই মিয়া, মাতাঃ আমেনা বেগম, বয়সঃ ২৯, রাজনপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ
৮. বিদ্যুৎজ্যোতি চক্রবর্ত্তী, বয়সঃ ৫৫, সুবিদবাজার সিলেট
৯. হরিপদ চন্দ, পিতাঃ বাউল হরেন্দ্র চন্দ, মাতাঃ অবলা রাণী চন্দ, মোল্লার গাঁও, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
১০. সয়াল শাহ, পিতাঃ মরহুম ওয়াকিব শাহ, মাতাঃ আলেকজান শাহ, বর্তমানে সিলেট শহরের বিভিন্ন মাজারে রাত্রি যাপন করেন
১১. রত্না ভট্টাচার্য, স্বামীঃ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বয়স ৬৩, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
১২. অপর্ণা রাণী দাস, স্বামীঃ কানাই লাল দাস, বয়সঃ ৭০ বৎসর, গোলাপগঞ্জ

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

ক. লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প

'মৃৎ' শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা মাটি। আর শিল্প বলতে এখানে সুন্দর ও সৃষ্টিশীল বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। এজন্য মাটি দিয়ে তৈরি সব শিল্পকেই মৃৎশিল্প বলা হয়। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির তৈরি ছোট ছোট খেলনা, বাসন, কলসি, টব, গয়না, দইয়ের মালসা, মাটির ব্যাংক প্রভৃতি নির্মিত হতে দেখা যায়। সচরাচর হিন্দু সম্প্রদায়ের কার্তিক পূজা ও লক্ষ্মী পূজার সময় প্রচুর ছোট ছোট ঘট এবং সরার প্রয়োজন হয়। একারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আচার পালনে এগুলোর ব্যবহার অনিবার্য।

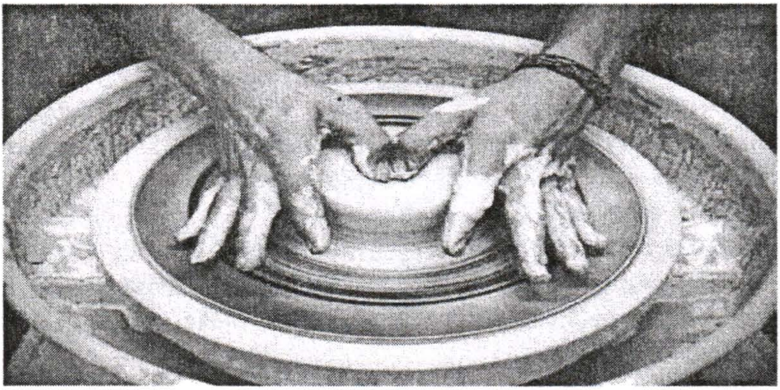

মাটির প্রতিমা

সিটি কর্পোরেশনের দাড়িয়াপাড়া এলাকায় প্রায় শত বছরের পুরনো মৃৎশিল্পের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে পাশাপাশি দু'টি মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমান। একটির নাম *বলভ-নারায়ণ মৃৎশিল্পালয়* ও অপরটির নাম *ভলব-সুদর্শন মৃৎশিল্পালয়*।

বলভ-নারায়ণ মৃৎশিল্পালয়ের পরিচালক মৃৎশিল্পী শংকর পাল এবং ভলব-সুদর্শন মৃৎশিল্পালয়ের পরিচালক মৃৎশিল্পী দুলাল পাল। এরা দীর্ঘদিন যাবৎ শহরের ৮০% মূর্তির চাহিদা পূরণ করে আসছেন। সিলেটের বাইরেও অনেকে এখানকার মূর্তি নিয়ে থাকেন।

মৃৎশিল্পি শংকর পাল ও দুলাল পাল জানান, প্রায় শত বছর আগে (আনুমানিক ১৯১৫-১৬ খ্রিঃ) ঢাকা থেকে সিলেট এসেছিলেন রাজমোহন পাল। যুবক রাজমোহন

www.pathagar.com

ছিলেন মৃৎশিল্পী। সিলেটে তখন মৃৎশিল্পের তেমন কোনো ভাল প্রতিষ্ঠান ছিল না। মূলত তিনিই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রথম মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। রাজমোহন পালের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বলভচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠানকে চাঙ্গা করে তুলেন। ১৯৭৫ সালে বল্ল-ভচন্দ্র পাল মারা গেলে তাঁর দুই ছেলে সুদর্শন পাল ও নারায়ণ পাল তাদের প্রতিষ্ঠানকে সিলেটের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৯৮ সালে নারায়ণ পাল ও ২০০১ সালে সুদর্শন পালের মৃত্যুর পর নারায়ণ পালের পুত্র দুলালচন্দ্র পাল এবং সুদর্শন পালের পুত্র শংকর পাল মৃৎশিল্পের দুইটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। দুলালচন্দ্র পালের প্রতিষ্ঠানের নাম ভল্লব-নারায়ণ মৃৎশিল্পালয়। দুলাল পালের প্রতিষ্ঠানের নাম ভল্লব-সুদর্শন মৃৎশিল্পালয়।

শংকর পাল ও দুলাল পাল জানান, এ পেশা মূলত উৎসব কেন্দ্রিক। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী পূজায় ৭০-৮০টি (এককভাবে) অর্ডার আসে তাদের কাছে। এসময় দুর্গার মূর্তি সর্বোচ্চ ৫০-৬০ হাজার টাকা এবং কালী ও সরস্বতী মূর্তির ক্ষেত্রে ৩০-৩৫

হাজার টাকা নেন তাঁরা। তবে সারা বছরই তাদের টুকটাক কাজ থাকে। যেহেতু তারা অন্য কোনো কাজ করেন না, তাই এ পেশাই তাদের একমাত্র ধ্যান-যজ্ঞ ।

মৌসুমী পূজা ছাড়াও আজকাল বিভিন্ন কীর্তন অনুষ্ঠানে রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, চৈতন্য প্রভৃতি দেবতার বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন ভঙ্গিমার বৃহদাকৃতির মূর্তি অনুষ্ঠান-মঞ্চ কিংবা উঠোনে কিংবা মন্দিরের পাশে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়। এগুলোরও অধিকাংশ এই প্রতিষ্ঠানেরই তৈরি। কালী পূজা, দুর্গা পূজার সময়ও রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী প্রমুখের বৃহদাকার মূর্তি পূজা মণ্ডপে শোভিত হয়। এসব মূর্তি সাজিয়ে অনেক সময় পৌরাণিক কাহিনি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

মূর্তি তৈরির উপকরণ হিসেবে মাটি, পাথর, বাঁশ, বেত, কাপড় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতকারকদের মতে, মূর্তি বানাতে অনেক পরিশ্রম ও মেধা ব্যয় করতে হয়। তাই এক্ষেত্রে শিল্পমূল্যই আসল। ১৫ শত টাকা একটি মূর্তির বিক্রয়মূল্য ধরা হলে এর প্রস্তুতমূল্য পড়ে সর্বোচ্চ সাত শত টাকা, অবশিষ্ট সবই কারিগরদের পারিশ্রমিক তথা *শিল্পমূল্য।*

শংকর পাল জানান, তিনি বি.কম পাশ করে চাকুরির চেষ্টা না করে বংশানুক্রমিক পেশায় চলে আসেন। তাঁর ছোট ভাই সুব্রত পাল এম. এ পড়ছেন। মৌসুমের কাজের সময় তিনি তাকে সহায়তা করেন। এসময় অবশ্য ঢাকা থেকে আরো ৬/৭ জন কারিগরকেও সহায়তার জন্য আনতে হয়। কারিগরগণ নিকট আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় হয়ে থাকেন।

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডস্থ ব্রাহ্মণশাসন অঞ্চলের আচার্য বাড়ির লোকেরাও মূর্তি নির্মাণ করেন। তবে এরা শ্যামা কালী, দক্ষিণা কালী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর ছোটখাট মূর্তি নির্মাণেই পারদর্শী।

২. শীতলপাটি

শীতলপাটি এক ধরনের মাদুর যা বেত বা মোস্তাক নামক গাছের ছাল থেকে তৈরি হয়ে থাকে। সিলেটের এ শীতল পাটি বেশির ভাগই তৈরি হয় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ

www.pathagar.com

উপজেলার ৬টি গ্রামের প্রায় তিন হাজার মানুষ পাটি তৈরি করে বিক্রি করে। এ গ্রামগুলো দুর্গাপুর, চাঁনপুর, সোনাপুর, ভীমঘালীর, কালীপুর ও কদমতলী পাটি শিল্পীদের গ্রাম নামে পরিচিত। বৃহত্তর সিলেটে ইউরোপ, আমেরিকা থেকে তূলনামূলক বেশি প্রবাসীরা আসেন এবং যাবার সময় পছন্দের তালিকার অন্যতম হচ্ছে শীতলপাটি। এই পাটি গুলো সাধারনত ৭ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫ফুট প্রস্থের হয়। তবে ছোট পাটিরও প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

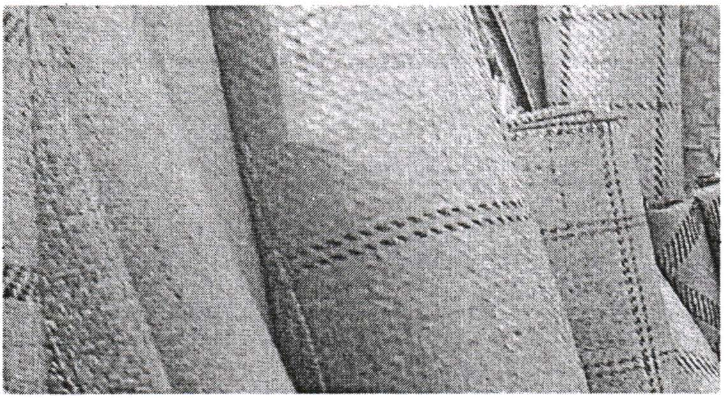

৩. মনিপুরি তাঁতের কাপড়

সিলেটে বর্তমানে কেবল খাসিয়া ও মনিপুরীরাই পোশাক তৈরি করেন। হাতে বোনা কাপড় তৈরিতে এরা খুবই দক্ষ। নিজেদের কাপড় তারা নিজেরাই তৈরি করে থাকে। প্রায় প্রতিটি ঘরেই তাঁত রয়েছে। হাতে তৈরি এসব পোশাক বেশ আকর্ষণীয় নিজস্ব ইন্নাফি, ফানেক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পাঞ্জাবি, গামছা, চাদর, ব্যাগ, ফতুয়া, লুঙ্গি, টুপি ইত্যাদি তৈরি করে। বিছানার চাদর ও শাড়ি নির্মাণেও এরা সিদ্ধহস্ত। তবে তাঁত সুতার ব্যয় বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের এই শিল্প বর্তমানে সংকটাপন্ন।

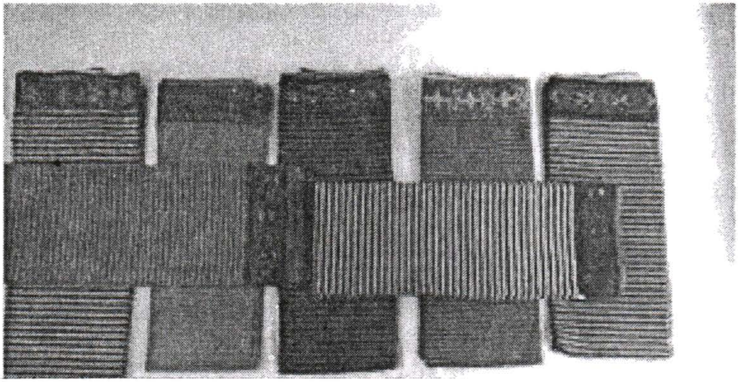

www.pathagar.com

৪. বাঁশ/বেত শিল্প

সিলেট শহরের কানিশাইলস্থ বেত পাড়া, বেত শিল্পের অন্যতম স্থান। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেতদ্রব্য তৈরি হয়। কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের নারাইনপুর এবং নয়াগ্রাম এলাকাতেও পলো, খলই, ডালা, কুলা, চালন প্রভৃতি তৈরি হতে দেখা যায়। মূত্রা বেত থেকে তৈরি একপ্রকার পাটি সিলেট অঞ্চলে শীতলপাটি নামে পরিচিত। গরম দিনে এর উপর ঘুমালে শীতল একটি অনুভূতি পাওয়া যায় বলেই এর এ ধরনের নামকরণ। সিলেট অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে কুঞ্জ অত্যাবশ্যক। এই কুঞ্জ বাঁশ, কলাগাছ, কাগজ ও ফুল দ্বারা তৈরি করা হয়। বরের আসরটিও কনের বাড়ির লোকজন ফুল-কাগজের মিশ্রণে সুন্দর করে নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, বিয়ের কুঞ্জ বাংলাদেশে কেবল সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে নির্মাণ করতে দেখা যায়। হাট তৈরি হয়েছিল বিক্রির জন্যে। এখনো হাটে বেত, বাঁশ দ্বারা নির্মিত কুলা, ধুছন, টুকরি, হাত পাখা, পুতুল, চালনি, হেইত, বিভিন্ন সামগ্রি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

সিলেটে বর্তমানে কেবল খাসিয়া ও মণিপুরিরাই পোশাক তৈরি করেন, গারোরা করেন খুব সীমিতভাবে। হাতে তৈরি এসব পোশাক বেশ আকর্ষণীয়। নিজস্ব ইন্নাফি, ফানেক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পাঞ্জাবি ও ফতুয়া তারা তৈরি করছেন। বিছানার চাদর এবং শাড়ি নির্মাণেও তারা সিদ্ধহস্ত। তবে তাত ও সুতার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের এই শিল্প বর্তমানে কিছুটা হলেও সংকটাপন্ন।

খাসিয়াগণ তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী কিছু অলংকার তৈরি করেন। কান ও গলায় পরিধান করার মতো এসব অলংকার পাওয়া যায় গোয়াইনঘাট উপজেলায়। মনিপুরিরাও এধরনের কিছু অলংকার তৈরি করেন।

পুতি দ্বারা নির্মিত কিছু গয়না ও কাঁচের চুরি বেদেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করেন। সিলেট শহরের বন্দরবাজার পয়েন্ট এবং হাইকোর্ট এলাকার ফুটপাতেও বেদেরা বিভিন্ন ধরনের সস্তা দরের গয়না নিয়ে বসেন। এরা নিজেরাই এগুলো তৈরি করেন বলে জানিয়েছেন।

কক্সবাজার থেকে ঝিনুক নিয়ে এসে সেগুলো দ্বারা বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও গৃহ সজ্জার উপকরণ তৈরি করেন কেউ কেউ। তবে সেখান থেকে তৈরি করা দ্রব্যাদিও গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলংয়ের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয়।

জাফলংয়ে দু দশক আগেও অনেক খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করতেন। কিন্তু স্থানটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় এবং পাথর উত্তোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দুষ্কৃতিকারীদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ফলে মাত্র কয়েক গজ দূরে ভারতের মেঘালয়ে এদের অনেকে পালিয়ে যান। কাটা তারের বেড়া না থাকায় এখনো অনেকে চলে যাচ্ছেন। তবে ভারতের ডাউকি অঞ্চলে আগে থেকেই এদের অনেকের যাতায়াত ছিল। এরা ওখানে বিনা বেতনে ইংরেজি ভাষা শিখতেন এবং ডাউকি বাজারে কেনা কাটা করতেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য খাসিয়াদের ৯০ শতাংশ খ্রিষ্টান এবং ভারতের মেঘালয়ের ডাউকি, সিলং প্রভৃতি অঞ্চলে খাসিয়া সম্প্রদায় এবং ইংরেজি ভাষীদের ব্যাপক অবস্থান।

জাফলং অঞ্চলের বিভিন্ন দোকানে হস্ত নির্মিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। এগুলোর সিংহভাগ স্থানীয় ও ভারতীয় খাসিয়াদের তৈরি বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

বাংলাদেশ যে গৃহ নির্মাণ শিল্পে বর্তমানে দারুণ অগ্রগতি লাভ করেছে এটা সম্ভবত মানবেন সকলেই। সিলেটও এক্ষেত্রে দারুণ অগ্রবর্তী। বাংলাদেশের লন্ডন বলে কথিত এই শহরে স্থানীয় প্রকৌশলী ও নির্মাণ শিল্পিরা তৈরি করছেন বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টি নন্দন অট্টালিকা। তবে এর মধ্যেও লোকস্থাপত্যের কাজ থেমে থাকেনি। পিছিয়ে পড়া লোকজন বিশেষত গ্রামের স্বল্প আয়ের মানুষ এবং চা-বাগানের শ্রমিকরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করে যাচ্ছেন তাদের নিরাপত্তার বিশেষ আশ্রয়স্থল।

স্থানীয় প্রযুক্তিতে সিলেটে যেসব বাড়ি নির্মিত হয় এগুলোর মধ্যে মাটি ও ছনের ঘর প্রধান। ছনের ঘরকে এতদঞ্চলে কুড়ে ঘর বলে আখ্যায়িত করেন।

মাটির ঘর এখানে তিনভাবে নির্মিত হয়। বাঁশের সহায়তায়, ইটের সহায়তায় এবং অন্য কোনো কিছুর সহায়তা ব্যতিরেকে। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা করা হলো:

১. বাঁশের সহায়তায় : মাটির ঘর তৈরির সময় প্রথমেই প্রয়োজন পড়ে এঁটেল মাটি। উন্নত মানের এঁটেল মাটি হলে বাড়িটি খুব মজবুত ও টেকসই হয়। মাটি সংগ্রহের পর ভাল প্রজাতির বাঁশ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই কাজ সম্পন্ন হলে প্রস্ত তকারক বাঁশ খুব চিকন করে কেটে খাপ তৈরি করেন। এই খাপ সোজা ও আড়াআড়ি ভাবে একটিকে অপরটির উপর ও নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে বেড়া বানাতে হয়। এই বেড়া ঘরের বৃহৎ দুটি খুঁটির সাথে নির্মাতা বেঁধে রাখেন।

মাটি সংগ্রহের পর অন্যান্য কর্মীগণ এ থেকে ময়লা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলে পরিষ্কার করেন। এরপর এই মাটির উপর দু থেকে তিন দিন অল্প অল্প পানি দিয়ে সবসময় একে ভিজেয়ে রাখেন। বেড়া বসানোর পর নরম এঁটেল মাটি আরো ভিজিয়ে ভালো করে বেড়ার গায়ে লেপ্টে দেয়া হয়। ৩দিন পর পর মোট ৪বার লেপ্টে দিলে বেড়া মজবুত ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। অনেকে বেড়ার উপর মাটি দিয়ে লেপ্টে একই পদ্ধতিতে ঘরের ছাদও নির্মাণ করেন।

২. ইটের সহায়তায়: ইটের সহায়তায় নির্মিত ঘরের নির্মাণ শৈলী অনেকটা সিমেন্ট নির্মিত ঘরের অনুরূপ। এক্ষেত্রে জল দিয়ে মাটিকে অধিকতর নরম করতে হয়।

প্রথমে কাঁদা মাটি দিয়ে তার উপর একটি করে ইট বিছানো হয়। পরে ইটের উপর কাঁদা মাটি দিয়ে নির্মাতা তার উপর আর একটি ইট বিছিয়ে দেন। এভাবে ৩ বা ৪ সারি ইট বসানোর পর কয়েকদিন শুকানোর জন্য রেখে দেয়া হয়। কাঁদা ভাল করে শুকানোর পর আরো তিন থেকে চার সারি ইট উপর দিকে বিছানো হয়। এভবে ইট বিছানো শেষ হলে নির্মাতা কাঁদা দিয়েই আস্তর করেন। আস্তর বেশ কয়েকবার করতে হয়, তবে একবার আস্তর করার সাত-আট দিন পর্যন্ত পুনরায় আস্তর করা যায় না।

চারদিকে ইট বিছানো শেষ হলে গৃহস্থের অকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী টিন বা খড় দিয়ে চাল নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

৩. কেবল মাটি দ্বারা: মাটির ঘর বলতে যা বোঝায়; তা আসলে কেবল মাটি দিয়ে তৈরি ঘর। এ ধরনের ঘর বানাতে বেশ সময় প্রয়োজন।

প্রথমে বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বোৎকৃষ্ট এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে একটি গর্তে রাখা হয়। প্রতিদিন এই গর্তে অল্প অল্প করে জল দিয়ে আট থেকে দশ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। এখান থেকে মাটি নিয়ে প্রস্তুতকারক মূল ভিত্তি বা ভিটা তৈরি করেন। ভিটা তৈরির কয়েকদিন পর নরম মাটি ডলে কিছুটা শক্ত করে দু'হাত দৈর্ঘ্যের দেয়াল নির্মাণ করা হয়। দেয়ালটি শুকানোর পনের থেকে বিশ দিন পরে আবারো একই কায়দায় আরো দুই বা তিন হাত দৈর্ঘ্যের দেয়াল তুলেন পূর্ববর্তী দেয়ালের উপর। এভাবে প্রয়োজনীয় উচ্চতা বিশিষ্ট দেয়াল তৈরির পর ছাদ বা মাচাং নির্মাণ করা হয়।

নির্মাতাগণ আরো একটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাটির ঘর নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে ঘরের চতুর্দিকে পাশাপাশি দুটো বেড়া তৈরি করতে দেখা যায়। ৮-১০ ইঞ্চি প্রশস্থ এই বেড়া দ্বয়ের ফাঁকে অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থানে কাঁদা ঢেলে দেয়া হয়। ঘর নির্মিত হয়ে গেলে কেউ কেউ বেড়া দুটি তুলে ফেলেন, আবার কেউ কেউ বেড়াটিকেও মাটি দিয়ে লেপ্টে দেন। নির্মাতাগণ ছাদ পূর্বের মতোই তৈরি করেন।

৪. কুড়ে বা ছনের ঘর

এই ঘর তৈরির জন্য প্রয়োজন ছন বা শন এবং ন্যাড়া বা খড়। খড়কে সিলেট অঞ্চলে খেড় বলে।

মটির ঘরের মতোই প্রথমে বাঁশ কেটে খাপ তৈরি করতে হয়। পরে অল্প অল্প ছন হাতে নিয়ে এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে উপরে ও নিচে একটি করে খাপ থাকে। খাপগুলোতে ৩/৪ হাত দূরে দূরে তার দিয়ে বেঁধে শক্ত বেড়া নির্মাণ করা হয়। ছন দ্বারা আচ্ছাদিত বেড়া তৈরির পর নির্মাতা একে চার মাথায় পুতে রাখা শক্ত খুঁটির সাথে সংযুক্ত করে ঘর নির্মাণ করেন। বাঁশ দ্বারা পূর্বের মতো খাপ তৈরি করে একই পদ্ধতিতে পরে চালও নির্মাণ করা হয়।

৫.অন্যান্য

গোয়াইন ঘাট উপজেলার খাসিয়ারা পূর্বে গাছের ডাল দ্বারা একধরনের বাসস্থান নির্মাণ করতেন। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে থাকায় পশুদের উপদ্রব থেকে অনেকটাই নিরাপদ থাকা যেত। বর্তমানে এধরনের বাসা খুব একটা দেখা যায় না।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

বর্তমানে সিলেট বিভাগের সর্বত্রই আবদুল করিমের গান অধিক জনপ্রিয়। হাসন রাজা, আরকুম শাহ্, দুর্বিন শাহ, আলম শাহ এবং রাধারমণের গানও এতদঞ্চলে প্রচুর গাওয়া হয়। তবে প্রত্যেকটি উপজেলাতেই কিছু স্থানীয় লোককবির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাদের গান স্ব স্ব অঞ্চলে এখনো কম বেশি প্রচলিত।

সিলেটে বর্তমানে প্রচলিত কিছু সংগীত নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

১. ইসলামি সংগীত

১.

পড়ো নামাজ দেও জাকাত
হজ করো ভাই মক্কার ঘর,
হাশরে ত্বরাইয়া লইবা
রসুল পেগাম্বর ॥

নামাজ শরিয়ত, নামাজ মারফত
চিনিয়া কর এবাদত
হাশরে ত্বরাইয়া লইবা
রসুল পেগাম্বর ॥

পড়লে নামাজ, রাখলে রোজা
জায়গা অইবো ভাই বেছতের ঘর ॥

নামাজ পড়িও ফজর, মধ্যিখানে পড় জোহর
তার শেষে পড়িও আছর
দিলেতে রাখিও ডর ॥

মাগরিবোর নামাজ পড়
আল্লাকে সাজিদা কর
এশার নামাজ পড় মমিন
আইছইন যত দুনিয়ার উপর ॥
ফকির আজমতে বলইন্
মুর্শিদের চরণ তলে
ত্বরাসে পইবায় মক্কা
বিচারো আপনার ধড় ॥

www.pathagar.com

২.

তোমার লীলা খেলা বোঝা বড় দায় রে দয়াল আল্লাহ্
রসুলুল্লাহ জানের ডরে লুকাইলা গুহায়
জাল বানাইয়া বাঁচাইল কীট মাকড়শায় ॥
শিশু মুসা ভাসাইল মায়ে নীল দরিয়ায়
ফেরাউন দুশমনের ঘরে তুমি বাঁচাইলায় ॥
জন্ম পরে ইব্রাহীমে মায় রাখে জঙ্গলায়
কত না কৌশলে তারে তুমি বাঁচাইলায় ॥
লস্কর সহ আব্রাহা গেল ভাঙ্গিতে মক্কায়
আবাবিল দিয়া লস্কর ও তারে মারিলায় ॥
কত কত লীলা খেলা লেখবার নাই উপায়
দেওয়ানা নসিবুর মহান আল্লার দয়া চায় ॥

৩.

দয়াল আল্লা গো, তুমি আমারে ক্ষমার চউখে চাও।
আমি দাসি দীন দুঃখিনির আশা খান পুরাও।
আগুন লাগাইতে জান, তুমি পানিদি নিভাও।
ইব্রাহিম খলিল উল্যারে আগুনে বাঁচাও।
দয়াল আল্লা গো.....।
তুমি রাখ তুমি মার, হাসাও আর কাঁদাও।
ফেরাউন বানাইয়া তুমি মোছারেও পাঠাও।
দয়াল আল্লা গো.....।
নিজগুনে বিবি জুলেখার, নব যৌবন দাও।
মাছের পেটে ইউনুছ নবিরে উদ্ধার কইরা নাও
দয়াল আল্লা গো. . .।
অপরাধ হলে মুই দাসিরে ক্ষমা কইরা দাও।
পর পারে আলম শাহরে তুমি পারে লাগাও
দয়াল আল্লা গো.....।

৪.

দয়াল পুরাও বাসনা।
সৃষ্টির স্রষ্টা প্রভু তুমি, চাই করুণা।
রহিম রহমান নামে হইলাম দেওয়ানা।
রহম কর দাসির প্রতি বঞ্চিত কইরনা।
দয়াল পুরাও 'বাসনা.....।
কত পাপিরে রহম করে করিলায় ফানা ।
মুই অভাগি চির দুঃখী দাসি বানাওনা।
দয়াল পুরাও বাসনা.....।

www.pathagar.com

তুমি বন্ধু অন্তর্যামী তুলনা মিলেনা।
আলম শাহর মনের আশা, পাইত চরণ খানা।
দয়াল পুরাও বাসনা.....।

৫.

আল্লাহ তুমি সর্ব শক্তিমান,
কৌশলে বানাইলায় এই ভূমণ্ডল
সৃষ্টি করিলায় জিন্নাত ও ইনসান,
আল্লাহ তুমি সর্ব শক্তিমান।
চন্দ্র, সূর্য, তারা এই বসুন্ধরা,
একবার দেখিলে জোড়ায় প্রাণ,
আঠারো হাজার জাত, সৃষ্টি করলায় মাখলুকাত।
এরই মধ্যে হইল তোমার মানুষ প্রধান।
বেহেস্ত আর দোযক সৃষ্টি করিলায় বরহক,
ভাল মন্দের দিতে প্রতিদান,
রাহমানুর রাহিম, অনন্ত অসীম,
বান্দার উপরে তুমি থাকো মেহেরবান।
তুমি হও মালিক সাঁই, আমার বলতে কিছু নাই,
আমার মাঝে যত কিছু সবই তোমার দান,
ডাকি আমি তোমারে, দয়া করো আমারে,
মস্তফা জীবন ভরে গাই, যেন তোমার গুণ গান।

৬.

আল্লাহ্ লক্ষ কোটি সেজদা আমার গ্রহণ করো,
তোমায় ডাকিতেছে বলে আল্লাহ আকবর,
লক্ষ কোটি সেজদা আমার গ্রহণ করো।
ছামিউম বাছিরও তুমি আর জানি অন্তর্যামী,
অসীম অপরাধী আমি, আমারে সংশোধন কর।
দিলে থাকলে ফাঁকি জোকি, কওছাই আমি কিলা ডাকি, (কও-তো) (কী করে)
আমার প্রতি মায়া রাখি, বহাও রহমতের ঝড়।
শাস্তি দিলে সহ্য করমু, তুমি ছাড়া আর কোথায় যাইমু,
তোমার গোলাম তোমারই রইমু মস্তফা বুঝেনা পর।

৭.

দুরুদ ও সালাম ভেজি নবি মোস্তফায়,
মরা শিশু জিন্দা হল যাহার উছিলায়,
আমার নবি মোস্তফায়।
মরা গাছে ফল ধরাইলা,

www.pathagar.com

পাথরে জবান ফুটাইলা,
আকাশের চাঁদ দুই ভাগ করলা,
হাতের ইশারায়।
মশা মাছি কোন দিনও না
বসিত গায়,
আবরে দিত ছায়া,
বের হলে রাস্তায়।
অন্ধ লোকে নয়ন পাইয়া,
মানিল নবিজীর দ্বীন,
বোবা লোকে জবান পাইয়া,
কয় নবি আলামীন,
শোধ হবে না নবিজীর ঋণ,
বলে উদাস মস্তফায়।

৮.
কে যাওরে সোনার মদিনায়,
মদিনারই পথে, গেলে জিয়ারতে,
আমার সালাম কইও নবিজীর রওজায়,
মদিনার মাটি, সোনার চেয়ে খাঁটি,
নবিজী ঘুমিয়ে আছেন সে জায়গায়,
হায়াতুন নবি, নূরেরও ছবি,
এ নিখিল বিশ্বে যাহার গুণ গায়।
নবিজী আমার পারেরও কর্ণধার,
উম্মতের কাণ্ডার নিদানের বেলায়,
নবিজীকে স্বপনে, যে দেখলে নয়নে,
দোযখের আগুন হারাম হইয়া যায়।
নবিজীর উম্মর, তেষট্টি বৎসর,
উম্মতের জন্য কান্দিতেন সদায়।
লক্ষ কোটি সালাম মোর, অই নবিজীর উপর,
উদাসী মস্তফা কয় বসিয়া বাংলায়।

৯.
খোদার নামে দুহাত তুলে
কর মোনাজাত
এল সবেবরাত
এল সবেবরাত ॥

www.pathagar.com

খোদার দিদার ওরে মোমিন
চাইলে পাবে সেই দিন
ইনসাফ ইমান ঠিক রাখিয়া
দ্বীনের সাথে মন বান্দিয়া
খুঁজরে নাজাত ॥
কলপে আল্লাহ্ আল্লা
লাইলাহা ইল্লা আল্লা
মুহাম্মদের রাসুলুল্লাহ
জপ মুমিন সারা রাত ॥
প্রবীর কয় শয়তানের দিশা
তোর সনে মেলামেশা
ছাড়িছনে জান্নাতের আশা
করিছনে তা কর্ণপাত ॥

১০.

ইয়া মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ, ইয়া মুহাম্মদ হাবীব আল্লাহ
যার খাতিরে মাবুদ আল্লাহ এই ত্রিভুবন গড়িলা
ইয়া মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ
আসমান জমিন বৃক্ষলতা ঐ নূরের আলো হইলা
নবি অলি পির আউলিয়া ঐ নাম সাধনায় জপিলা ॥
ইয়া মুহাম্মদ রাসুল আল্লাহ ॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঐ নূর পাইলা
হুর হুরিরা আর ফিরিশতাগণ ঐ নামে মশগুল হইলা
ইয়া মুহম্মদ রাসুল আল্লাহ ॥
আঠারো হাজার জাতের শ্রেষ্ঠ ইনছান বানাইলা
আদমের কল্লে তারি নূরের খেলা।
ইয়া মুহম্মদ রাসূল আল্লাহ।
ফকির আপ্তাব বলে বৃথা জীবন গেলা
মুর্শিদ নুরুল শাহর চরণে ধরি কান দিয়া ফনো কিলা
নামে গুণে গুরুর দানে কত পাখি পার হইলা

১১.

লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মদ রাসুল
ঐ নামে সদায় জপেরে মন হইনারে ভুল
মুহম্মদ রাসুল আল্লাহ

ঐ নাম জপলে দিল ইমানে গতি নাই আর ঐ নাম বিনে

www.pathagar.com

জিওন মরণ দু জাহানে ঐ নাম ভবের ফুল মাহুম্মদে রাসুল ॥
যা হইবার তা হইয়া গেছে চাইয়া দেখ তুই বেলার দিকে
অল্প মাত্র সময় আছে সামনে তর অকূল মুহাম্মদ রাসুল।
বুঝাইলে বোঝেনা মনে কার কথা কেবা শুনে
প্রাণে মারল দুই নয়নে সবই মনের ভুল মোহাম্মদ রাসুল ॥
এখনো তর সময় আছে সদাই কর তুই যাওয়ার পথে
চলবে মন সোজা পথে শুকনা গাছে ফুটবো ফুল মুহম্মদ রাসুল ॥
জনম গেল ভুলে ভুলে আর কত বুঝাব তরে
বাউল আপ্তাব বলে প্রাণ থাকিতে পাইতে নবিজীর চরণ দুল।
মুহম্মদ রাসুল ॥

১২.

তুমি করিম তুমি রহিম তুমি মালিক মওলা
তোমার নামে পড়ি জিকির লা ইলাহা ইললাল্লাহ
জগৎটাকে বানাইয়াছ তুমি নানান দিক দিয়া
এক মুহূর্তে ফেলবে আমার ধূলিসাৎ করিয়া
সর্বক্ষেত্রে বিরাজ কর তুমি সুমহান আল্লাহ
আরশেতে তারা বেশে রাখলায় হাবিবুলাহ
আসমান জমিন বানাইয়া তার উছিলায়
নামের সাথে নাম মিলাইলা মুহম্মদ রাসুল উল্লাহ
হৃদয় খুলে পর জিকির করো হইয়া ফানা ফিলাহ
দুরুদ পড়ে রাজি কর নবি সাফাওয়াৎ উলাহ
ফকির আপ্তাব বলে প্রাণ থাকিতে পাইতে চাই নবির চরণ ধুলা ॥

১৩.

সর্বগুণের গুণি তুমি গুণেরই ভাণ্ডার
উম্মত জেনে রোজ হাসরে করবায়নি গো পার ॥
আমি একজন মহাপাপী সর্বক্ষণ তোমার অনুতাপী
আশার আশে চেয়ে আছি পাইতে দিদার
উম্মত জেনে রোজ হাসরে করবায়নি গো পার।
জানি তুমি সর্বসেরা কেউ নায় আপন তুমি ছাড়া
তোমার প্রেমে পড়েছি ধরা আর কেউ নাই আমার
উম্মত জেনে ইউসুফেরে করবায়নি গো পার।

১৪.

উড়িয়া উড়িয়া যাও পাখিরে আরে ও পাখি
ক্বাবার পথে দিয়া
আমার সালাম দিও তুমি নবির পদে নিয়া পাখিরে।

www.pathagar.com

আরও সালাম দিও পাখিরে আরে ও পাখি
হযরত আলীর কাছে
মা ফাতেমা হাসান হুসেন,
যেথায় আছেন শুইয়া পাখিরে।

অনেক আশা ছিল পাখিরে আরে ও পাখি
যাইব মদিনায়
দুনিয়ার বোঝা লইয়া ঠেকছি, যাওয়া হইল না পাখিরে।

পাগল মুরাদে বলে, আরে ও পাখি
আমার মউতের বেলা
সারা অঙ্গে দিও মেখে পাক চরণের ধূলা পাখিরে।
উড়িয়া উড়িয়া যাও পাখিরে—

১৫.

হৃদয় ভরে তোমায় ডাকতে সাধ্য দাও আমারে
ডাকার মতো ডাকলে জানি পাওয়া যায় অন্তরে ॥

এই পৃথিবীর বাদশা তুমি পরয়ার দিগার
হৃদয় ভরে ডাকতে আছে বান্দা যে তোমার,
তুমি বিনে এ অধমে ডাকবে বলো কারে ॥

তুমিত দয়াল আল্লা দয়ার সাগর
তোমার দয়া পাইলে আমি হইবো অমর ,
তোমার নামটি জপে আমার হৃদয় মন্দিরে ॥

নিজাম বাদশা জানিলায় অতি গুনাগার
তারে তো বানাইলায় আলা আউলিয়ার সরদার ,
পাগল হেলাল মাফি মাঙ্গে মাওলা তোমার ধারে ॥

১৬.

জিকির ধর আল্লার নাম ধরিরে
দয়াল নবি উম্মতেরই পারের কাণ্ডারি ॥
যার খাতিরে এ বিশ্ব জাহান ,
তাহার নামে জিকির করে প্রাণ কর কুরবান ,
লা ইলাহা ইললাল লাহু বলরে সব সুর ধরি ॥
আমি অধম বরই গুনাগার ,
এভুবনে তুমি বিনে কেউ নাই রে আমার
তুমি যদি ভিন্ন বাস যাব আমি কার বারি ॥
তোমার নামটি লইয়া অন্তরে
দেশ বিদেশে ঘুরি আমি কান্দি দ্বারে দ্বারে

www.pathagar.com

পাগল হেলাল আসিক হইয়া
যেতে চায় তোমার বাড়ি ॥

১৭.
ওই শুন ওই শুন ওই শুন রে
এলো মা আমেনার কোলে
রাসুল এলোরে ,
রাসুল এলো রাসুল এলো
উম্মতেরি ভাগ্য খুললো
ওই রাসুলের নামে সবাই
দুরুদ ভেজরে ॥
খোদার নূরে রাসুল এলো
জাহার নূরে ভুবন হলো,
শফায়াতের কাণ্ডারি রাসুল উল্লারে ॥
হেলাল হইলো আসেক তোমার
সংকট কালে করিও উদ্ধার
হাসরের নিদান কালে পার করিওরে ॥

২. মুর্শিদি

১.
মুর্শিদ ধর খেদমত কর, সময় থাকতে ওরে বেহুশ
মুর্শিদের লাত (লাথি) না খাইলে, অইবেনি (হবে-কি) মানুষ।
মুর্শিদ রূপে মিলে খোদা, চিনিয়া কারো সজিদা,
মরিয়া ইল্লাল্লার গদা, স্বীকার করো নিজের দোষ।
মুর্শিদের কথা মানো, নিজরে নিজে আগে চিনো,
দূর হইয়া যাবে শয়তানও, মুর্শিদকে যদি রাখো খুশ।
মুর্শিদেরই ছবি আঁকো, পায়ের ধূলি গায়ে মাখো,
এক ধ্যানে বসে থাকো, মস্তফা কয় করে হুস।

২.
মুর্শিদ হইলা সাধনার মূল,
মুর্শিদের দয়া হইলে, হৃদ বাগানে ফুটবে ফুল,
মুর্শিদ হইলা সাধনার মূল।
মুর্শিদের আদেশ মতে, যে চলেছে সরল পথে,
ভয় নাই তার অকূলেতে, অবশ্য পাইবে কুল।
মুর্শিদ রূপ ধ্যান করিলে, স্বরূপে দিদার মিলে,
অন্ধকারে বাতি জ্বলে, থাকবেনা কোন গণ্ডগোল।
যে মজিলা মুর্শিদ সেবায়, দয়ার চাদর দিল তার গায়
বলে উদাস মস্তফায়, মুছন হবে জীবনের ভুল। (মুছে দেয়া যাবে)

www.pathagar.com

৩.

মুর্শিদ যার হইয়াছে আপন, মুর্শিদের ইশারা পেয়ে
অসাধ্য করিল সাধন,
মুর্শিদ যার হইয়াছে আপন।
মুর্শিদ যারে দয়া করে, ভয় নাই তার এ সংসারে,
থাকিয়া তাওহীদের ঘরে, বর্জকেতে দিল আসন।
যে খাইয়াছে প্রেমের বড়ি, সদায় করে রুনাজারি,
কলঙ্কেরও মালা পরি, গায়ে দিছে ভাবের বসন।
মোস্তফারই কর্মদোষে, সদায় থাকে রিপুর বসে,
মুর্শিদ যারে ভালবাসে, সাফল্য হইবে জীবন।

৪.

ও মন মুর্শিদ চরণ ধর, তন-মন এক করিয়া
দমের জিকির কর,
ও মন মুর্শিদের চরণ ধর।
মনরে, লওরে মুর্শিদের মন্ত্রণা,
ছাড় ভবের যন্ত্রণা,
শান, মান, হিংসা নিন্দা ছাড়ো।
মনরে, মুর্শিদের কাছে কিবলা কাবা,
সেই জায়গায় করিলে তওবা,
হজ্জ কবুল হয় খোদারই দরবার,
রূপ চিনিয়া করলে ভক্তি,
এক সজিদায় পাবে মুক্তি,
বেদ কোরআনে আছে তার খবর।
মনরে, দুই চক্ষু বন্ধ করি,
বর্জকেতে নিশান ধরি,
ভাব সাগরে স্নান গিয়া কর,
মস্তফা কয় ওরে মনা,
মানব জনম আর হবে না,
ভেবে কয় আখেরের বেপার।

৫.

মুর্শিদ তোমার চরণ পাইল যেজন
সফল তার জীবন,
কে আছে গো দয়াল মুর্শিদ,
তোমারই মতন।
থাক তুমি যার অন্তরে,

www.pathagar.com

তারে দুষমণে কী করতে পারে,
সদায় ফিরে রং বাজারে হইয়া মহাজন,
লইয়া প্রেমেরই প্রসার, হইয়াছে আৎদার,
লক্ষ কোটি আমদানি তার, মণি মুক্তা ধন।
তোমার হাতে সব সপিয়া, তব নামে নাম ধরিয়া,
লাভে মূলে তোমায় দিয়া, ডুবলো গো যেজন,
তুমি না হইলে সাথী, ডুবলে কি তার গো আছে গতি,
তুমি তার মূল সারথি, জিয়ন আর মরণ।
মস্তফা কয় আমি তোমার, মনে আশা রাখি,
তুমি আমায় সংকটে করিও পার জানিয়া আপন,
পাক পাঞ্জাতন উছিলাতে, উদ্ধারও সমন।

৬.

দয়াল মুর্শিদ বানিয়া কারিগর,
মুর্শিদের মন পাইল যেজন, সে ধরছে অধর,
মুর্শিদ বানিয়া কারিগর।
সরল মনেতে যারে, দিলা প্রেমের বর,
ঐ ভবের বাজারে সেজন লাখের সদাগর।
সাগরও শুকাইয়া হয় শুকনা বালুচর,
মাটিরও পিঞ্জিরায় থইছে হাওয়ার কবুতর।
দমের জোরে দেও পাড়ি জমেরই সাগর,
মস্তফা কয় বিরাজ করে আনন্দ নগর।

৭.

দয়াল মুর্শিদ তুমি আমায় ভুলিওনা
তুমি বিনে এই ভুবনে কেউ নাই আপনা
সাধ করে প্রাণ সপি দিলাম
জন্মে জন্মে আমি তোমার চরণ চাই
তুমি আমার সর্বস্ব ধন রূপা কাচা সোনা
তোমারে না দেখিলে আমার পরাণ বাঁচে না ॥

বাউল আপ্তাব বলে প্রেমের মরা তুমি কি জান না
তোমায় পাইলে সুখী হব আর কিছু চাহিনা ॥
দয়াল মুর্শিদ তুমি আমায় ভুলিওনা ॥

৮.

পিরিতে যে বিষে ভরা আগে জানি না
কাল নাগে দংশিলে বিষে মন্ত্র মানে না।
কাটলে সাপে ওঝা ধরে ওঝা বৈদ্য কতই মারে

www.pathagar.com

মনসার দোহাই দিলেও সেই বিষ নামে না।
শুন ওগো প্রাণ সজনী কী সুখে যায় দিন রজনী
মন জানে আর আমি জানি আর কেউ জানে না
কাল নাগে দংশিলে বিষে মন্ত্র মানে না।
বাউল আপ্তাব বলে গুরুর কাছে মহামন্ত্র তাবিজ আছে
সাপেনীরা মান্য করে কাছে আসে না।
কাল নাগে দংশিলে বিষে মন্ত্র মানে না ॥

৯.

আমি অকূলে পড়িয়া ও দয়াল মুর্শিদ
ডাকি তোমায় কাঁদিয়া।
একে মোর ভাঙ্গা তরী অকূলে ভাসাইতে পারি
তুমি বিনে ঘোর নীনাদে কে নিবে তরাইয়া।
অকূল নদীর তুফান দেখিয়া প্রাণ ওঠে মোর চমকিয়া
ও নামেতে কলঙ্ক রবে তরী গেলে ডুবিয়া
সঙ্গের সাথী যারা ছিল সকলই পালাইয়া গেল
ফকির আপ্তাবেরই প্রাণ থকিতে দেখিও একবার আসিয়া ॥

৩. সহজিয়া ও মারফতি সংগীত

১.

মন চিননিরে তোমার সঙ্গে যে আছইন (যিনি আছেন)
তনের মাঝে ছাপিয়া রইছইন মাবুদ নিরঞ্জন ॥ (আছেন)
টাট্টির উপর টাট্টি দিয়া আছইন তিনি ছাপিয়া
সারি সারি পাঞ্চ কোঠা, কোন কোঠায় কালিয়া ॥
ভাইরে ভাই, কথার মাঝে কথা নায়, অল্প একটা কথা
ছউল-ডউল কিছু নাই চৌদিকে তার মাথা ॥
হাল ব্াও হালুয়া ভাইরে তেই তেই বলে
দুইটি নাম জপে ভাইরে নাসিকার কলে ॥
ভাইরে ভাই, ফুলের বিন্দাবন ভাইরে ফুলের বিছান
কোন দিকে শিয়র কালার কোন দিকে পৈথান ॥
ভাইরে ভাই, বাছির শাহ্ ফকিরে কইন শুন দিয়া মন
ভাবে দড়াইয়া বুঝো মুর্শিদের চরণ ॥

২.

পন্থ চিননিরে, হায়রে মনা (চেন নাকি)
ভবের জনম বেরথা গেল মনা, আর তো আসিবনা ॥
আর সাধুর সনে পন্থ লইয়া, পন্থের কর দিশা
হারিলে পুণ্যির পন্থ-পাইবার নাই তোর আশা ॥

www.pathagar.com

পন্থীর সনে পন্থ লইয়া, পন্থের কর মেলা
ডাকাতের সনে পন্থ লইলে ডুবায় দুপুর বেলা ॥ (দ্বিপ্রহর)
কালা লীলা দুইরে পন্থ, লাগিয়াছে ঘাটা
বুঝিয়া চলিও পন্থ উপরে বিজলিয়ার ছটা ॥
সুজন সুমতি ভাইরে, পাগলা নদীর খেওয়া
দৃঢ় মুঠে ধরিও কাণ্ডার, চালাইতে হাওয়া ॥
আরে লাহুল দরিয়ার খেওয়া না পাইলাম তার কুল
কয় ফকির ভেলা শাহ্ ডুবাইলাম লাভ মূল ॥

৩.

দীননাথ অনাথ জানিয়া
প্রভু ত্বরাও আমারে
বেভুলেতে গেলা দিন
না চিনি তোমারে ॥

আসিয়া ভবের হাটে ঠেকিলাম রঙ্গে
হারাইলাম সব ধন যা লইয়া আইছলাম সঙ্গে ॥

পুণ্য ছাড়ি পাপ দিয়া ভরিলাম ভরা
সাধু সঙ্গ ছাড়িয়া যে হইলাম চোরা ॥

তোমারে চিনিতে প্রভু আসিলাম ভবে
ভবে না চিনিলাম যদি চিন্‌মু কবে ॥

আইন্ধার কোঠায় বসি বন্ধু কাজল কোঠায় খেলে
বিচারি অন্ত না পাই কর্মের ফলে ॥

জিকিরের তেল বাতি প্রেমের অনল
অনৈক্ষণে যোগাইল ঘর হইব উজ্জ্বল ॥

এমতে যোগান কইলে প্রকাশ হয় তন
ফকির ওহাবে কয় মিলিবে রতন ॥

৪.

তুমি মোরে ভাসাইলায় সায়রে রে ও কালাচান্দ
তুমি মোরে ভাসাইলায় সায়রে।
দিবা নিশি দহে মন
না পাই কালার দরশন
এই দুঃখ রহিল অন্তরে রে ॥
বানাইয়া খাকের কায়া

www.pathagar.com

তাতে দিলায় মহামায়া
তবে কেনে রহিলায় ছাপিয়ারে ॥

ভবের বাজোরে নিয়া
রাখিয়াছ ভুলাইয়া
কী সন্ধানে পাইমু তোমারে রে ॥

নিকুঞ্জ মন্দিরে থাক
তিলে পলে সব দেখ
বিরাজ কর সয়াল জুড়িয়ারে ॥

মহিমার সীমা নাই
নাম তোমার পাক সাঁই
অভাগীরে দেখাইতাম দিদার রে ॥

দরশন অমূল্য ধন
নাহি দেখি দুই ভুবন
দুঃখিনীরে রাখ চরণ তলে রে ॥

হায়াত মউত আর রিজেক
দিয়া দিছ সবারে
কুঞ্জিতালা রইছে
আপনার হাতেরে ॥

অধম উসমানে কয়
যদি মৌলার দয়া হয়
দেখা দিও নবিজি আমারে ॥

৫.

তারের কলে টিপ দিলে
পাইবায় বন্ধুর খবর
মনরে তুমি হওনা কেনে
পোস্ট মাস্টর ॥

তালাস করে দেখনা মন
দেহে তোমার অফিস ঘর
চারি দরজা ষোল কোঠা
অফিস তোমার অতো মোটা
দিবানিশি চালায় কল
কতশত কারিগর ॥

www.pathagar.com

ছয় কোঠা তার আলগা আছে
এক তারেতে টিপা দিলে
৬৩ জিলায় হয় খবর ॥

অধম শফিক বলে
তারের খেলা শিখতে পারলে
ঘরে বসি দিবানিশি
পাইবে খবর নিরন্তর ॥

৬.

দমের কলে চাবি দিয়া
দেহের তালা খুলনা
মুর্শিদ ভজিয়া মনরে
তার পরিচয় শিখনা ॥

ঘরির কাটা ঠিক করিয়া
সময় মত চাবি দিয়া
খুলতে পারলে দেহের তালা
দেখবে কত কারখানা ॥

দেখতে পাবে ছয় মোকামে
বাজনা হয়রে একই নামে
যত্ন করলে রত্ন মিলে
তুমি কেনে জাননা ॥

হইওনা আর পাগল মতি
মুর্শিদ ভজি শিখ নীতি
বাজাও বাঁশি দিবারাতি
ভুলে মূল হারাইওনা ॥

অধম শফিকে বলে
সুজাতুল্লার দয়া অইলে
পূর্ণচন্দ্র উদয় অইবে
অন্ধকার আর রবেনা ॥

৭.

কী রঙ্গ হেরিলাম রাত্রি নিশাকালে
গো প্রেমের মাতোয়ালে
নয় রঙ্গ বসন্ত কালে সুরঙ্গ বাগানে
বলওয়ার ফুল বুঝি ফোটে নিশাকালে ॥

www.pathagar.com

পাইলে বলওয়ার ফুল সৌভাগ্য আমার
শুনাইমু মনের কথা যাহা আছে দিলে।
কে বসিয়া আছে বল সোনার মন্দিরে
সোনা মুখ ঢাকিয়া রাখছে নূরের আঁচলে
না থামে হৃদয়ের জ্বালা উঠে বার বার
আগুন্নি লাগিল বুঝি শুকনা জঙ্গলে ॥

আইস আইস আইস আমার প্রাণের সাইয়াদ
ছটফট করিতেছি পড়ি প্রেম জালে
সোনাপুরের ঘাটে নিয়া উদাসী তশ্‌নাকে
রূপ সায়রে ভাসাইল কাহার জামালে ॥

৮.

জন্ম দিয়ে ভবের হাটে মৃত্যু কেন দাও হে ফিরি
দয়াল বারী বুঝতে নারি তোমার কারিগরি।
কারে মার শিশুকালে জননীর কোলে
কারে মার যৌবনেতে, কারে বৃদ্ধকালে
ভাঙা গড়া নামটি তোমার কর্ম তোমার বাজিগরি ॥

যদি তব মনোবাঞ্ছা আছিল এমন
তবে কেন মখলুকেরে করিলে সৃজন
আপন হাতে গড়িয়া নিজে আপন হাতে ভাঙ ফিরি ॥

কুমতি সুমতি তুমি দিলে সকলেরে
পাপের সাজা পড়ে আবার দোষী জনের ঘাড়ে
তুমি হর্তা তুমি কর্তা তুমি সর্ব অধিকারী ॥

পাপ পূণ্য দোষ গুণ যত কিছু হয়
সর্ব দোষের ভাগি আমি তোমার কিছু নয় ॥

কেবা আমি কেবা তুমি কেমনে পরিচয় করি
মটর গাড়ি এক্সিডেন্ট যদি কভু হয়
ড্রাইভারেই সাজা ভোগে গাড়ির কিছু নয়
গাড়ির সাজার হুকুম যে দেয়
হয় কি সে জন হক বিচারি ॥
পাগল আজিজে বলে তুমি হও তুমি
তোমার খেলা তোমার লীলা খাকের পুতুল আমি
হাওয়া রূপে বিরাজ কর ধরতে তোমায় নাহি পারি ॥

www.pathagar.com

৯.

জীবন কাটাইলাম আমি ভুলের ঘরে।
সময়টা করেছি নষ্ট, পড়িয়া ঘোর অন্ধকারে ॥
নষ্ট করিলাম চরিত্র, পারলাম না করতে পবিত্র,
ভুলে গিয়া আসল মন্ত্র, সময় কাটাই মদন পুরে ॥
জীবনের দুইটি তার, ভাল মন্দ দুই প্রকার,
না করিয়া এই বিচার, পড়ে গেছি অনেক দূরে ॥
ভুলে গিয়া প্রতিশ্রুতি, করেছি ভীষণ ডাকাতি,
মস্তফা কয় পাবো মুক্তি, মালিক যদি দয়া করে ॥

১০.

ও রূপ দেখল যেজন,
ঠেকল সে জন প্রেমের ছলেতে,
খাঁটি মানুষ হয় না বেহুস
কামিনীর সূতে ॥
বাজি ঘরের মাইয়া হইয়া,
বিশ খরমের ঘরে নিয়া,
প্রেম সূতেতে কান পাতিয়া
রাখছে কুলেতে ॥
ইলেক্ট্রিক যোগ করিল,
বৃক্ষ ছাড়া ফুল ফুটিল,
অলি ভ্রমর মত্ত হইল
মধুর লোভেতে ॥
ও মাইয়ার সাগরের খেওয়া,
পলকেতে আসা যাওয়া,
তথ্য বেদন যায়না
পড়িয়া মায়ার ডোরেতে ॥
চন্দ্র, সূর্য, তারা
চমকি উঠে নূর বদনে,
আশিক থাকে বৃন্দাবনে
মাসুকের সাথে ॥
এ মস্তফা বুদ্ধি হারা,
যার পিরিতে বাড়ি ছাড়া,
কলঙ্ক ডোরেরও গিরো
লাগছে গলেতে ॥
চমক সিতারার মত, আসা যাওয়া অবিরত,
বানাইল দিওয়ানা ভক্ত, হিলুল বেশেতে ॥

www.pathagar.com

১১.

মারিফতের পন্থ ধরিতে, শরিয়তে দেয় আগে বাঁধা,
মারিফতে রয় খোদাওে মন বাতিনে রয় খোদা ॥
চার তরিকায় আইন জারি, বাইতোছো মানব তরী,
খোঁজ কর চৌদ্দ নূরী, চৌদ্দ খান ওয়াদা ॥
সাক্ষাতে হাজির মিলে মুকামে মাহমুদা,
ধ্যান করে দেখতে পারে, দিয়া ছফেদ লাল জর্দা ॥
সপ্তম আকাশ ভেদ করিয়া, ছদরে ছিনা তওয়াফ করিয়া,
ইছমের জোরে দেও উঠাইয়া, সত্তর হাজার পর্দা,
তিল পরিমাণ জায়গার মাঝে, পড়ে আঠার সেজদা ॥
রুহুতে ইনসান ভারি রুহু নহে যোদা,
মস্তফা কয় জামালপুরে বিরাজ করে নুরুলহুদা ॥

১২.

ও সই পিরিত হইল কাল নাগিনী সাপ,
যারে একবার নেছ মারিল ডাকাইল বাপরে ॥
কাল পিরিতের উলটা ধারা,
যেমন জলে কলসি বেঁধে মরা,
বুঝেনা সে ভালা বুরা
উঠলে প্রেমের তাপরে, (জ্বর)
পিরিত হইল কাল নাগিনী সাপ ॥
শ্যাম পিরিতে যারে ধরে,
সে কি ঘরে রইতে পারে,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে,
যেমন ভূতে ধরার ভাবরে ॥
পিরিতের ঐ নিশানী,
টিপে ছাড়ে চোখর পানি,
এ মস্তফার দিন রজনী
মন থাকে খারাপ রে ॥
(সে রূপ আমি ভুলিব কেমনে)
বন্ধুর রূপ কী অপরূপ লাগিল নয়নে।
অন্ধকারে চন্দ্র যেমন উঠে গগনে,
তার চাইতে বেশি রূপ
আমার বন্ধুয়ার বদনে ॥
হাসি মুখে কইল কথা মধুর ও বচনে,
মন ও প্রাণ কাড়িয়া নিল প্রেমের আলিঙ্গনে ॥
দিবা-নিশি উচাটন করে আমার মনে,
মস্তফা কয় যাব আমি বন্ধুর দরশনে ॥

www.pathagar.com

১৩.

আমি যার দেওয়ানা (সে বিনে মোর প্রাণ বাঁচে না),
বন্ধুর প্রেমের পোড়া দেহ অন্যরে দেখবো না,
সে বিনে মোর প্রাণ বাঁচে না ॥
আমি তার পিরিতে মরা, আমারে কেউ ছুইল না গো তোরা,
প্রেম আগুনে পুড়া দেহ, জল দিলে নিবে না ॥
কদমতলায় যাবো একা, যদি বন্ধুর পাই না দেখা গো,
বিচ্ছেদের ছুরি মারবো বুকে এ জীবন রাখব না ॥
মস্তফারই আন্তিমকালে, যদি পাই দয়ার বলে গো,
জড়াইয়া ধরিব গলে, পূর্ণ হইবে কামনা ॥

১৪.

প্রেমিক যারা আনন্দেতে নাচিয়া বেড়ায়,
থেকে প্রেম গাছের ছায়ায় ॥
আইদ্য যুগে প্রেম করিলা রাসুল ও আল্লায়,
আদম হাওয়া প্রেম করিয়া আইলা দুনিয়ায় ॥
প্রেম বাগানে ফুল ফুটেছে আজব নমুনায়,
সুগন্ধেতে ভ্রমর অলি নাচিয়া বেড়ায় ॥
মস্তফা কয় প্রেমের গাছে উঠা বিষম দায়,
মরার আগে মরছে যারা, ডালে ডালে বায় ॥

১৫.

জীবন মরণ তোমার চরণ ধরে আমি থাকিবো,
তুমি ছাড়া বন্ধু বলে আর কারে ডাকিবো ॥
এ জীবনে সে জীবনে চরণে থাকিবো,
বিকাইয়াছি মনে প্রাণে, আমি আর কই যাইব,
তুমি ছাড়া বন্ধু বলে আর কারে ডাকিবো॥
সন্ত বলতে যেবা যারা, তোমায় সদা ডাকে তারা,
তোমার নামে মধু ভরা, পান করিলে শান্তি পাইবো ॥
মস্তফা কয় তুমি সাই, আমি বলতে কিছু নাই,
তোমার দেওয়া সব কিছু পাই, কি দিয়া ঋণ সুধিবো ॥

১৬.

হিসাব তোমার দিতে হবে, নিঃশ্বাস যখন হইবে শেষ,
আমল যদি নষ্ট হয়, গায়ে লাগবে আগুনের গ্যাস ॥
উড়ে গেলে হওয়ার পাখি, চলবে না আর ফাঁকি জুকি,
করে যদি থাকো নেকি, পাবে শান্তির পরিবেশ॥
কি লেখলে জীবনের খাতায়, শুনলে ধুন ছড়ে মাথায়,

www.pathagar.com

পালাইয়া যাবে কোথায়, মানছনি প্রভুর আদেশ ॥
গোপনে পাপ করে যারা, সেই পাপও পড়িবে ধরা,
কাইক্ দিতে পারবে না ওরা, মস্তফা কয় খাইবে ঠেস ॥

১৭.

ভাবের দেশে গেল যেজন,
দিন কাটায় সে স্বাধীনে,
বলছে আশিকগণেরে ভাই,
বলেছে আশিকগণে ॥
যারা হইয়াছে পীর ভক্ত,
সংসার থাকি হইছে মুক্ত,
সাজিয়া খোদার ভক্ত,
চলে রাত্রি দিনে,
হুব, লোভ, হিংসা, নিন্দা,
নহে তার অধীনে,
বর্জকে নিশানা করে,
সময় কাটায় দম সাধনে ॥
সেই দেশের রশিক যারা,
তারাই ধরছে অধর ধরা,
সাজিয়া প্রেমের ভ্রমরা,
থাকে যোগ সাধনে,
মোরাকাবায়, মোশাহেদায়
শান্তি পায় মনে,
মাশুকরে সাক্ষাতে রাখি
ধারা বহায় দু'নয়নে ॥
খোদার নামটি অমৃত ফল,
আশিকগণের পানীয় সুফল,
ছাড়িয়া নয়নের জল
কান্দে রাত্রি-দিনে,
লোকে যদি মন্দ কয়,
চায়না তার পেছনে,
মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছে,
কয় মস্তফা দীন হীনে ॥

১৮.

মারিফতের দেশে যদি যেতে চাও,
আকাইদ ঠিক করিয়া
ভাবের পোশাক গায়ে লাগাও ॥

www.pathagar.com

মনরে, হকিকতি রাস্তা ধর,
সেই রাস্তায় এগিয়ে চলো,
শুকনা কাষ্ঠে ধরাও ফল,
শিখ ছয় লতি ফার বাও,
দমে দমে বল আলা,
হয়ে যাও ফানা ফিলাহ,
আশিকে রাসুলিলাহ,
খাতার মাঝে নাম উঠাও ॥
মনরে, দূর হইলে মনের কালি,
দেখিবে নূরের তজলি,
সাজিয়া প্রেমের বুলবুলি,
নামের মধু চোষে খাও,
গিয়া মোরাকাবার ঘরে,
ধরো তারে ধ্যানের জোরে,
বিনয় করো ভক্তি ভরে ,
ছাদিক প্রেমের ভিক্ষা চাও ॥
মনরে,
পাইতে চাইলে অমূল্য ধন,
আমিত্বরে করো বর্জন,
রূপের ঘরে রূপের সার্জন,
রূপের সাথে মিশে যাও,
সে রূপে মিশিলো যারা,
তারাই ধরছে অধর ধরা,
এ মস্তফা কর্ম পোড়া শিখলো না,
বাণিজ্যের বাও॥

১৯.

বর্তমান পরিস্থিতি
কেমনে আমি প্রকাশ করি,
ভাব দেখিয়া মরি,
আমি ভাব দেখিয়া মরি ॥
আইলোরে কলির জামানা,
কারো কথা কেউ মানে না,
মা বাবার বায় ফিরিয়া
চায় না দিলেতে গুরুরী,
ছোট বড় নাই ভেদাভেদ
কী যে উপায় করি,
উচিত কথা কইতে গেলে,

www.pathagar.com

আগে পড়ে মাথায় বাড়ি ॥
মুখে মুখে ধর্ম বিধান,
গরু খাইয়া হই মুসলমান,
মোয়াজ্জিন দিলে আজান
বন ফাতারে দৌড়ি,
মরণ কথা স্মরণ নাই
নামাজ রোযা ছাড়ি॥
সামান্য ফুরসৎ পাইলে
দিন বাধিয়া ছুগলখুরী ॥
উঠে গেছে দয়া ধরম
জীনার বাজার হইছে গরম, .
আরো নাই লজ্জা শরম,
দেখো চিন্তা করি,
চার পায়া জানোয়ারের মত,
করে দৌড়া-দৌড়ি,
ভাল মন্দের ধার ধারেনা
সুযোগ পাইলে করে চুরি ॥
সমাজে যারা ভালো মানুষ,
তারারে এখন কইনরে বেহুশ,
ওদের কথা কেউ মানে না,
ভুলের ঘরে পড়ি,
মস্তফা কয় আর কত দিন
করবে দৌড়া-দৌড়ি,
যমের ফেদায় ধরলে ঘাড়ে,
হাওয়ার পাখি যাবে উড়ি ॥

২০.

কুনো ব্যাঙে হাতি খাইলায়
দেখ গিয়া সুন্দরবনে,
দেখার যদি ইচ্ছা জাগে
উঠো সখের বিমানে,
কুনো ব্যাঙে হাতি খাইলায়
দেখ গিয়া সুন্দরবনে।
কুনো ব্যাঙ জন্ম আন্ধা,
ভোজন করে সকাল সন্ধ্যা,
আনাতেলে খাইলায় রাইন্ধা,
পায় যদি ভাগ্য গুণে।
মানুষ দেখে ফুলায় গাল,

www.pathagar.com

বৃষ্টির সময় ছাড়ে লাল,
কাছে গিয়ে কত কাঙ্গাল,
খাইছে থাবা গর্দানে।
গুরুর নাম করো স্মরণ,
উদ্যেশ্য হইবে পূরণ,
হবে তোমার চন্দ্র 'সাধন,
মস্তফা কয় গোপনে।

২১.
বাঁশি বাজেরে, মুহাম্মদী তনে বাঁশি বাজে,
বাঁশি বাজায় প্রাণ বন্ধুয়ায়, নব রঙ্গে সেজে।
মন অরণ্যে বাজায় বাঁশি,
প্রাণবন্ধুয়ায় দিবানিশি,
শব্দ যায় লাহুতের নিঃশ্বাস।
বাঁশি বাজে বেশুমার,
চব্বিশ হাজার ছয় শত বার,
সুর যায় আকাশে বাতাশে।
বন্ধুর বাঁশি এত মধুর,
কি সুন্দর ধরাইয়াছে সুর,
মস্তফা হইয়া বিভুর মন আনন্দে নাচে।

২২.
কেন কর তুমি এ বড়াই
কি ভাবে হয় জন্ম মরণ
একটু ভেবে দেখ চাই ॥

বাবার মস্তকে ছিলে, যে রাস্তায় প্রবেশিলে
রাস্তাটাকে মন্দ বলে ভবেতে, খ্যাত তাই
মন্দ কাজের ফলে, মাতৃ গর্ভে যখন গেলে
নাম শুক্র কীট ছিলে, মন্দ জায়গায় ছিল ঠাঁই ॥

ঘটিলে তোমার মরণ, মিলে আত্মীয় স্বজন
সৎকার করিবে তখন, বিধিমতে যাহা পাই
অগ্নিতে যাবে জ্বলে, কবরে না হয় ঘুমাইলে
মিশে যাবে পঁচে গলে, উভয়ে মাটিতে ভাই ॥

ধরা পড়ে স্রষ্টার জালে, যাবে যখন পরকালে
দেখবেন তিনি নথি খুলে, ভাল কোন কর্ম নাই
বিচার হইবে আইনে, জামিন নাই শাস্তি বিনে
দণ্ড হবে কর্মের জন্যে, হরিপদের নাই রেহাই ॥

www.pathagar.com

২৩.
তোমরা বন্ধুরে ভুলবে বলো না
আমি নিজেকে পারি
ভুলিতে তারে ভুলতে পারবো না
বন্ধু অন্তরের মাঝে সদাই এসে বিরাজে
তার পিরিতে মজে আমি
সহিব শত যন্ত্রণা ॥
হৃদয়ে তারে রাখিব
চোখের জলে বুক ভাসাবো
মরতে হলে মরবো
আমি তবু তারে ছাড়বো না
চাই না স্বর্গ চাইনা সয়াল
আমি যে তার প্রেমের কাঙাল
যে জন কয় মুরাদ পাগল
তার পিরিতের দিওয়ানা ॥
তোমরা বন্ধুরে ভুলিতে বলো না
আমি নিজেকে পারি ভুলিতে
তারে ভুলতে পারবো না ॥
২৪.
অতি আদরের পাখি কেমনে ভুলিল গো
ফাঁকি দিয়া কই লুকাইল ॥
ঘরখানা মোর জীর্ণ হইতেই দরজা গেল খসে,
পলকে বাহির হইল চোখের নিমিষে।
গেলপাখি অচিনদেশে আমায় না বলিল গো ॥
জানতাম আমি যাবে পাখি আমায় একদিন ছেড়ে,
তবু মনে আশা ছিল ভুলে যাইতে পারে।
দুইজন ছিলাম এক ঘরে কেমনে পর হইল গো ॥

হরিপদ কয় দুঃখ হয় তাঁরে ভাবিলামনা পর,
খাওয়াইলাম যত্ন করে যা চাহে অন্তর।
সে বিনে কি হইবে মোর একটু না ভাবিল গো ॥

২৫.
এক রাক্ষসিনী আছেরে ভাই, এ ভব বাজারে।
জিতা মানুষ খেতে চায়, মরা দেখলে পলায় ডরে ॥

কাম নগরে ঘুরে ফিরে, বসত করে মণিপুরে,
যদি পায় সে দেখিবারে, আনে ধরে সু'কৌশলে ঘরে।
কত জনা মারা গেল তার সঙ্গেতে বাস করে ॥

www.pathagar.com

চিনবেনা দেখলে জানি, অপরূপ রূপসিনী
মধুর বুলে ভুলায় প্রাণী, কত ধনী সব দিল তাহারে।
সদা খায় সে সাদা চিনি, যায় না রমণীর ধারে ॥

হরিপদ কয় সবারে রাক্ষসিনী প্রতি ঘরে,
চিনবে যদি গুরু ধরে (তুমি) শিক্ষা নেওয়ার পরে।
খাওয়াইয়া নামের মিঠাই আপন কর তারে ॥

২৬.

অচেনা এক বনের পাখি বাস করে মাটির ঘরে।
আপন তো হলনা পাখি থেকে অতি আদরে ॥

সাধের ফাঁদে ধরা পড়ে ছটফট করে সর্বদায়
বাহিরে না যাইতে পারে তালা দেয়া দরজায়।
বন্দি থাকিয়া সেথায় বাস করে মোর কুটিরে ॥

জংলি পাখির মত নিষ্ঠুর আর নাই ভুবনে
স্বভাবের দোষ গেলনা এতদিন থেকে সনে
ভাবে বুঝি সেই পাষাণে না বলেই যাবে মোরে ॥

ঘর যখনি পুরান হবে ভেঙ্গে যাবে ঘরের দ্বার
সেদিন পাখি মুক্তি পাবে ফিরে না আসিবে আর।
হরিপদের শখের বাজার ভাঙ্গিয়া চিরতরে ॥

২৭.

আমি পাষাণ হইলাম তোর কারণে
দুই নয়নে নাইরে জল
তোর সনে প্রেম করিয়া
খুয়াইলাম সম্বল ॥

সুখ নাই আমার আপন ঘরে
বলবো বন্ধু দোষী কারে
তোর কারণে আমার ঘরে
বাধিল কোন্দল ॥

লইয়া স্বজন পাড়াপড়শি
কাটিত দিন হাসিখুশি
তোরে আমি ভালোবাসি
গেল আমার সেই বল ॥
রান্না ঘরে খাই রে গালি

www.pathagar.com

জলের বদলে তেল ঢালি
প্রবীর বলে কেমনে চলি
ঘৃত দিয়ে রাধি অম্বল ॥

২৮.

নূরে আল্লা নূরে নবি নূরে সৃষ্টি এই জাহান
বিন্দু রূপে ছিলেন আমার সাই ছোবাহান ॥

ছিলে শূন্য ধরলেন কায়া, মোহাম্মদকে পয়দা কিয়া
মিমেতে লাগাইয়া মায়া আলীফের মতো কেটে জান ॥

এশকেতে নূর হইল জাহির, নূরে করত খোদার জিকির
ভাবে বিভোর হইয়া অস্থির করে ছিলেন সৃষ্টি দান ॥

বলে পাগল লাল মিয়া, এক হতে দুই অঙ্গ হইয়া
সৃষ্টির ভাণ্ডা ফুরাইয়া নিজে গায়েব হয়ে জান ॥

২৯.

মাটির আদম ফুরাইলে
দম রয়না বেশিদিন
গণার দিন ফুরাইলে
মাটিতে মাটি বিলীন ॥

খোদায় আদম বানাইল,
ফেরেশতা ডাকিল
আব আতষ খাক বাদ
মিশল করিল।
নিজে খোদায় রুহ দিল,
আব্বব আর বিশ্বাস একিন ॥
রুহ ভিতরে গিয়া,
অন্ধকার দেখিয়া
একে একে তিনবার
আসিল ফিরিয়া।
যখন কপালে দেয়
নূর ঘষিয়া-
প্রশর হয় দেহ জমিন ॥
আদম বেহেস্তে আনল,
যতনে রাখল,
আদম হইতে হাওয়ার সৃষ্টি

www.pathagar.com

খোদায় করিল।
লাল মিয়া কয় আদম হাওয়া
সৃষ্টি জাতের প্রবীণ ॥

৩০.

কাম সাগরে প্রেমের তরী
কেমনে যাবে বাইয়ারে সুজন নাইয়া।
ঠেকছি ভবে ভাঙ্গা তরী লইয়া ॥
নাইয়ারে- নীড় ভাঙ্গা ঢেউয়ের চোটে,
ঝলকে ঝলকে পানি ওঠে
দিবানিশি কোল পাই না সিচিয়া।
ঢেউয়ের ফাঁকে কুমির ভাসে,
ভয়ে প্রাণী কাঁপে ত্রাসে,
হায় হুতাশে, ফাটে আমার হিয়ারে
সুজন নাইয়া ॥

কাম নদীর ঘাট পিছল,
শীত আসে শত রঙ্গের জল,
শুধা গরল লইওরে চিনিয়া।
এক লালে সাত রাজার ধন
তার চৌদ্দগোষ্ঠী হয় মহাজন,
পরশ রতন তোল
যোগ চিনিয়ারে সুজন নাইয়া ॥

নাইয়ারে- একটি নদীর তিনটি ধারা,
ধার না চিনলে যাবে মারা,
কাঁদবে আকুল হইয়া।
হিঙ্গুলা, পিঙ্গুলা, শুষন্মাতে আছে তালা,
তিন দিকে তিনজনের খেলা-
বলতেছে লাল মিয়ারে
সুজন নাইয়া ॥

৩১.

আমার বন্ধু প্রাণ ধন
তোমার লাগিয়া আমার
সদায় কান্দে মন
কর্ম দোষে না পাইলাম তোমার দর্শন ॥
আসিয়া এই ভবকূলে বাঁধলাম বন্ধন
ছয়জনারী কুমন্ত্রণায় মন হইল বিড়ম্বন

www.pathagar.com

মান মর্যাদা সবই নিল ভোলাইয়া মন
যে দিকে চাই সব বিদেশী কেউ নাই আপনজন।
আপ্তাব বলে প্রাণ থাকিতে দিও দরশন
দয়াল নবির চরণ তলে হয় যেনো গো মরণ ॥

৩২.

চুল পাকিল দাঁত পড়িল চোখে আমি কম দেখি
দিনে দিনে আয়ু কমে বয়স আমার হয় ভাটি।
বল শক্তি সব ক্ষয়ে গেছে মানুষ নামে শুধু দেহ আছে
হুস বুদ্ধি আমার চলে গেছে হাতে নিলাম লাঠি।
দায় হইল উঠা বসা স্পষ্ট হয় না মুখের ভাষা
ভবে থাকার নাই ভরসা চলে আসবে শেষ চিঠি।
বেলা আমার চলে গেল অবহেলায় দিন ফুরাল
আপ্তাবের কী উপায় বল ছুটে গেল প্রাণ পাখি ॥

৩৩.

অতি সাধে ঘর বান্ধিলাম কুশিয়ারার কিনারে
দারুণ জোয়ারে পাড় ভাঙ্গিয়া ভাসাইলো সাগরে ॥
নদীর জোয়ার সর্বনাশা এ পাড় ভাঙ্গে ওপার গড়ে
কুলের নাই ভরসা তার মধ্যে নাই ভালোবাসা
সাগর গ্রাস করে সর্বকালে।
দারুণ জোয়ারে পাড় ভাঙ্গিয়া ভাসাইলো সাগরে ॥
নদীর হোয়ারিয়া ঢল কতভাবেই নৌকা টানে
করে জলের তল—
লঞ্চ ইস্টিমার ডুবে অবিরল দেখলাম কত ঘুরে।
দারুণ জোয়ারে পাড় ভাঙ্গিয়া ভাসাইল সাগরে ॥
নদী বয়ে চলে দূরে ঘর ভাঙ্গিয়া জলস্রোতে
নিয়ে যায় ভাসাইয়া অকূলে
ইউসুফে কয় আর বাইন্ধনা ঘর নদীর কূলে।
দারুণ জোয়ারে পাড় ভাঙ্গিয়া ভাসাইল সাগরে ॥

৩৪.

মাটির পিঞ্জিরায় সোনার ময়না রে
তোমারে পুষিলাম কত আদরে
তুমি আমার আমি তোমার এই আশা করে
তোমারে পুষিলাম বহু যত্ন করে।
জেনেছি এই পিঞ্জিরাতে তোমার বসতি

www.pathagar.com

এই পিঞ্জিরার জন্য তোমার পিরিতি
পিঞ্জিরা ভেঙ্গে কভু যাবে কি উড়ে
তুমি না থাকিলে মানুষ যায় যে মরে ॥
তোমার ভাবনা আমি ভাবি নিশিদিন
দিনে দিনে পিঞ্জিরা মোর হইল মলিন
পিঞ্জিরা ছাড়িয়া একদিন যাইবে উড়ে
দুধু মিয়া ভাবে এই বসে তার ঘরে ॥

৩৫

বন্ধুয়ারে গান লিখে করি প্রার্থনা।
গানের ভিতর হৃদয়ের ভাষা,
দূরে যায় যন্ত্রণা।
সর্বদায় বন্ধুয়ার ছবি,
গানে আরাধনা।
গানে মিলে প্রাণের শান্তি,
নাই গানের তুলনা।
বন্ধুয়ারে গান লিখে করি প্রার্থনা।
শুদ্ধ সুপথ গানের ভিতর
সদায় পাইতে করুণা।
গানে মনের কথা কয়
আর কত বেদনা।
বন্ধুয়ারে গান লিখে করি প্রার্থনা।
চরণ পাইতে বিনয় করি
প্রাণ বন্ধুর সাধনা।
এ আলম শাহ বন্ধু ছাড়া
স্বর্গের আশা করে না।
বন্ধুয়ারে গান লিখে করি প্রার্থনা।

৩৬.

মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়া
কারে দিলি তুই সেজ্‌দা।
ঐ মানুষের প্রাণের ভেতর সদায় যে
থাকে খোদা ॥
যারে তুই কাঁদাইলে
তারে গিয়া সেজদা দিলে
ভেবে একবার না দেখিলে
মানুষ চিনে নয় যে জুদা ॥

www.pathagar.com

মানুষকে ভালবাসিলে
মানুষেতে ঈশ্বর মিলে
জিতেন্দ্রিয় হইতে পারলে
সব রঙ যে হয় সাদা ॥
ভালোবাস মানুষকে মারে
খোঁজ পাবে তারে
চেয়ে দেখো অন্তর চোখে
সবি আদম জাদা ॥
পতিত পাবন নামটি যার
মানুষ রূপ রইয়াছে তার
তাইতো মুরাদ বলে বারে বারে
ভজ তারে ॥
মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়া
কারে দিলি তুই সেজদা
ঐ মানুষের প্রাণের ভেতর সদায় যে
থাকে খোদা ॥

৩৭.

তুমি জানলায় নারে মন
দিবানিশি হইতাছে চুরি আপন ঘরের ধন ॥
মুর্শিদের দেয়া ছড়ি লইয়া
যে জন থাকে পাহারায়
তাহার মাল কি চোরে পায়
ঘরের আগ দুয়ারে বসিয়া
সদায় করে জাগরণ।
সুখের শয্যায় আছো ঘুমে
ভুলিয়া মূল বিষয়
তাইতো হয় না নিজ পরিচয়
নিজের বিচার যে করি লয়
চোরকেও যে করে আপন ॥
মুরাদে কয় জেগে রইলে
হবে না আর চুরি
শুন ওরে মন ব্যাপারী
হইতে চাইলে আড়দ দায়ী
ভজ মুর্শিদের চরণ ॥
তুমি জাগলায় নারে মন
দিবানিশি হইতাছে চুরি
আপন ঘরের ধন ॥

www.pathagar.com

৩৮.

এ দুনিয়া মিছে মায়া
বুঝলে নারে অবুঝ মন
তুই মরিলে কান্দিবে কয় জন ॥
মিছে এই টাকা কড়ি
ধন জন জমিদারি রে
থাকবে না আর বাহাদুরি
হইলে আজরাইলের আগমন ॥

নয় দরজার তোর যে গাড়ি
মেস্তইর দিছে ডিজেল ভরি রে
ডিজেল যখন ফুরাইবে
থাকবে না আর আপন জন ॥

কবরেতে যখন যাবি,
বন্ধু বান্ধব নাহি পাবি রে
হেলাল বলে আপন নাই আর
মোলিক ছারা কোনো জন ॥

৩৯.

মিছে এই দুনিয়া রে মন
মিছে এই দুনিয়া
কী করলায় রে মন
এই ভবে আসিয়া,
ও মনরে,
লইলেনা দয়ালের নাম
তামাসায় ডুবিয়া,
যাদের লইয়া দিন কাটাইলে
সে যাবে ভুলিয়া
ও মনরে
দালান কোঠা পাকা বাড়ি
সকলি রাখিয়া
শূন্য হাতে যেতে হবে
কবরে চলিয়া
ও মনরে
মরণ কথা স্মরণ হলে
হৃদয় যায় ফাটিয়া
কেন আমি প্রেম বাড়াইলাম

www.pathagar.com

দুদিনের লাগিয়া
ও মনরে
হেলাল বলে
ও ভোলা মন—
দেখরে ভাবিয়া
দয়াল বিনে বান্ধব তো নাই
ভুবন জুড়িয়া ॥

৪০.

আজকে আছে কত কিছু,
কালকে কিছু রবেনা
সারে তিন হাত মাটির ঘরে
হবে ঠিকানা
কর্ম করে খাওয়ইলাম
সারা জীবন ভর
বুঝিলনা পাগল মনে
কে আপন কে পর
ওরে ইষ্টি কুটুম যতই বল
কেউতো সাথে যাবে না ॥
এই যে তোমার দলান কোঠা
হায়রে সাধের ঘর,
সব রাখিয়া যেতে হবে
অন্ধকার কবর
এসব কথা মনে হলে
বাড়ে কত যন্ত্রনা ॥
মাটির দেহ মাটির সাথে
যাবেরে মিশে
এ পৃথিবীর রং তামাশা
সবি হবে মিছে
পাগল হেলাল ভাবছে বসে,
ওপারের কাজ করলেনা ॥

৪. বৈষ্ণবগীতি

ক. গৌরগান

গৌরাঙ্গ বইলে ডাক মন কই তোমায়
সাধের দিন অসাধনে বৃথা-ই যায় ॥ গৌরাঙ্গ ....
যে পদ পাওয়ার আসে, ব্রহ্মা যায় বনবাসে

www.pathagar.com

সদা শিব শ্মশানেতে,
বেহুলা দেখ ভেলায় যায় ॥

কত যোগীন্দ্র ইন্দ্র মনীন্দ্র চন্দ্র
পদের ধুলো নিতে ব্যস্ত
দেখ পঞ্চানন পঞ্চমুখে গুন গায় ॥

গৌরাঙ্গ পূর্ণচন্দ্র,
পাদ পদ্মে কোটি মন্ত্র
ঘিরে চন্দ্র, আছে তন্ত্র
শ্যাম বলে ভবে লুটায় ॥

খ. বাঁশি

১.
প্রাণ কান্দেগো দিবা নিশি
কইলে লোকে বলবো দোষী ॥

ও বলি গো একে আমি কুল বালা
তার উপর ননদীর জ্বালা
আরেক জ্বালা পাড়ার প্রতিবেশী ॥

আমি মুখে বলি না বুক ফাইটা যায়
সইয়া থাকি দিবা নিশি।
ও সখিগো বাঁশির সুরে গান ধরিয়া
মিষ্ট সুরে মন সাজাইয়া
দুই নয়নে ঢালি শশী।
ও দীন জিতেনে কয় ছাড় আশা
কাজ নাই আমার ঐ পিরীতি
কইলে লোকে বলবো দোষী ॥

২.
বাঁশি দিয়া পরানে বাঁধিলায় রে
ও বাঁশি দিয়া
নারীর শরম ভরম ধরম করম
সব নিলায় হরিয়া
পরানে বাঁধিলায়রে
ও বাঁশি দিয়া ॥
তুষের অনল হৃদে জলে,
শ্যামে বাজায় বাঁশি রাধা বইলে

www.pathagar.com

রাধা মইলে তোমায় বাঁশির পানে
কে চাইব ফিরিয়া
পরানে বাঁধিলায় রে ও বাঁশি দিয়া ॥
বাঁশী নায় গো কাল ফনী
আমায় বন্দিয়াছে কাল নাগিনী
এগো বিষে অঙ্গ অবশ;
কও কে লামায় ঝাড়িয়া
পরানে বাঁধিলায় রে ও বাঁশি দিয়া ॥

৩.

রাজ পন্থে বসে রে রাধার বন্ধু
বাজাইওনা বাঁশি,
বাঁশি যে কোন মন্ত্র জানে,
আমার মন করল উদাসীরে।
রাধার বন্ধু বাজাইওনা বাঁশি॥

যখন বন্ধু বাঁশিয়ে দিল সুর,
কলসি কাঁখে জল আনিতে,
গেলাম অনেক দূর,
বাঁশির সুর শুনিয়া রইলাম চাইয়া,
জাতি কূল বিনাসীরে॥

নিত্য বাঁশি বাজায় শ্যামরায়,
তোমার মনে রাধিকারে
প্রাণে বধিতায়,
আমার কী ধন আছে
কী ধন দিয়া ,
করব তোমায় খুশিরে॥

শ্যামের বাঁশি প্রাণ কাড়িল,
তিলেক মাত্র গৃহে আমায়
রইতে না দিল,
মস্তফা কয় সঙ্গে নিয়া
বানাও চির দাসীরে॥

৪.

কদম তলে মোহিনী সুরে
কে বাজাইল শ্যামের বাঁশি
রাধা নাম ধরে।

www.pathagar.com

আমার অন্তরে শ্যাম বিরহের
আগুন জ্বলে দাউ দাউ করে ॥

কেরে তুমি বাঁশি ওয়ালা
কে শিখাইল সুর উতালা
কেনে আমায় দিলে জ্বালা
শ্যাম নাই ঘরে
মনের আগুন বাড়ায় দ্বিগুণ
যায় কলিজা পুড়ে ॥

নিদারুণ এই নিশি রাতে
কে গো তুমি গকুলেতে
বাঁশি বাঁজাও উদাস চিত্তে
শ্যাম খুঁজিয়া পাইনা তারে
প্রাণ আনচান করে ॥
আমি শ্যামের প্রেমে বিলাসী
শ্যাম আমার গিয়াছে ছাড়ি
তার বিরহে আমি উদাসী
থাকি একা ঘরে।
ইউসুফে কয় ওরে বাঁশি
শ্যাম আমার হইল বিদেশি
আসেনা ফিরে কে বাজাইল
শ্যামের বাঁশি রাধা নাম ধরে।

৫.

কুলমান আর যায় না রাখা
বাঁশিয়ে ডাকে রাধা রাধা
ও সখি গো কোন বনে বাজায় বাঁশি ॥
যাইনে আয় গো প্রাণ স্বজনী।
বাজলে বাঁশি বাধা দিও না।

কালার বাঁশির স্বরে যায় প্রাণ উইড়া
উড়াল প্রাণ আর যায় না রাখা
বাঁশিয়ে ডাকে রাধা রাধা।

ও সখিগো প্রেম করিছলায় স্বাদে স্বাদে
এখন কেন লোকে হাসে।
প্রেম বুঝি আর ভাল লাগে না।
ও ভাইবে মোহন্দ্রয় কয়

www.pathagar.com

বাঁশির দোষ কেনে হয়।
কর্মের দোষে, বাঁশিয়ে ডাকে
রাধা মরে নিজের ফাঁদে
আত্মার বাঁধন না হইলে
তাঁরে পাওয়া যায়না।

৬.

আয় গো সখি বৃন্দাবনে যাই
যেথায় বাজায় বাঁশি শ্যাম কালায়২
সুরে ডাকে শুধু রাই রাই ॥
আমার মাথার কেশ দেও গো ছাড়ি
পরাও আমায় নীলাম্বরী
রসের বাঁশরি যেন
দুই জনে মিলে বাজাই।
সখি তোরা দূরে থেকে
যাবি কৃষ্ণ লীলা দেখে
না পরিও শ্যামের চোখে
মোরা দুই অঙ্গে অঙ্গ মিশাই।
আমার সোনার বন্ধের প্রেম পরশে
যাবো রসের জোয়ারে ভেসে
মুরাদে কয় থাকবো মিশে
খেলিতে প্রেমের লাই ॥
আয় গো সখি বৃন্দাবনে যাই
যেথায় বাজায় বাঁশি শ্যাম কালায়
সুরে ডাকে শুধু রাই রাই ॥

গ. বিচ্ছেদি

১.

চল গৃহে যাই গো সখি, চল গৃহে যাই
নিদয়া অরুণের উদয়, নিশি বাকি নাই।

বিনোদ নাগরের যদি নাহি দেখা পাই,
চুয়া চন্দন ফুলের মালা উদ্দেশ্যে ভাসাই।

মনে লয় প্রাণ তেজিব গরল যে খাই,
শ্যাম কলংকিনী নামটি আমার জগতে ঘুচাই।

ধর্ম ধরহ মন চিত্তে শিকল বান্ধি পায়,
পাশে থেকে চন্দ্রাবলি টানিছে তোমায়।

www.pathagar.com

২.

চন্দ্রাবলি গো ছাড় মোরে
রাধার কাছে যাই
কোকিলার পঞ্চম স্বরে
বুঝি নিশি নাই।
রাধা তন্ত্র, রাধা মন্ত্র,
রাধা গুণ সদাই গাই
রাধা বিনে রইব কেমনে
কোথায় গেলে রাধা পাই।
আদ্যা শক্তি মতি রাধা
সেজে আমার প্রাণের আধা
যার লাইগা করে পথ নিরঞ্জন
এক প্যারী হুতাসন।
সশিলায়ে বলে
সেজে গেলে বিনোদিনী রাই,
বিপিন বলে আসবে বন্ধু
রজনী পোহাই।

৩.

কার কাছে বলিব দুঃখের কথা
গো ও ললিতা।
মনের দুঃখ কইতে আমার
বনে পুড়ে পাতা গো ও ললিতা,
আমি কার কাছে বলিব দুঃখের কথা
গো ও ললিতা ॥
প্রাণ বন্ধুরে জেনে আপন,
সব কিছু করিলাম অর্পণ গো,
এখন দেখি কেমন কেমনে,
কয়না কোন কথা গো ললিতা॥
বন্ধু যদি আমার হইত,
এক নজর দেখিয়া যাইতো গো,
তিলে তিলে না জ্বালাইত,
দিতনা আর ব্যথা গো ও ললিতা॥
মস্তফা কয় জ্বলছে হিয়া,
সে রইল পাষাণ বান্দিয়া গো,
মোরে মাধবলতার কথা কইয়া,
দিল বন-চরতা গো ও ললিতা ॥

www.pathagar.com

৪.

সোনা বন্ধুর সনে পিরিত করি গো সখি,
কান্দিলাম সারা জীবন,
জানি না গো পিরিতি এমন।
সখি গো, শ্যাম পিরিতের এত জ্বালা,
সইতে নারি মুই অবুলা গো,
শিং মাছেরই গলার মত গো সখি,
সদায় করে উচাটন।
সখি গো, কাল পিরিতে যারে ধরে,
সে'কি ঘরে রইতে পারে গো,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে গো সখি,
যেমন ভূতের লক্ষণ।
সখি গো, এমন পিরিত কেউ করিওনা
যে পিরিতে নাই শান্ত্বনা,
মস্তফা যার দেওয়ানা গো সখি,

৫.

করো দুঃখ নিবারণ।
বন্ধু শ্যামচাঁন কালিয়া
কই রহিলে পিরীতি করিয়া ॥
বুক ভাঁসে নয়ন জলে
নিশি যায় জাগিয়া।
এভাবে কি যাবে জনম
আশা পথ চাইয়া।
প্রেম করিয়া কুল গেল
দোষী জগৎ জুড়িয়া।
সেই অনলে হিয়া জ্বলে
তোমার লাগিয়া ॥

যৌবন থাকতে না আসিলে (এসো)
মরণ বার্তা শুনিয়া।
আসিলে সার্থক হবে
হরিপদ কয় ভাবিয়া ॥

৬.

বন্ধু ছাড়া সোনার যৌবন
যাইব বিফলে

www.pathagar.com

মনে লয় সই বন্ধু আমার
গিয়াছে ভুলে
প্রথম যৌবন কালে
পিরিতি শিখাইল বন্ধে
ভুলবেনা বলে
দুঃখ পাই এসব ভাবিলে
কান্দি নিরলে ॥

বন্ধুর আশাতে থাকি
সোনার যৌবন ছাই করিলাম
গেল দুই আঁখি
মরণ আমার শুধু বাকি
কইও পাইলো॥

বন্ধু বিহনে আমি
থাকিতে চাইনা সখি
এই ভুবনে,
বসে ভেবে নিরালা
আলাউদ্দিন কয় জানতামনা
পিরিতের জ্বালা
এখন বাঁচি মরিলে ॥

৭.
শ্যাম কালার পিরিতে
সখি গো কুলমান গেছে
পিরিতি শিখাইয়া বন্ধে
অকুলে ভাসাইছে গো ॥
না জানি সে কারে পাইয়া গো
সখি সুখি হইয়াছে
আসবে বলে কথা দিয়া
ভুলিয়া গিয়াছে গো
মুই অভাগির দুঃখের নিশি
কান্দিয়া পোহাইছে গো ॥
সাধের কুঞ্জ সাধের মালা গো সখি
বিফলে গেছে
মনে লয় সে আমায় ভুলে
সুখি হইয়াছে গো

www.pathagar.com

তারে ছাড়া আলাউদ্দিন মরলো
মনের দুঃখ কই কার কাছে গো ॥

৮.

বন্ধুর প্রেমের এত জ্বালা জ্বলে অন্তরায়
কেমনে ভুলিব তারে ভুলা না যায়।
জল ঢালিলে দ্বিগুন জলে কী করি উপায়
বন্ধু আমার গলের মালা দেখলে প্রাণ জুড়ায়।
শাশুড়ি ননদী ভাবি আড় নয়নে চায়
বন্ধু বিনে একা ঘরে থাকা বিষম দায়।
আমার মনে সেই বাসনা জানে বন্ধুয়ায়
আপ্তাব বলে বন্ধুর প্রেমে কুল মান মজাই ॥

৯.

করি আমি হায়রে হায়
কী প্রেম শিখাইয়া গেল বন্ধু শ্যামরায়
শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া না পাই
তুষেরী অনলের মতো জ্বলে আমার কলিজায়।

কী করি কই যাই তাহার সমাধান নাহি পাই
নয়ন জ্বলে বুক ভেসে যায় করি কী উপায়।

বাউল আপ্তাব বলে আমারও মরণের কালে
প্রাণে বন্ধু চরণ তলে যদি আমার প্রাণ যায়।
কী প্রেম শিখাইয়া গেল বন্ধু শ্যামরায় ॥

১০.

কোথায় আছি কেমন আছি একদিন এসে দেখলে না
বন্ধু আমি যে আর সইতে পারি না
না জানি কি করেছিলাম আমি অপরাধ
হৃদয় কোলে ভালোবাসার রইল কত সাধ।
মোর ঝরে দুই নয়নের পানি বুকে তুলে নিলে না
বন্ধু আমি যে আর সইতে পারি না ॥
নাও যদি বুকে তুলে দাও আরো দুঃখ
আমি তোমায় ভালোবাসি জগতে দেখুক
ভালোবাসা কি দুর্দশা না করলে বুঝে না
বন্ধু আমি যে আর সইতে পারি না ॥
ক্ষমা করে দিও যদি প্রাণে ব্যথা রয়

www.pathagar.com

তবু প্রেমে এই ইউসুফের মরণ যেন হয়।
হয়তো সেদিন শান্তি পাবো দূর হবে সব যন্ত্রণা
আমি যে আর সইতে পারি না ॥

১১.

আমি কী করিব কোথায় যাইব তোমারে না পাইয়া
কাল নিশি জাগিয়া রইলাম পথও চাইয়া
বন্ধুরে তোমার লাগিয়া রইলাম পথও চাইয়া ॥
জ্বলে আগুন হিয়ার মাঝে মনের দুঃখ বলবো কারে
জল দিলে নিভেনা আগুন, নিভাবো কি দিয়া
বন্ধুরে তোমার লাগি রইলাম পথও চাইয়া ॥
জীবন গেল হায় হুতাসে মনের দুঃখ বলবো কারে
মন্দ বলে পাড়ার লোকে তোমার লাগিয়া
বন্ধুরে তোমার লাগি রইলাম পথও চাইয়া
কান্দে তোমার ইউসুফ পাগল সোনার যৌবন হইল শেষরে
কেমন করে রইবো এখন সাথি হারা হইয়া ॥
কাল নিশি জাগিয়া রইলাম পথও চাইয়া
বন্ধুরে তোমার লাগিয়া রইলাম পথও চাইয়া।

১২.

কোথায় রইল আমার বন্ধুয়া সুজন
প্রেম জ্বালা হয় না নিবারণ।
যার লাগি কলঙ্কী হইয়া মাথায় কালি লইলাম গো
সে জানি রইল কেমন?
সুন্দর তুমি সুন্দর বন্ধু সুন্দর তোমার মন
প্রেম জ্বালা হয়না নিবারণ ॥
প্রেমের বিষে উজান ধরে বাঁজবো আমি কেমন করে গো
নইলে আমি যাব মরে পড়ে রইবে সোনার জীবন
প্রেম জ্বালা হয় না নিবারণ ॥
কয় উদাসী ইউসুফ মিয়া থাকবো আমি কারে নিয়াগো

প্রেম জ্বালা হয় না নিবারণ ॥

১৩.

আমি কইতে নারী সইতে নারী অন্তরের বেদন
সখি বন্ধু এনে দেখাও গো থাকিতে জীবন।
বন্ধুয়ার বিচ্ছেদ অনলে ছাই হল মোর তন
বন্ধু বিনে তুষের আগুন হবে না বারণ।
জল বিনে বাঁচে না যেমন বৃক্ষ আর গুল্ম

www.pathagar.com

বন্ধু ছাড়া আমি অভাগী আছি মরারই মতন।
সর্বগুণের গুণি বন্ধু পতিত পাবন
পাইলে তারে হইবো সুখী দুঃখ হবে নিবারণ।
বনের আগুন জল ঢালিলে নিবে যায় তখন
প্রেমের অনল নিভে না গো না হইলে মিলন।
বন্ধুয়ারে আপন জেনে সপেছি মন যৌবন
ইউসুফ এখন সর্বহারা যদি না পাই দরশন।
সখি বন্ধু এনে দেখাও গো থাকিতে জীবন ॥

১৪.

পিরিত কইরা দোষের দোষী কূলে নাই মোর ঠাই
তোমরা বলো গো সখী কোথায় গিয়া বন্ধুয়ারে পাই।
জাতি কূল সব হারাইয়া আমি কান্দিয়া বেড়াই
কারে দেখাই মনের দুঃখ বন্ধু কাছে নাই।
শ্যাম বিরহে পুড়তে পুড়তে কলিজা মোর ছাই
করুণ এ বিচ্ছেদের আগুন কি দিয়া নিভাই।
সোনার দেহ ক্ষীন হইল আমার বাঁচার আশা নাই
ইউসুফ বলে জীবন থাকতে আসবেনি কালায়
সখি কোথায় গিয়া বন্ধুয়ারে পাই ॥

১৫.

শুনগো সই বিশখে শুনগো ললিতে
ভীষণ মরণ জ্বালা কালার পিরিতে ॥
সখিগো আমার মরণ হলে ভালো হতো
পলকে প্রাণ চলে যেতো
আমি বেঁচে আছি মরার মতো
না মারে না দেয় বাঁচিতে ॥
সখীগো শাশুড়ি ননদি বৈরি
রই তাদের ভয়ে চুপ করি
আমি পারি না কানতে দেখিয়ে
বালিশ ভিজাই কেঁদে নিশিতে।
সখি গো মুরাদে কয় আমার হইয়া
তোমরা যাও মথুরা খবর লইয়া
কইও শেষ দেখা দিত আসিয়া
আমার পিঞ্জরে প্রাণ থাকিতে ॥
শুনগো সই বিশখে শুনগো ললিতে
ভীষণ মরণ জ্বালা কালার পিরিতে ॥

www.pathagar.com

ঘ. অনুরাগ

১.

শ্যাম কালিয়া সুজন বন্ধু ঘরে আইলো গো।
ঘরে আইলা ঘরে আইলা ঘরে আইলা গো॥ শ্যাম॥
সখি তোরা সাজাও গো বাসর
আতর গোলাপ ছিটাইয়া দাও বিছানার উপর(২)
সুগন্ধি হইক প্রাণের দোসর মন ভোলাগো॥ শ্যাম॥
যার লাগি প্রাণ ছটপট করে,
নিজগুণে আইলা বন্ধু আমার বাসরে
প্রাণ জুড়াব সুহাগ করে দিয়া মালা গো॥ শ্যাম॥
কয় বিরহী কালা মিয়া
শান্তি হইল তাপিত হিয়া গো
বুকেতে বুক মিশাইয়া খেলব খেলা গো॥

২.

মন কানাইয়া তোমায় লইয়া যাব তেপান্তরে
তোমার বাঁশি আমার হাতে বাঁজিবে দিবান্তরে।
তুমি তরু আমি লতা নির্জন কোথাও যাইয়া
মোরা থাকিব মিশিয়া
পরস্পরকে জড়াইয়া রহিব অন্তরে রে ॥
মন কানাই তোমায় লইয়া যাব তেপান্তরে।
আমি নৌকা তুমি নাইয়া রঙ্গিন পাল উড়াইয়া
যাব প্রেম যমুনায় ভাইসা
মোহনায় থাকব দুজন, মিশে যুগ যুগন্তরে।
মন কানাইয়া তোমায় লইয়া যাইব তোপন্তরে ॥
আমি যদি হই ফুলবন্ধু তুমি হইও অলি
কানে কানে বলা বলি
মুরাদে কয় কৃষ্ণকলি বাসনা মোর অন্তরে।
মন কানাইয়া তোমায় লইয়া যাব তেপান্তরে ॥
মন কানাইয়া তোমায় লইয়া যাব তেপান্তরে
তোমার বাঁশি আমার হাতে বাজিবে দিবান্তরে ॥

[জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিক লেখকের এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন]

www.pathagar.com

ঙ. গৌর আরতী

সন্ধ্যায় নিত্যদিনকার প্রদীপ ও আগরবাতি প্রজ্জ্বলনের সময় এ আরতী কীর্ত্তন পরিবেশন করা হয়–

বলি গৌর চাঁদের আরতি করি
বাজে সংকীর্ত্তন সুমধুর ধ্বনি।
শঙ্ক বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতালি,
মধুর মৃদঙ্গ বাজে কান পেতে শুনি।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল ঘরে ঘরে বাতি,
ধূপ চন্দন লইয়া বাইর হইলা যুবতী।
বিবিধ কুসুম তুলে গেল বনমালা,
হস্ত পদ নৃত্য করে নিয়ে ফুল ডালা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদিদেবকে কর জোড় করি,
প্রণাম জানাই মন প্রাণ ভরি।
সহস্র বদনে যিনি মনি চক্রধারী
সেই গৌড় চরণে প্রণাম তারপর করি।

চ. হরিলুট

চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন সকালে পূজার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন ভক্ত বিভিন্ন দোকান এবং বাড়িতে গিয়ে ফল, বাতাসা, নকুলদানা সংগ্রহ করেন। পূজার পর কিছু প্রসাদ ভক্তদের জন্য সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট অংশ উপস্থিত সকলের মাঝে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া হয়। একে হরিলুট বলে। লুট অবশ্য গৃহকর্তা তার গৃহে স্ব-উদ্যোগেও সম্পন্ন করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই ফল অথবা বাতাসা, কদমা ক্রয় করে ভক্তদের নিমন্ত্রণ করে পূজার পর দেবতার প্রসাদ তাদের উদ্দেশ্যে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারেন। হরিলুটের প্রসাদ হাত দিয়ে লুফে নিতে পারাকে পুণ্যের কাজ বলে অনেকে মনে করেন। লুটের সময় নিম্নোক্ত ধরনের গান গাওয়া হয়।

সারা জনম ভরা হইলনা লুট ধরা,
ওরে মিছা (মিথ্যা) ভবে আসা যাওয়া,
আমার কর্ম পোড়া, হইলনা লুট ধরা।
নামের মূলা নকুল দানা পাইল রসিক যারা
আমার সারা জনম ভরা হইলনা লুট ধরা।
রসগোল্লা রসে ভরা পাইল রসিক যারা
ওরে বিপিনের ভাঙা কপাল লাগলোনারে জোড়া।

www.pathagar.com

ছ. মন শিক্ষা

যে কোনো সান্ধ্য পূজার আসরে বা হরিকীর্তনে মন সুস্থির করার জন্য এধরনের মন শিক্ষা বিষয়ক গান গাওয়া হয়

১.

ও মন তুই ফিরে আয়, এ পথে বাঘের ভয়
ঐ পথে গেলে পরে একাশ্বরী মরা বাঘে ধরবে তোমায় ॥
বাঘের নাম নাগেশ্বরী, যাইস না মন বুবরী
চৌদিকে জঙ্গলা বাড়ি মরা বাগে করল জয় ॥
জ্ঞান-গুণী যত ছিল তারা বাঘের হাতে প্রাণ সপিল
ক্ষেমায় কয় (বলে) একি হল মরা বাঘে করল জয় ॥

২.

কেন ভবে জন্ম নিলে
অকারণে কাল কাটালেরে
কী লাভ হল ভবে এসে
আমার বুঝল না মন পাগলে
জনম গেলরে ॥

কৃষ্ণ নামে নাই মোর মতি
কী হইবে পরে গতি রে
সময় থাকতে রাতারাতি
মন মজো সেই নামের তরে ॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম
নামের মর্ম এবার জানোরে
প্রবীর বলে সময় গেলে
ডাক দিবে যমের চরে
প্রবীর দেবনাথরে ॥

৩.

মন মাঝিরে দিক ঠিক রাখিয়া তরী বাইও।
আকাশেতে সাঁজ করেছে সাহস না হারাইও ॥

মাঝিরে...
শক্ত হাতে বৈঠা ধর নৌকায় উঠবে জল,
তুমি মাঝি মারা যাবে নৌকা হলে তল।
তামা সিসার বুঝাই নৌকা সাবধানে চালাইও ॥

মাঝিরে...
মদন গঞ্জে বেঁধে নৌকা কাটাইয়াছ দিন,

www.pathagar.com

দাঁড়ি ছয়জন নয় আপন তরী খানাও হীন।
পাঁক্ পানিতে ডুবে নৌকা হাইল ঠিক রাখিও ॥

মাঝিরে...
সন্ধ্যা হবে তুফান আসবে জলে উঠবে ঢেউ,
সঙ্গী সাথী পলাইবে রবেনা আর কেউ।
হরিপদ কয় বিপদ সময় নাম না ভুলিও ॥

জ. ঝুলন

আজি আনন্দে ভাসিল বৃন্দাবন,
কেশ হেলাইয়া নাচে গোপীগণ॥
মাজা হেলা দিয়া,
ঝুনুর ঝুনুর বাজে নূপুর টনাটন।
নাচে বনমালী হাতে দিয়া তালি,
সুখসারি যত পক্ষীগণ ॥
দেবেন্দ্র গজেন্দ্র দেবী
নাচে ইন্দ্র, নাচে চন্দ্র
লইয়া তারাগণ,
নাচে গোপীগণ ॥
যত ভক্তগণ আনন্দিত মন,
পাইয়া নারায়ণ করে বনোভোজন,
পূর্ণ হইল রসোগান,
সুখে বাসে মন প্রাণ,
গায় মস্তফা জয় ধ্বনি কীর্তন।
নাচে গোপীগণ।

ঝ. শ্যামরূপ

১.

ললিতে গো শ্যাম রূপ হয় বুঝি আরশি
ও শ্যাম হরেক সময় হরেক রূপে হরেক সুরে বাজায় বাঁশি।
শ্যামে খাইতো যখন ক্ষীর আর ননি
রূপ ধরিও নীল মনি গো
আবার না পাইলে ক্ষীর ও ননি হইতো কালো বরণ বেশী গো
ও যে লাল সবুজ রং ধরিয়া
রাধার মন নেয় কাড়িয়া গো
আবার বিরহে মারে পোড়াইয়া ধরিয়া রূপ কালো শশি ॥
একদিন কুঞ্জে শ্যাম এসেছিল

www.pathagar.com

ভুলে হাতের বাঁশি থইয়া গেলো
মুরাদে কয় কুল বাঁচাইলো বৃষ্টি ধারায় ঝরাই বাঁশি।
ললিতে গো শ্যাম রূপ হয় বুঝি আরশি
ও শ্যাম হরেক সময় হরেক রূপে সুরে বাজায় বাঁশি।

২.

এসেছে এসেছে শ্যাম, ঐ দেখা যায়,
হাতে বাঁশি নাকে নোলক, সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ঐ দেখা যায়।
হাতে তার মোহন বাঁশি, মুখে তার মুছকি হাসি,
ভুবন মোহন রূপের কিরণ, একবার দেখলে প্রাণ জুড়ায়,
ঐ দেখা যায়।
খঞ্জনেরি মত হাটে দেখিয়া কলিজা ফাটে,
ভক্তগণে মধু লুটে সখি গণে নাচে গাঁয়,
ঐ দেখা যায়।
বনফুলে গেঁথে মালা, পরিয়ে দিব শ্যামের গলা,
আনন্দে মন হয় উতলা, বলে উদাস মস্তফায়,
ঐ দেখা যায়।

৫. শাক্ত সংগীত

১.

জন্মিলা গো বিপদনাশিনী হিমালো পর্বতে রে
প্রচার হইলা দেবী ব্রাহ্মণেরো ঘরে যে,
উত্তমো মাণ্ডব ঘরে ঘট স্থাপন করিয়াছে।
সকলের মঙ্গল লাগিয়া গো, ঘট স্থাপন করেছে
আসন লাগে, বসন লাগে, ঘটে লাগে আম্রপত্র,
সিন্দুরের বিন্দু দিয়ে ঘটে আকইন (আঁকে) মণ্ডল রে
আমারে নি করলায় দয়া দীনহীন জানিয়া রে ॥

২.

এমন সংকট কালে কই রইলায় লুকাইয়া
ডাকিলে না দেও উত্তর গিরি রাজার মাইয়া।
সত্য যুগে দৈব্য সীতা নাম বাক শিবের বর্ণিতা,
কুণ্ডে প্রাণ ত্যাজিলা পতি নিন্দা শুনিয়া।
ত্রেতা যুগে রাম রাবণে যুদ্ধ সীতার জন্যে যে
রাবণকে রাখিলা মায়ের চরণে পূজিয়া।
বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা গোপীর মনে রস খেলা।
কত পাপী তাড়াইলায় গো মায়ের চরণ পূজিয়া
আমারেনি করিবায় দয়া দীনহীন জানিয়া।

www.pathagar.com

৩.

ক্ষেদ রইল মনে মাগো, পাপ রইল মা মনেতে
জন্মিয়া না দিলাম জবা বিপদ নাশিনীর চরণে।
ভাটিয়ল যুতে দিলাম জবা উজাত যুতে চলে যে,
চলে গেল রাম-লক্ষণ দেশে মইলা পিতা যে,
পিতারে হরিয়া নিল কাল দুষ্ট রাবণে।
রাম-লক্ষণ দুটি শিশু রইছন নদীর কুলেতে
তারা যে করিবা পূজা শতদল কমলে
দ্বীজরমে বলে বিপদ নাশিনীর চরণ তলে
আমারেনি করবায় (করবে) দয়া দীনহীন জানিয়া রে।

বিভিন্ন দুর্গা ও কালী পূজায় অবশ্য রামপ্রসাদী সংগীত-ই বেশি পরিবেশন করা হয়।

৬. সূর্যব্রতের গান

(সূর্যব্রতের গান হলেও সূর্যকেন্দ্রিক গান এখানে অনুপস্থিত)

১.

সখি আয় গো আয়,
নন্দালয়ে এ কি শুনা যায় ॥
কৌতূহলে সব নাগড়ি নন্দালয়ে যায়
যশোমতির পুত্র দেখি সুমঙ্গল গায় গো ॥
পঞ্চদিনের শয্যা ত্যাজি স্নান করে মায় ।
ছয় দিনে ষষ্ঠি পূজা করে নন্দরায় গো ॥
স্নান করি সব নাগড়ি বইছে আঙ্গিনায়।
বস্ত্র অলংকার যত পৈরায় নন্দরায় গো ॥
ভাব দেখি নন্দরানীর দয়া উপজিল।
দধি ডালি করে কাদা গড়াগড়ি যায় গো ॥
নন্দালয়ে এ কি শুনা যায় ॥

২.

মা ননি দেও খাই,
নন্দের আঙ্গিনায় নাচে সুন্দর কানাই ॥
নন্দ গেলা বাতানে, যশোধা গেলা জলে।
শূন্য গৃহ পাইয়া বাছায় ননি চুরি করে।
উকলির উপরে পিঁড়ি উদয় কোলে থইয়া।
ওরে তথাপিনা পায় বাছায় হস্ত বাড়াইয়া গো।
হস্তের মুরারী দিয়া ভাণ্ড কৈল পুড়।
উপরে ননির ভাণ্ড তলে চাঁদ মুখ।

www.pathagar.com

ঔনা খাইয়া রতনমণি ধোইয়া পুছইন হাত।
ওরে হেনকালে নন্দদুলাল দেখইন জননী সাক্ষাৎ।
জল লইয়া নন্দরানী আসেন ধীরে ধীরে
ননির চিহ্ন দেখইন তাইন সকল মন্দিরে।
ননি খাইল কেরে বাছা ননী খাইল কে
আমি খাই নাই ননি মাগো, খাইয়াছে বলাইয়ে ॥

৩.

তুই কেনে ঘরে আইলেরে বসুদেব
নিরধনীয়া মায়ের হরি কার ঘরে দিলে ।
গরল বিষ খাইয়া না কেন মইলে
কাঙ্গালিনী মায়ের হরি কার ঘরে দিলে।
দুইই স্তন ভরু ভরু কররে বসুদেব
অভাগিনী মায়ের জাদু কার ঘরে দিলে
গলায় কাটালি দিয়া না কেন মইলে।

৪.

একাদশী দিনে যেবা কবলি করে দান
অবশ্য হইব তার বৈকণ্ঠে প্রস্থান।
দ্বাদশী দিনে যেবা অন্ন করে দান
অবশ্য হইব তার বৃন্দাবনে প্রস্থান।
ত্রয়োদশী দিনে যেবা লগগুণ করে দান
অবশ্য হইব তার নবদ্বীপে প্রস্থান।
চর্তুদশী দিনে যেবা কবিন করে দান
অবশ্য হইব তার গয়াতে প্রস্থান।

৭. বিবাহসংগীত

অ. ধামাইল

সাধারণত বিয়ে বা মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে আগে ধামাইল সংগীত পরিবেশন করা হয়। কোথাও কোথাও বিয়ের দিন রাত্রিবেলা কনে ও বর পক্ষ উভয়ের বাড়িতেই বাড়ির মহিলা ও পুরুষেরা মিলে জল ধামাইল গান গায়। মহিলারা এর অগ্রভাগে থাকেন। এ ধরনের গান একপ্রকার বিশেষ নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয়। নৃত্যের বর্ণনা নৃত্য অংশে উপস্থাপিত হল।

বর বা কনের স্নানের জন্য জল সংগ্রহ করা উপলক্ষে যে ধামাইল সংগীত পরিবেশিত হয়, তাকে জল ধামাইল বলে।

www.pathagar.com

জলধামাইল সংগীত নিম্নরূপ

১.
জল ভরিয়া গৃহে আইলাম
সব সখির সনে।
কাজল বরণ কাল রূপ
পড়িয়া গেল মনে ॥
কাল কাজলে আঁখি জুড়ায়
আনন্দ জাগে মনে
শুধু দেহ হইয়া কালায়
প্রাণটি ধরে টানে ॥
না জানিয়া গেলাম জলে
ঠেকলাম রূপের ফান্দে
কুঞ্জমণি বলে ধ্বনি
আর যাইওনা জলে।

২.
জলে যাবে কি গো যাবে না
আমার মনে ওই তো বাসনা
এগো, নারী জন্ম গৃহ কর্ম গো সখি
না গেলে সারে না।
সখি গো জলে যাইনা কালায় ধরে
ননদীরা আছে ঘরে, এগো সজনী।
ও আমি ভুল করিয়া কূল হারাইলাম গো
সখি করতে আছি ওই ভাবনা, সখি গো
ভাবিয়া প্রতাপে বলে দুটুনা পিরীতি করলে
এগো সজনী ও যেমন চিনিতে লবণ মিশালে
গো, সখি, কোনটার সাধ মিলে না।

৩.
জলে গিয়াছিলাম সই
কালা কাজলের পাখি
দেইখা আইলাম কই।
এতদিন পালিছিলাম পাখি,
দুধ কলা দিয়া।
যাওয়ার কালে নিষ্ঠুর পাখি
না চাইল ফিরিয়া। (অংশ বিশেষ)

www.pathagar.com

আ. পানখিলি

সাধারণত বিয়ের পান-খিলি অনুষ্ঠানের সময়, গাঁয়ের বয়োজ্যোষ্ঠ মহিলারা এ ধরনের গান গেয়ে থাকেন–

চল সখি যাইয়া দেখি যজ্ঞের পান খিলি
আনন্দে উৎসব করইন জামাইর মা সুন্দরী ॥
শুন শুন দশরথে আয় ডাক দিয়া
আয় সকলে মিলিয়া তোরা মঙ্গল করিয়া ॥
দুই হস্ত ধরাধরি জোড় পান বুকাবুকি,
সোনা রূপা খড়িকা দিয়া পানে দিরা খিলি ॥ (দিচ্ছেন)
সাজাইয়া পানের খিলি করিলা সারি সারি
স্মরণ বলে দেবপুরে দেওনি শীঘ্র করি ॥ (দিয়ে আস)

ই. হলুদ বাটা

বিয়ের হলুদ বাটার সময় গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা এখনো এধরনের গান পরিবেশন করেন।

নীল আকাশে উঠল তারা
হলুদ বাটে রাজা বালা
হলদি তোর জন্ম কোথায়
আমার জন্ম মাটির নিচে।
ধান তোর জন্ম কোথায়
আমার জন্ম গাছে গাছে।

৮. আঞ্চলিক গান

১.

জন্ম নিয়া মায়ের কোলে
সুখে ছিলাম শিশুকালে
কিশোরকালে মনেছিল
সংসার সুখময়
মিছে বলা কথা সত্য নয় ॥

দেখি এখন অসার জীবন
ভালো হইত আইলে মরণ
দুর্দশা অভাব অনটন
জীবন অইল কষ্টময় ॥

সংসার জুড়ে যত দ্বন্দ্ব
এই ভালো এই মন্দ
কারো মনে নাই আনন্দ
সবাই দুখের কথা কয় ॥

www.pathagar.com

আপন পর দেখিলাম যত
কেউ কেউ আছে নিজের মতো
মুখ খুলিয়া কয়না কথা
প্রবীরে কয় সম্মানের ভয় ॥

২.

শোন বন্ধুগণ, ইজাত পীরাকি পাইলা কই (এ ধরনের)
নামাজ রোজা সব ছাড়িয়া কর শুধু হই চই,
ইজাত পীরাকি পাইলা কই।
নিজকে নিজে নাহি চিনে, জীবন কাটায় চঞ্চল মনে,
চোখ বুঝিয়া গাঞ্জা টানে, ইকটা (এটা) বলে রাস্তা সই ॥
পেশাব (প্রস্রাব) করে লয়না পানি, কই পাইছে ইলমে লাদুনি
বেশ ধরিয়াছে ভূজঙ্গিনীর, পাকনা ধানে দিয়া মই ॥
আমল গেছে কুলাউড়া, ঈমান অইছে লড়খড়া
লোভে দখল করছে সারা, মস্তফা কয় শোনগো সই ॥

৩.

গাইতে পারলাম না আমি গান।
গান গাইবার শক্তি দাও পাক ছোবহান।
গান গাইলে কেউ শুনেনা পাগল বলে করে তারনা।
গান ছাড়া প্রাণ বুঝেনা, গান আমার প্রাণ।
গাইতে পারলাম না আমি গান।
রহিম রহমান জগত স্বামী,
আমি তোমার চরণ কামি, রহমত কর দান।
গাইতে পারলাম না আমি গান।
তুমি হও সর্ব শক্তি, কর বন্ধু আমায় মুক্তি।
নয় দাও গাওয়ার শক্তি
আমি তোমার প্রেমে অজ্ঞান।
গাইতে পারলাম না আমি গান।

৪.

মন পাখি তুই যারে উড়িয়া
সোনার মদিনাতে যা তুই আমার সালাম লইয়া।
বড় আশা ছিলোরে পাখি যাব আরব দেশে
নয়ন জলে বুক ভাসাবো বসে রওজার পাশে
যাওয়ার সম্বর নাই যে আমার যাব কেমন করিয়া
মন পাখি তুই যারে উড়িয়া
আমার মা ফাতেমার পাক চরণে দিও যে সালাম
হযরত আলী হাসান হুসেন ওরা দুই ইমাম

www.pathagar.com

আবু বকর উমর ওসমান যেথায় আছে শুইয়া
মন পাখি তুই যারে উড়িয়া ॥
কইও পাঞ্জাতনের পাকচরণে মুরাদের মরণ
ঐ আশায় আশায় দিবানিশি পাগলের মতন
অধমের এই নিবেদন দিও তুমি পৌঁছাইয়া ॥
মন পাখি তুই যারে উড়িয়া সোনার মদিনাতে
যা তুই আমার সালাম লইয়া ॥

আঞ্চলিক গান

১.

সোনার নাও ভাসাইয়া দে ও কুশিয়ারাতে
সোনার নাও ভাসাইয়া দে।
নাও এর বৈঠা দিয়া মাররে টান
কুশিয়ারার ঐ বুকে
মরলে আমি ধন্য হইব কুশিয়ারায় ভাসাইলে ॥
কুশিয়ারার কূল ঘেষে কত গ্রাম গড়ে ওঠে
কত গ্রাম ভেঙে পড়ে
তবু সুখ দুঃখের সাথী হয়ে মানুষ
কুশিয়ারায় বেড়ে ওঠে।
ধন্য ধন্য ধন্য মোর কুশিয়ারার তীরে জনম
পূণ্য হইল মন ধন্য মোর সাধন ॥

২.

সুরমা গাঙ্গের পাড় বাড়ি
শাজলালর উত্তরসূরি
দেশ-বিদেশে বেট্টাগিরি
আমরা হক্কল সিলটি ॥
সিলেটরি কমলার বাগান
দেখলে সবার জুড়ায় পরান... ... (অংশ বিশেষ)

৯. বন্দনা গীতি

(অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন শিল্পি তার প্রথম গান হিসেবে কখনো কখনো এধরনের গান পরিবেশন করেন)

১.

হাজার দরুদ ছালাম ভেজি প্রভু নিরঞ্জন
হে মোর সৃষ্টিকর্তা নির্ধনিয়ার ধন।

www.pathagar.com

দয়াল নবিজীর চরণ মাথায় তুলিয়া লই সারাজীবন
হযরত আলী ও মা ফাতিমা হাসান ও হুসেন ॥
উসমান গণির চরণ আমি করি স্মরণ
আবু বক্কর ওমর আর আমীর হামযার চরণ ॥
আদম হইতে ঈসা নবির চরণ আমি করি স্মরণ
পীর আউলিয়া গাউছ কুতুব সবার চরণ ॥
আমার মা বাপের চরণ আমি করি স্মরণ
প্রাণের প্রাণ মুরশিদ আমার নরুল শাহ্র চরণ ॥
বাউল আপ্তাবের নিবেদন
এই সভাতে যত আছেন ভক্তবৃন্দ শ্রোতাগণ
ভুল ত্রুটি হতে পারে করিবেন মার্জন ॥

২.
ওহে প্রভু নিরঞ্জন, নাম তোমার করি স্মরণ
এই ভবেতে দিলায় যখন, সৃজন করিয়া।
দয়াময় নাম তোমার গেলাম শুনিয়া-(২) ওহে

আরশ কুরছি লৌহ কলম, আটারো হাজার আলম
জীবদেহে দিয়েছ দম, তুমি ভরিয়া।
স্মরণ করি হাজারবার, আসরে দাঁড়াইয়া॥ ওহে

স্মরণ কর পাঞ্জাতন, দয়াল নবি গুণধন
হযরত আলী হাসান হুসন, সঙ্গী করিয়া।
জগতমাতা মা ফাতেমা, যার খাতিরে পাইবো ক্ষমা,
যেদিন আলাহ এই দুনিয়া দিবেন ভাঙ্গিয়া ॥

বৃক্ষলতা আদি অন্ত, কিতাব কোরান হাদিস গ্রন্থ
আমার মনে দাও শান্ত ওহে কিবরিয়া।
ওস্তাদ গুরু মাতা পিতা, তাদের পথে নোয়াইয়া মাতা,
আছেন যত ভদ্র শ্রোতা, শুনেন মন দিয়া ॥

ভুলত্রুটি ক্ষমা চাইলাম, জামালবাজ হয় আমার গ্রাম,
সবার কাছে যানাই সালাম, নিবের সমজিয়া।
উস্তাদ এবং মুর্শিদ আমার, নামটি কফিল উদ্দিন সরকার
ভক্তি রাখি হাজার হাজার, কয় কালা মিয়া ॥

www.pathagar.com

১০. ভাটিয়ালি

১.

ও নাও চলেরে চলে ভাটিয়াল নদীতে নাও চলে,
কত সুন্দর নাও যে দেখে সে বলে ॥
নায়েতে পাইক যারা আল্লা আল্লা আল্লা বলে
জয় জয় বাংলা কইয়া (বলে) সুরতুলে করতালে ॥
কেউ দেখ তবল টুকে কেউ বাজায় ঢুলে
কেউ কেউ নৌকা সাজায় গোলাপের ফুলে ॥
তিন তক্তার নাও (নৌকা) খানি ঢেউ কাটিয়া চলে
আনন্দের আর সীমা নাই এ মস্তফা বলে ॥

১১. দেশাত্মবোধক

১.

বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ
আমি ধরণীর বুকে পাইনা খুঁজে তোমার মতো এমন দেশ।
বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ ॥
ধন্য আমি তোমার বুকে জন্ম নিয়েছি
জন্ম নিয়েই প্রথম আমি তোমায় দেখেছি
তাই তোমার বুকে মাথা রেখে যেন ছাড়ি নিঃশ্বাস।
সবুজে ঘেরা চারিদিকের মাঝে উদিত লাল সূর্য তুমি।
অপরূপ রূপ তোমার ওগো জন্মভুমি
তোমার রূপ দেখে আমি যাই ভুলে সকল দুঃখ ক্লেশ ॥
আবার যদি জন্ম নিয়ে আসি ধরণীতে
সে জনমেও রাখিও মা তোমার কোলেতে
ঠাঁই দিও মুরাদরে তুমি তোমার বুকেতে।
বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ

২.

বাংলা মা গো মা তোমার কোলে থেকে গো মা মরতে যেন পারি
তুমি আমায় রাখ গো মা আদর যত্ন করি ॥
তোমার মত আর কেউ নাই দরদী
তোমায় ছাড়া কোথাও আমি থাকিতে না পারি।
মনে যখন দুঃখ আসে তোমার গান ধরী
বুক ভাসিয়া যায় আমার চোখের জল পড়ি
তোমার লাগি রোদন করি মাথায় হাত মারি।
জড়াইয়া রাখ গো মা বুকে আমায় ঘরে
তোমার মনে দুঃখ আপ্তাব সইতে নাহি পারে।

www.pathagar.com

আমার যত ভালোবাসা দেব উজার করে
তুমি আমায় রাখ গো মা আদর যতন করে ॥

৩.
গাই তাদের জয় গান গাই তাদের জয় গান।
এই দেশেতে ঘুমে আছে ত্রিশ লক্ষ শহিদান ॥

পাক সেনাদের আক্রমণে যখন হই দিশেহারা
সিংহের মত গর্জে উঠল এদেশের সন্তানেরা।
অস্ত্র ধরে বীরের মত প্রাণ করিল যারা দান ॥

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান পুরুষ কিবা রমণী
সবাইর আশা পূর্ণ হল সে অনেক কাহিনি।
এই প্রতিজ্ঞা করব আজি রাখিতে পতাকার মান ॥

তাঁহাদের আত্ম ত্যাগে ধন্য আজি আমরা
ধন্য বলি জননীগো ধন্য পিতার ছেলেরা
হরিপদ কয় স্বামী হারা তাঁহাদের অবদান ॥

১২. মাতৃবন্দনা

১.
হেন মাকে ভুলে কেহ থাকিস না যার ভবে নাই তুলনা।
সে জন মমতাময়ী আদরিণী অপার যার করুণা ॥
বাবার মস্তক হইতে প্রবেশ করলে গর্ভেতে
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ করে যখন আসলে ভবেতে।
কত কষ্ট আসার পথে মা ছাড়া কেউ জানেনা ॥

শত কষ্ট গেল দুরে দেখে যায় চাঁদ মুখ
মা বলিয়া ডাকি যখন গর্বে মায়ের ভরে বুক।
পাইতে সন্তান সুখ সদায় করেন কামনা ॥
ডাক সদায় মা মা বলে ভক্তি রেখ মনে
স্বর্গ সুখ মায়ের বুক বাৎসল্য প্রেমের গুনে
হরিপদ কয় এ ভুবনে মায়ের মত পাবেনা ॥

২.
কই গেলায় কই গেলায়গো
আমার কই গেলায় জননী
তোমার কথা মনে হইলে
ঝরে চোখের পানি গো।

www.pathagar.com

দশ মাস দশ দিন গর্ভে মাগো
রাখ ছিলায় যখনি
কত ব্যথ্যা লইলায় মাগো
বিরক্তিকর হয়নি গো॥
এতদিন গত হইল মাগো,
তোমাকে দেখিনি
আরতো কেহ যাদু বলে (মাগো)
আমাকে ডাকেনি গো॥
তোমার ও বিরহে মাগো
আমি কান্দি দিন রজনী(২)
একবার দেখা দিয়া, (মাগো)
আমার জুড়াও অবুঝ প্রাণিগো॥
তোমার মত মায়ের আদর,
মাগো আরতো ভবে পাইনি (২)
তাইতো তোমার কালা মিয়া
(এখন) বিরহী দুঃখিনী গো ॥

৩.
আমার মাগো তোমার মত আপন কেহ্ নাই
দুঃখে সুখে তোমার বুকে কত শান্তি পাই ॥
আমার মাগো...কত শান্তি পাই (২)
তুমি বিনে এই ন ভুবনে, সবি হইলো ছাইগো। আমার
তুমি জানো সন্তানের বেদন গর্ভে দিলায় ঠাঁই
আমার মাগো...গর্ভে দিলায় ঠাঁই
গবি দুঃখে চলে যায় মা, যখন ডাকি মাইগো ॥ আমার ॥
মাতা পিতা হারাগো আমি বিরহের গান গাই
আমার মাগো---- বিরহের গান গাই
তাই বিরহী কালা মিয়া, কেঁদে বুক ভাসাইগো ॥

বহুলপ্রচলিত কিছু লোকসংগীত

সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মূলত লোকসংগীতই এখানে পরিবেশিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে অবশ্য পাশ্চাত্যের যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হয় বেশি। তবে তবলা-হারমোনিয়মের ব্যবহারও আছে অনেক অনুষ্ঠানে। সচরাচর অভিজাত শ্রেণির বিয়ের গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানে এসব সংগীত পরিবেশিত হয়। যেসব গান প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই পরিবেশিত হয়েছে সেগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হল;

www.pathagar.com

শাহ্ আবদুল করিম

১.

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাওলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম
হায়রে, মিলিয়া বাওলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম ॥

হিন্দু বাড়িনতো যাত্রাগান অইতো
নিমন্ত্রণ দিত তারা আমরাও যাইতাম।
কে হবে মেম্বার কে গ্রাম সরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥

বর্ষা যখন অইতো, গাজির গান আইতো
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইতো আনন্দ পাইতাম।
বাওলাগান, জারি গান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারি গান নাও দৌড়াইতাম ॥
বিঘ্ন বিবাদ ঘটিলে পাঞ্চায়াতের বলে
গরিব কাঙালে আমরা বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল, ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥

করি যে ভাবনা, সেদিন আর পাবনা
ছিল যে বাসনা সুখি হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

২.

কোন মেস্তুরি নাও বানাইল
কেমন দেখা যায়
আরে ঝিল মিল, ঝিল মিল
করেরে ময়ূরপঙ্ক্ষী নাও ॥ (স্থায়ী অংশ)

৩.

বসন্ত বাতাসে সই গো
বসন্ত বাতাসে
বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ
আমার বাড়ি আসে ॥ (স্থায়ী অংশ)

www.pathagar.com

৪.

কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে
ফুলে পাইলা ভমরা
ময়ূর বেশেতে সাজইন রাধিকা ॥

৫.

দিবা নিশি ভাবি যারে
তারে যদি পাইনা
রঙ্গের দুনিয়া তোরে চাইনা ॥

হাসন রাজা

১.

বাওলা কে বানাইল রে
হাসন রাজারে বাওলা
কে বানাইল রে ॥

২.

সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল
না জানি কি মন্ত্র পড়ি
যাদু করিল ॥

৩.

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে
রঙ্গে রঙ্গিলা কানাই
ও কানাই খেইড় খেলাও কেনে ॥

৪.

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে
কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়ারে ॥

রাধারমণ

১.

আমি রবনা রবনা গৃহে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচেনা ॥

২.

ভ্রমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে
অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে ভ্রমর, কইও গিয়া ॥

www.pathagar.com

৩.

কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি
বুক চিড়িয়া
অন্তরে তুষেরই অনল
জ্বলে গুইয়া গুইয়া ॥

৪.

আমি কৃষ্ণ কোথা পাই গো
বল গো সখি কোন বা দেশে যাই
আমি কৃষ্ণ প্রেমের কলঙ্কিনি
নগরে বেড়াই গো ॥

দুর্বিন শাহ্

আমার অন্তরায়, আমার কলিজায়
প্রেম সেল বিন্ধিল বুকে মরি হায় হায় ॥

অন্যান্য সংগীতের মধ্যে রয়েছে—

১.

তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো
আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে।

২.

লীলাবালি লীলা বালি
বড় যুবতি সই গো
কী দিয়া সাজাইমু তোরে ॥

৩.

তুমি রহমতের নদীয়া
দয়া কর মোরে হরজত
শাজলাল আউলিয়া ॥

৪.

সুরমা নদীর তীরে আমার ঠিকানা রে
বাবা শাজলালর দেশ সিলেট ভূমি রে ॥

৫.

সোনার বান্ধাইলের নাও পিতলের গোড়া রে
ও রঙ্গের ঘোড়া দৌড়াইয়া যাও ॥

www.pathagar.com

৬.

নির্জন যমুনার জলে বসিয়া কদম্ব তলে
বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যাম রায় ॥

৭.

আমার বাড়ি যাইও তুমি আমার বুয়াইর বিয়া
লো বইনারি
কাইল বিয়ানে আইবা দুলাবাই ॥

এসব গানের কিছু কিছু ঢাকা-সিলেট রেলগাড়ি জৈন্তা/পারাবতে (চলন্ত রেল গাড়ির ভেতরে) শুনা যায়। শুধু মাত্র ডবকি বাজিয়ে ১৫-২০ বৎসরের দুটি তরুণ এই গানগুলো পরিবেশন করে। রেল গাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে পরিবেশিত এসব গান যাত্রী সাধারণকে বেশ আনন্দ দেয়। যাত্রীরা ২টাকা ৫টাকা দিলেই এরা সন্তুষ্ট থাকে।

সিলেটের বাইরের কবি কর্তৃক রচিত যেসব সংগীত সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত

১.

আমি কেমন করে পত্র লিখিরে
গ্রাম পোস্টাপিস নাই জানা
তোমার আমি হলেম অচেনা ॥

২.

আমার মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
তোমারে না পাইয়া ॥

৩.

সোনার পালঙ্কের ঘরে
লিখে রেখেছিলেম যারে
যাও পাখি বল তারে
সে যেন ভুলেনা মোরে ॥

৪.

প্রাণবন্ধু আসিতে সখি গো
সখি আর কতদিন বাকি
চাতক পাখির মতো আমি
আশায় আশায় থাকি গো ॥

৫.

এ ভরা ভাদরে অভাগীর কুটিরে
যদি তুমি আস শ্যাম কালিয়া
আমি তোমায় গান শুনাব
হারমনি বাজাইয়া ॥

www.pathagar.com

৬.

আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল গো
মরার কোকিলে ॥

এলাহি, সর্বময় প্রশংসার মালিক তুমি সুমহান
নিরানব্বই নামের নামি তুমি ইয়া রহমান এলাহি।
এলাহি, ইয়া রাহিমু, ইয়া কুদ্দুছু, তুমি ইয়া মালেক
ইয়া ছালামু , ইয়া মুমিনু, তুমি হও খালেক এলাহি।
এলাহি, ইয়া মুহাইমিনু, ইয়া আজিজু, তুমি ইয়া জাব্বার
ইয়া বারিউ, মুতাকাব্বিরুম তুমি ইয়া গাফফার এলাহি।
এলাহি, ইয়া কাহহারু, মুছাওইরু, তুমি ইয়া বাছির
ইয়া ওয়াহহাবু, ইয়া রাযযাকু, তুমি ইয়া খাবির এলাহি।
এলাহি, ইয়া ফাত্তাহু, ইয়া ক্বাবিদু, বাছিতু আলিমু
ইয়া হাফিজু, ইয়া রাফিউ, মুইযযু, আজিমু এলাহি।
এলাহি, ইয়া মুমিল্লু, ইয়া ছামিউ, তুমি হও হালিম
ইয়া হাসিবু, ইয়া আদিলু, তুমি হও কারিম এলাহি।
এলাহি, ইয়া লতিফু, ইয়া আল্যিউ, তুমি ইয়া গাফুর
ইয়া হাফিজু, ইয়া মুকিতু, কাবিরু শাকর এলাহি।
এলাহি, ইয়া মুজিবু, ইয়া জালিলু, তুমি ইয়া হাছিব
ইয়া হাকিমু, ইয়া ওয়াছিয়্যু, তুমি ইয়া ছাকিব এলাহি।
এলাহি, ইয়া ওয়াদুদ, ইয়া বা-ইছু, ইয়া হাক্কু, মাজিদ
ইয়া ওয়াক্বিল, ইয়া ক্বাব্যিউ, তুমি ইয়া শাহিদ এলাহি।
এলাহি, ইয়া ওয়ালিয়্যু, ইয়া মুবিনু, গোপন প্রকাশকারী
ইয়া হামিদু, ইয়ামু বদিয়্যু, তুমি বেষ্টনকারী এলাহি।
এলাহি, হাইয়্যুল কাউয়্যুম, তুমি তুমি জীবনদাতা
ইয়া ওয়াজিদু, ইয়া সাজিদু, তুমি মরণদাতা এলাহি।
এলাহি, ইয়া ওয়াহিদু, ইয়া আহাদু, তুমি ইয়া কাদির
ইয়া ছামাদু, মুকতাদিরু, বাতিনু জাহির এলাহি।
এলাহি, ইয়া মুকাদিবদস, তুমি আল্লা আউয়াল ও আখির
সকল কিছুর মালিক তুমি তুমি মূয়াখখির এলাহি।
এলাহি, সর্ব- উচ্চ মহান তুমি সকল সৃষ্টিকারী
ইয়া মুস্তাকিম, ইয়া তাওয়াবু তওবা গ্রহণকারী এলাহি।
এলাহি, ইয়া মুকছিতু, ইয়া রাউফু, গাফুর ক্ষমাবান
ইয়া জামিউ, ইয়া গানিয়্যু, মুনিম দানবান এলাহি।
এলাহি, ইয়া দোয়াররু, ইয়া নাফিউ, মোনাফা দানকারী
ইয়া নুরু, ইয়া মানিয়্যু, তুমি বাধা প্রদানকারী এলাহি।
এলাহি, ইয়া হাদিয়্যু, ইয়া কাবিয়্যু, ইয়া বাদিউ তুমি

www.pathagar.com

তোমার ভয়ে লৌহ কলামে কাঁপে জগতভূমি এলাহি।
এলাহি, ইয়া মালিকাল মূলক, তুমি মহান অধিপতি
ওয়ারিছু, রাশিদু, ছবরু, তুমি ভুবনপতি এলাহি।
এলাহি, নিরানব্বই নাম ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম
জালাল খান ইউসুফি তোমার গোনাহগার গোলাম এলাহি।
এলাহী, নিরানব্বই নাম ধরিয়া ডাকি যে তোমরে
করজোড়ে ফানামাঙ্গি তোমারো দরবারে এলাহি।
এলাহি, দরুদ ও জিগিরের সওয়াব সোনার মদিনায়
পৌছাইয়া দাও দয়াল নবিজীর রওজায় এলাহি।
এলাহি, আদম থেকে বিশ্বনবি নবি রাসুলগণ
ওলি- আব্দাল, গাউছ-কুতুব যত আলেমগণ এলাহি।
এলাহি, যত মোমেন বিদায় নিয়া শুয়েছেন কবরে
জিগিরের সওয়াব পৌছায় তাদের রুহের পরে এলাহি।
এলাহি, খাছ করিয়া সওয়াব পৌঁছাও কবরে আব্বার
নানা-নানী-শ্বশুর এবং দাদি ও দাদার এলাহি।
এলাহি, খেশ-কুটুম-আত্মীয়-এগনা পাড়া - পড়শিদের
ক্ষমা কর মাবুদ আল্লা নবিজীর খাতিরে এলাহি।
এলাহি, কবরবাসী সবার রুহে শান্তি কর দান
বেহেস্তের কুঠুরি বানাও বাবার কবরখানা এলাহি।
এলাহি, রাব্বির হামাহুমা কাম রাব্বায়ানী ছাগিয়া (৩)

রাব্বানা, জালমনা, আনফুছানা ওয়াইললাম তাগফিরলানা ওয়া
তার হামনা লানা কুনাননা মিনাল খাছিরিন। রাব্বি জাআলনি
মকিমাচ্ছালাতি ওয়ামিনযুবিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্কাব্বাল দুয়া।
রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাও ওয়া ছাব্বিত আকদামানা
ওয়ান ছুরনা আলাল কাউমিল কাফিরিন। লাইলাহা-ইল্লা-আনতা
সুবাহানাকা ইন্নিকুনতু মিনায যালিমিনি।

এলাহি, নিজের উপর কত জুলুম করছি না বুঝিয়া
এাফ করিয়া নাহি দিলে যাবো ধ্বংস হইয়া এলাহি।
এলাহি, আমাকে আর আমার আছে যত বংশধর
নামাজীদের দলের সাথী আমাদের কর এলাহি।
এলাহি, নেক বান্দা আছে যত তামাম জাহানে
আমারে মাফ কর তুমি তাদের নামের গুণে এলাহি।
এলাহি, শায়খুল হাদিস হিফজে কোরআন শেখে গহরপুরী
নুরুদ্দিন আহমদ সাহেব নেকের অধিকারী এলাহি।
এলাহি, কারিউল কোরআন শাহা ফুলতলীর হুজুরে
আঃ লতিফ নামের গুনে মাফ কর আমারে এলাহি।
এলাহি, নবি-রাসুল -গাউছ-কুতুব-আউলিয়ার খাতিরে

www.pathagar.com

ওলামা মাশায়েখগেণর নামেরো খাতিরে এলাহি।
এলাহি, এক ওয়াক্ত নামায কাযা হোক তা চাহিনা
দোযখের আগুনের জ্বালা সহিতে পারব না এলাহি।
এলাহি, যার প্রেমে মজেছ তুমি নিজে মালেক সাই
তাহরো প্রেমের দিওয়ানা আমি হতে চাই এলাহি।
এলাহি, আমারে করিয়া দাও ঐ নামের দিওয়ানা
দিবা-নিশি থাকি যেন ঐ নামের বেফানা এলাহি।
এলাহি, যার খাতিরে আকাশ, পাতাল, বিশ্ব ভূমন্ডল
আমারে করিয়া রাখ ঐ নামের পাগল এলাহি।
এলাহি, তোমারো হাবিব নবী মোহাম্মদ আমিন
যার খাতিরে পরিপূর্ণ মোহাম্মদী দীন এলাহি।
এলাহি, যে নবীজির প্রেমে তুমি নিজে আসেক হইয়া
লা আলাহার সাথে মোহাম্মদ দিয়েছ মিশাইয়া এলাহি।
এলাহি, সেই নামের খাতিরে আমায় করো পূর্নবান
করজোড়ে ফানা চাহি গোনাহগার নাদান এলাহি।
এলাহি, হাজার সালাম, হাজার দরুদ পাঠাও মদিনায়
দরূদ ও সালাম ভেজি নবীজির রওজায় এলাহি।
এলাহি, রাব্বি আন্নি মাচ আছা নিয়াদ দুররো ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন
রাব্বি আন্নি মাহলুবুন ফানতাসির। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহে
আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব। রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা
জুররিয়্যাতান তাইয়্যিবাহ্ ইন্নাকা সামিউদ দু'আ। হাসবুনাল।রাহ ওয়া
নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাছির (৩ বার)
এলাহি, তোমার জমিনে আমি তোমার নাম রাখিতে
অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে চাহি যে মরিতে এলাহি।
এলাহি, তোমার জমিনে যারা তোমর দীন প্রচারে
বিবি বাচ্চা রেখে এসে অস্ত্র হাতে ধরে এলাহি।
এলাহি, তাদেরো বাহুতে তুমি শক্তি করো দান
ঈমানেরই নূরে তাদের কারো বলিয়ান এলাহি।
এলাহি, বিবি বাচ্চাদের তুমি হেফাজত করিও
ভালো-খারাপ সকল কিছু আপনি দেখিও এলাহি।
এলাহি, দাজ্জালের চেলা-চামুন্ডা হইয়াছে বাহির
আমারে ভাইয়ের দেশে ওরা হইয়াছে হাজির এলাহি।
এলাহি, কত চেষ্টা করিতেছে লুটিতে ঈমান
ঈমানের বলে আমায় করো বলিয়ান এলাহি।
এলাহি, ফাতিরাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি আনতা ওয়ালিয়্যি ফিদদুনইয়া
ওয়াল আখিরাহ, তাওয়াফফানী মুছলিমাও ওয়া আল হিক্বনি বিচ্ছালিহিন।
এলাহি, যুদ্ধেরো ময়দানে তোমার কুদরতী করিয়া

www.pathagar.com

ইহুদী নাসারাদেরে দাও পিছে হটাইয়া এলাহি।
এলাহি, দুনিয়াতে আছে যত মুমিন মুসলমান
মজবুদ করিয়া দাও সকলে ঈমান এলাহি।
এলাহি, ঈমানের বলে মোদের বলিয়ান করিয়া
ইহুদী নাসারার উপর দাও জয়ী করিয়া এলাহী।
এলাহি, ইরাকে আর ফিলিস্তানে মুসলমান মারিয়া
তোমারো গোলামের রক্তে জমিন দেয় ভাসাইয়া এলাহি।
এলাহি, গায়েবি মদদ যোগাও মোজাহিদ ভাইদেরে
ঈমানের বলে বলিয়ান করে দাও তাদেরে এলাহি।
এলাহি, আমারে করে দাও তুমি মর্দে মুজাহিদ
তোমার দীন কায়েমের তরে হতে চাই শহীদ এলাহি।
এলাহি, শুয়ে আছেন দীনের নবী সোনার মদিনায়
জিয়ারত নছিব করাইও নবীজির রওজায় এলাহি।
এলাহি, বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করার তওফিক কর দান
নাজাতের ওছিলা কর পবিত্র কোরআন এলাহি।
এলাহি, আল-কোরআনের আলোয় অন্তর আলোকিত করে
আমারে ডুবাইয়া রাখ ইলিমের সাগরে এলাহি।
এলাহি, জালাল খান ইউসুফী তোমার গোনাহগার নাদান
রোজ হাসরের ময়দানেতে করিও আহছান এলাহি।
এলাহি, রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতও ওয়াফিল আখিরাতি
হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার। আল্লাহুম্মা মাগফিরলি
খাতিয়াতি ওয়া মাহলি ওয়া ইসরাফি, ফি আমরি ওয়ামা আনতা
আ'লামুবিহি মিননি আল্লাহুমা মাগফিরলি জিদদি ওয়া হামলি ওয়া
আত্বাই ওয়া আমদি ওয়াকুলরু জালিকা ইনদি আল্লাহুমাগ ফিরলি মা
ক্বাদদমাতু ওয়ামা আমখারতু ওয়ামা আছরারতু ওমা আ'লনতু
ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিননি আনতাল মুক্বাদাদিসু ওয়া
আনতাল মুআখাখিরু ওয়াআনতা আলা কুল্লি শাইন ক্বদির।
বাহাক্কে কালেমায়ে তায়্যিবা লা-ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মদুর রাসূল
উল্লা, আমিন-আমিন-আমিন ইয়া রাব্বাল আলমিন।

ওয়াজের আগে, মিলাদের পরে এবং কোন কোন ওরসে সংগীতানুষ্ঠানের প্রথম দিকে নিম্নোক্ত ধরনের সংগীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

www.pathagar.com

বিরহী কালা মিয়ার লোকগান

বিচার গান

১.

ওকারণে তুলসির মূলে জল ঢালিলাম,
তারে দেখা না পাইলাম, শুধু ভাল বাসিলাম(২)॥
আগে যদি জান্তাম আমি, ছাড়িয়া যাইবায় তুমি-(২)
ভালবাসি অন্তর যামি, কত গান গাইলাম॥
পিরিত করা প্রাণে মরা, (যেমন) জাতি শাপের লেজে ধরা-(২)
না বুঝিয়া বন্দের সনে, প্রেম বাড়াইলাম॥
(বিরহী) কালা মিয়া হইল সারা, প্রাণ বন্দের পিরিতের মরা।-(২)
দেখা দিও অধর ধরা, এই আশায় রইলাম॥

২. বিচার গান

ও মন করলে না বিচার রঙ্গরশে দিন যায় তোমার
কি করিতে আসলে ভবে ভাবলে না একবার। ওমন॥
মনরে...
ষোল আনা পুঁজি লইয়া আইলে এই ভবেতে,
সব গোয়াইয়া হইলে দেনা কামিনীর ঘাটেতে।
পাইয়া তোমায় ছয় ডাকাতে, করিল সংহার॥ ঐ
মনরে...
ছয় ডাকাতকে বস কর নামের মন্ত্র দিয়া,
ব্যাপার করিতে পারবে মহাজন বুঝাইয়া।
তাছাউপ লও শিখিয়া, মুর্শিদের বাজার॥ ঐ
মনরে...
কয় বিরহী কালা মিয়া হও হুশিয়ার
কামিল পীরের কাছে গিয়া বুঝে লও কারবার।
কিনিবে মাল সব খরিদ্দার, হবে না লোজার।

৩. বিচার গান

হৃদ পিঞ্জিরার পাখি আমার , করে লুকোচুরিরে
হায়রে আমার হৃদপিঞ্জিরার পাখি
ও মন পাখিরে , কোন দিন যে উড়িয়া যাবে ছাড়ি॥
দমে আসো দমে যাও দমেই ঘোরাঘোরি
কেন এসব রংগ করো দুই দিনের মুসাফিরিরে।
এক দমের ভরসা নাই যে দমের আশা করি
বৃথা কেবল আমার আমার করলাম জনম ভরিরে॥

www.pathagar.com

ঘরেবাদি ছয় চোরায় করে ছলচাতুরী
কুমতিরে সঙ্গে লইয়া দেখায় বাহাদুরিরে॥
সুমতিরে বাধ্যকর ওরে মন ব্যাপারী
সাত অইয়া ছয় এর তখন লাগবে দৌড়া দৌড়িরে॥
কয় বিরহী কালা মিয়া মুর্শিদ হও কাণ্ডারী
সারাক্ষণ হাজার ছয়শ দমের করছি তাবেদারিরে॥

৪. বিচার গান

দুনিয়ায় কেহ কার নয়। (২)
নিজের বিচার নিজে করো বলছেন দয়াময়॥
আর কেউ নাই তোর সঙ্গের সাথী
জানিও নিশ্চয়॥
আপন আপন যারে ভাব সেত দুরে রয়-(২)
কেউ হবে না সঙ্গের সঙ্গী মনে রাইখ ভয়॥
আসছ একা যাব এক করে লও সঞ্চয়।
মনের ময়লা দূর করিয়া থাক সব সময়॥
মুর্শিদ নাম যার হৃদে গাঁথা তার নাই পরাজয়।
কলবে করিলে জিকির ভয় নাই সংকটময়।
বিরহী এই কালা মিয়া কাঁন্দে সব সময়।
ছরকাত ময়ূত ফুলছিরাতে পারেনি আশ্রয় ॥

৫. বিচার গান

খাচার পাখি উড়ে যাবে জানি না কোন দিন রে
পাখি যেদিন যাবে উড়ে মানবে না জামিন॥ খাচার
দুগ্ধ কলা মাখন ছানা খাওয়ইলাম কত খানারে
ওসে আমার বুলি বুলিল না সে বড় কঠিন॥ ঐ
পাখির নামটি মনমনোরা, ধরতে গেলে দেয়না ধরারে
ওসে আমায় করিয়া সারা হবে রে বিলীন । ঐ
এই পাখিরে ধরার আসে ঘুরি কত দেশ বিদেশে রে।
(বিরহী) কালা মিয়ার শেষ নিশ্বাসে , পাইবেরে স্বাধীন ॥

বাবা শিংগা শাহর স্মরণে গান

বাবা শিংগা করিতেছি তোমার প্রশংসা
তোমারই নামের গুণে গুচল মোর দূরদশা। করিতেছি॥
কত দেশবিদেশ হইতে মানুষ আসে তোমার রওজায়,

www.pathagar.com

তোমার রওজার ধূলি যে মাখিল ব্যাধি মুক্ত হয়ে যায়।
(তোমার) বদনার পানি যে খাইল, পুরে তার মনের আশা।
বিপদে পড়িয়া যদি কেহ করে মুনাজাত,
শিরনি মানিয়া বাবা তোমার ঐ যে পাক দরগাত।
ফিরাইয়া দাওনা দুই হাত, হয়ে যায় তার মিমাংশা॥
কয় বিরহী কালা মিয়া পাইলাম তোমার পরিচয়,
তোমার নামের গুণে কত বিপদ থেকে হইলাম জয়।
তাইতো বুঝলাম তুমি সদয়, আমি হইলাম বেদিশা॥

পার ঘাটা তত্ত্ব

আমি কেমনে যাইতাম বাইয়ারে ভব নদী
সব ছাড়িয়া হইলাম এখন মহা অপরাধী রে॥
হইলাম আমি সর্বহারা, ভাঙ্‌ড়া কপাল লয় না জুড়ারে
আমার আপন ছিল যারা, তারাই হইল বাদীরে
ঋব নদীর ঢেউয়ের তালে কুম্ভীর ভাসে দলে দেলে রে
আমার বুক ভেসে যায় নয়ন জলে, ডুবে মরি যদিরে
ভব সাগরে উঠল তুফান কাঁদিতেছে আমার পরানরে
কে আমারে করবে আছান আমি কান্দি নিরবধিরে ॥
কালা মিয়া কান্দে বসে, ভব নদীর তীরে এসেরে
মরি এখন হায় হুতাশে (কর্মে) কি লিখিছে বিধিরে॥

১. মারফতি গান

মানুষ সাধন করে কারে মানুষ সাধন করে কারে
যে বিন্দুতে পয়দা হলে তারে যদি চিনলি না রে॥ সাধন
বর্তমানে সাধক যারা চলত চায় না নারী ছাড়া
ডুবায় মহাজনের ভরা গিয়া কাম সাগরে
বলে এইটা চন্দ্র সাধন ভেদ বিচার না করে
নীতি ছাড়া চলে তারা কোরানকে অমান্য করে।
হারাইয়া নিষ্ঠারতি মেয়ের পদে দেয়রে ভক্তি
বলে আমার দাও গো মুক্তি থাকিতে সংসারে।
মেয়ে যদি মুক্তি দিতে পারিত আর কারে
তবে কেন হযরত আদম আসিত বেহেস্ত ছেড়ে॥
কালা মিয়া ভক্তি হীনা মায়া সাধন করতে চায়না
আমায় আমি চিনিলাম না ভক্তি দিতাম কারে।
ডুবলে বেলা ভাংবে খেলা ঠেকলে অন্দকারে।
(মুর্শিদ) কফিল মিয়া পদছায়া দিও তোমার কাঙ্গালেরে।
সাধন করে॥

www.pathagar.com

২. মারফতি গান

ফানাফিলাহ্ দেশে যদি যাবি, মানুষ হবি
ফানাফিলাহ্ দেশে যদি যাবি।
ফানাফিলাহ্ হইলে মশগুল
দেখা দিবেন দ্বিনের রাসুল বাজবে ঢুল তোমারই কলবি।
করবে মন আলা আলা গলেতে লও নামের মালা,
গুছবে জ্বালা উঠিলে রবি। মানুষ
ধর মন মানুষের সঙ্গ পাক তোমর হবে অঙ্গ
করবে রঙ্গ হাঁতে রাখলে চাবি।
দুনিয়াটা যাহার গড়া, পাইলে তাহারীরে ধরা
আমার দুনিয়াতে থাকবি ॥ মানুষ

কালা মিয়া কেঁদে বলে দয়াল নবীর চরণ তলে
সংকট কালে দেখি যে তোমার ছবি॥
তোমারে জানিয়া আপন, দিয়েছি মোর জীবন যৌবন
দেখব স্বপন (যেদিন) ছরকাত ঘঠিবি॥

বিচ্ছেদি

মাইরা প্রেমের বান, আমার কাইরা নিলে প্রাণ
কোথায় গেলে পাইব তোমার গো,
পরিচয় দাও সত্য করে॥

তোমার মুখের হাঁসি, কত ভাল বাসি,
আমি পিপাশি তোমারই তরে(২)
(তুমি) হইয়া আমার, কাছে বস না একবার
হতভাগা বলি বিনয় করেগো॥ পরিচয়

শ্যামল বরণ তোমার রূপেরই কিরণ,
পাগল করিলে মন, কি যাদু করে(২)
দেখে দুই অধর উঠল প্রেম জর,
(ওতর) যৌবন ফুলে বসতে দাও আমারে গো॥

(বিরহী) কালা মিয়ায় কয়, যদি তোমার মনে লয়
হইয় সদয়, আমার উপরে(২)
দিয়া প্রেম আলিঙ্গন জ্বালা করগো বারণ
সারাজীবন থাকব তোমার ধারেগো ॥

www.pathagar.com

হাকিম হেলালের লোকগান

ও রূপসি মাইয়া,আমার কথা ভুলে গেছ কার প্রেমে মজিয়া রে
আসার পথে চাইয়া চাইয়া দিন যাইতেছে গইয়া রে
প্রাণে আর মানে না ধৈর্য খবর দেও আনিয়া
যে রূপসি মন নিয়াছে কোথায় পাই খুঁজিয়া ॥
আসবে বলে আসায় রইলাম পন্থপানে চাইয়া
বকুল ফুলের মালা রাখছি যতন করিয়া ॥
জীবন যৌবন সকল দিছি তোর প্রেমে মজিয়া
হেলাল বলে প্রাণ তেজিব দেখা দিলে আইয়া ॥

খেদ
গান গাইলাম আর গান লেখিলাম
গানের ভুবনে আমি কী পাইলাম,
বাউল গানে আমার সব হারাইলাম ॥

মনের যত যন্ত্রণা, কারো কাছে বলিনা
কলম হাতে নিয়ে খাতায় লেখিলাম
দুঃখ বলার জায়গা নাই, সংগীতে তাই লিখে যাই
দু দিনের দুনিয়াতে কী করিলাম ॥

দুঃখ মনে আসিলে, গান গাই নিরলে
গানের সুরে তোমায় ডেকে প্রাণ জুরাইলাম
এ কারণে আমি দোষী, আমার উপরে কেউ নয় খুশি
তুমি তো জান আমি কারে ডাকিলাম ॥

হইলাম না সংসারি, রই সদায় সং ছারি
গানের সুরে দুখের বাণী, তোমায় শুনাইলাম
এক দিন চলে যাবে হেলাল খান
পৃথিবীতে থাকবে গান,
জীবনের কিছু স্মতি লেখিয়া গেলাম ॥

৩.
বৃক্ষবন্দনা
বাড়ি ঘরের আশে পাশে বেশি করে গাছ লাগান
ওষধি গাছ লাগাই সুখে দিন কাটান
গাছ চিনে না ধর্ম কর্ম হিন্দু মুসলিম কে বা
কান্তি দিতে চায় সবাইকে করে শুধু সেবা
আম পাতা জাম পাতা বেল পাতা ফুলে
বড় বড় রোগ সারাইত আমরা গেছি ভুলে
হিন্দু মুসলিম সবে মিলে

www.pathagar.com

গাছ লাগাইয়া দেশ বাঁচান ॥
আমলকি হরিতকি বহেরা লাগাও মেহগনি
বহু মূত্রের মহা ঔষধ বইপুস্তকে শুনি
ত্রিফলার জল খাইলো যিনি
শান্তি তাহার মনও প্রাণ ॥
অর্জুন লাগাও নিম লাগাও আর লাগাও লিচু
কাঠাল গাছের কথা আমি বলতে চাইনা কিছু
ল প্রেসারকে করে উঁচু
রোগটা করে সমাধান ॥
পরিবেশ আর প্রাণ বাঁচান
গাছ লাগাইয়া বাইরে সুখে দিন কাটান
বারির আঙ্গিনায় ভাইরে ভেষজ গাছ লাগান ॥
যে বাড়িতে নিম গাছ আছে ,
বসন্ত রোগ নাই আশে পাশে
লাগাইতে হয় দক্ষিণ পাশে রাখিও স্মরণ ॥
যারা আছেন হার্টের রোগী
অর্জুন খান ভাই কাজের লাগি
বহু মূত্র হইলে আবার জামের বিচি খান ॥
আমলকি হরিতকি বহেরা
পেটের কাজ করে তারা
এসব গাছ খুঁজ করিলে মিলে না এখন
আমি হাকীম হেলাল খান
বাবা হাকীম ইউসুফ খান
সর্বময় গাইয়া বেড়াই গাছ গাছালির গান ॥

অন্নদা রঞ্জন দাসের লোক গান

১.

দয়াময় দয়াল,আমি তোর কাঙ্গাল
দেখা দেও নইলে বাচিনা পরাণে
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অশ্রুধারা বয় দুই নয়নে ॥
আসিবারকালে কথা দিয়েছিলে
দেখা দিবে এই ভুবনে।
মায়াবী ছলনায় ফেলিয়া আমায়
লুকাইয়া রইলে তুমি অতি গোপনে।
তুমি এত দয়াবান দিয়েছ প্রমাণ
দশ মাস দশ দিন গর্ভে ছিলাম যখনে।
আমি না আসিতে দুগ্ধ মায়ের স্তনেতে
আনিয়া রাখিলে দয়াল অতি সন্ধ্যানে ॥

www.pathagar.com

ভূমিষ্ট হইতে দুগ্ধ দিলে মুখেতে
বাঁচাইয়া রাখিলে দয়াল তব নিজ গুণে।
এত দয়া আছে যার অন্নদা কয় কী ভয় তার
যারে পাইতেছি আমরা জনম ও মরণে।

২.

ওহে প্রভু নিরঞ্জন নাম তোমার করি স্মরণ
প্রথমে ভক্তি জানাই তোমার চরণে ॥
তোমারই কৃপা বলে আসিলাম এ ভূমণ্ডলে
তুমি বাঁচাও তুমি মার এই ভুবনে ॥

মাতা পিতা জন্মদাতা তাদের পদে নোয়াই মাথা
ঋণ শোধিতে নাই ক্ষমতা থাকতে জীবনে।
যার ঔরসে জন্ম নিলাম শতকোটি প্রণাম দিলাম
কৃপা মা জননী আমি অধীনে ॥
শিক্ষাগুরু হয় যে জন,বিদ্যা করিলাম উপার্জন
বন্দি করি তিনার চরণ মন প্রাণে ॥
গান বাদ্যের ওস্তাদ যে জন নত শিরে করি বন্ধন
যাহার উছিলায় আসলাম এ বাউল গানে ॥

তেত্রিশ কোটি দেবগণ এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর
আমি অধম হইয়া কাতর বন্দি সব জনে ॥
আছেন যত বিদ্যামান,ছেলে বৃদ্ধা নওজোয়ান
সবের কাছে আমি অজ্ঞান জানাই এখনে।
অন্নদা কয় অভাজন ত্রবটি করিবেন মার্জন
আদাব নমস্কার জানাই সভা সদনে ॥

৩.

তোমারে দেখিবার মনে বাসনা
দেখা দাও নইলে বাচিনা।
তুমি আমার আমি তোমার দুইজনে হই একজনা ॥

কত আশা ছিল মনে দেখা হবে তোমার সনে
বুঝলাম আমি এ জীবনে তোমারে আর পাবনারে পাবনা ॥

আমার মাঝে থাক তুমি দেখা পাইনা কেন আমি
তুমি প্রভু অন্তর্যামী, জানি না কি আর জান নারে জান না।
কী নামেতে তোমারে ডাকি কি নামেতে তুমি সুখি
সেই নাম আমার হৃদে রাখি জীবনে ভুলব না ॥
মানবলীলা সাঙ্গ হলো বুঝি দেখা না হইলো
অন্নদা কয় খুলে বল, দেখা পাব কি আর পাব না, পাব না ॥

www.pathagar.com

৪.

প্রাণ সখি গো আমার নাকি নতুন বিয়া হবে
আত্মীয় কুটুম ভাই বিরাদব চোখের জলে ভাসিবে ॥

আরি পরি পাড়া পড়শি বিনা দাওয়াতে আসিবে
আতর গোলাপ গরম জলে গোসলও করাবে গো ॥

কাঁচা বাঁশের পালকি দিয়া নতুন শাড়ি পরাবে
চারিজনা কাঁদে করে শশ্মান ঘাটে নিবে গো ॥

সবে মিলে বিয়ের কার্য সমাধা করিবে
ফিরিয়া আসিবে সকল চির বিদায় দিবে গো ॥

অন্নদা কয় আর আশা নাই ঐ ভবে আসিবে
দয়াল নামটি কর স্মরণ পথের সম্বল হবে গো ॥

৫.

সখি গো অঙ্গ শুকাইল পিরিতে
গেল কালা দিয়া জ্বালা, দুঃখ রইল বুকেতে ॥

কী আগুন জ্বালাইল চিত্তে পারি না অনল নিবাইতে গো
সখি তোরা বল তারে ঔষধ নাই কি আর জগতে ॥
এই ভাব যদি মনে ছিল কেন আমায় কথা দিল গো
সখি একবার খুলে বল, আসবেনি শ্যাম কুঞ্জেতে ॥

মথুরা কি এত দূরে কেউ কি যায় না ধারে গো
সখি একবার আন তারে দেহে প্রাণ থাকিতে ॥

থাকতে যদি নাই পাই মরলে আমার আশা নাই গো
অন্নদা কয় দেখতে চাই দুটি নয়ন থাকিতে ॥

৬.

মেয়ে বড় অমূল্য ধন কেউ বুঝে কেউ বুঝে না
মেয়ের কাছে প্রেমের ভাণ্ডার দিয়াছে সাই রাব্বানা ॥
দাদা আদম সৃষ্টি করে বেহেস্তে প্রথম দিল
সঙ্গী ছাড়া একা আদম চোখের জলে ভাসিল॥
তাইতো প্রথম মেয়ে আসল হাওয়া নামে একজন ॥

জোড়া জোড়া সন্তানাদি হাওয়ার গর্ভে জন্মিল
মানব জাতি এ সংসারে প্রথম খোদায় পাঠাইল
নারী পুরুষ সব আসিল সকলের আছে জানা ॥

www.pathagar.com

মায়ের মমতা দিয়া সংসার বাধা রইল
পীর পেগাম্বর যোগী ঋণ পরিশোধ কে করিল
অন্নদা কয় শুনছি না ॥

৭.

মন আমার জংলী হাতি মানে না মাহুতের মানা
শিকল দিয়া বাঁধলেও তারে টান দিলে টান কুলায় না ॥

যথা ইচ্ছা তথা যায় দিবা নিশি ঘুরে বেড়ায়
ডাক দিলে সে চায় ফিরে আমার সাথে কথা কয় না ॥

যখন হাতি বেড়ি ছিড়ে পাহাড়াদার পালায় ডরে
ছয় ভূতে পাইয়াছে তারে সদায় দেয় কুমন্ত্রণা ॥

সাধু গুরু দেখলে পরে সেই হাতি দৌড়াইয়া মারে
তন্ত্র মন্ত্র যাদু বিদ্যা তাবিজ কবজ মানে না ॥

যদি তারে ধরতে চাও সৎ গুরুর নিকটে যাওরে
তারে ভক্তি ভাবে বেধে নাও কর গুরু উপাসনা ॥

অন্নদা কয় মনরে ফাজি করলে কত ভেলকি বাজি
মহাজন করলে রাজি শেষের উপায় দেখি না ॥

৮.

এল বসন্ত কাল, দুঃখীনি দুঃখের কপাল
ঘটিল জঞ্জাল বন্ধু এল না
কাল আসবে বলিয়া গিয়াছিল কইয়া
তার বুঝি আর কাল আসে না ॥

অক্ষুরেরী রথে যাইয়া নন্দালয়েতে
নিমন্ত্রণ পত্র দেয় কৃষ্ণের হাতে
পাইয়া পত্রের সংবাদ ঘটাইল প্রমাদ
যজ্ঞেতে চলে আমার কেলে সোনা ॥

বলরাম সাথে উঠিল রথে
বাধিয়া তারে রাখা যায় না
কংসকে বধিতে চলে অতি রাগেতে
অভাগীর কথা তার মনে থাকে না ॥

এইতো চলে গেল কুরজাকে পাইল
শত বৎসর গেল ফিরে এল না

www.pathagar.com

যৌবনের শেষ বেলায় আসে যদি শ্যামরায়
বলতেছে অন্নদায় শান্তি পাবে না ॥

৯.

মন পাখি তুই আমার কথা শুনলে একবার
শমন জারি হবে যেই দিন কান্দা মাত্র হবে সার ॥

সময় থাকতে লও চিনিয়া যেজন তোমায় সৃষ্টি করে দিল পাঠাইয়া
তা না হলে ঠেকবে গিয়া যেদিন হবে পারাপার ॥

সময় তোমায় রেহাই দিবে না,ঠিক সময়ে নিয়া যাবে কথা মানবে না
তখন ধনে জনে কাজ দিবে না নাম সম্বলে হবে পার ॥
গণার দিন তোর ফুরাইয়া গেলে শমন জারীর নোটিশ নিয়া আসবেরে চলে ॥
অন্নদা কয় সেই কালে কেউ নাইরে আপন তোমার ॥

হরিপদের উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি সংগীত

১

কৃপাবিন্দু কর দান
গাহিতে গুণ গান
তুমি হে মহান
জগৎ হৃদয়।
আমি দীনহীন
ভজন বিহীন
তোমার অধীন
আছি সব সময় ॥
মনে রেখে আকিঞ্চন
দিয়াছি তোমায় আসন
এসহে পতিত পাবন
হয়ে সদয়।
দিয়ে নয়ন বারি
অতি যত্ন করি
ধূয়াব চরণ তোমারি
দেরি নাহি সয় ॥
হরি পদে বলে
কৃপা করে আসিলে
বসাব হৃদ মহলে
হে রসময়
পুঁজিতে শ্রীচরণ

www.pathagar.com

সদা চাহে মন
বিষাদের জীবন
হতে সুখ ময় ॥
হে দীন নাম মম
হৃদয়ে এসে হওহে উদয় ॥

২.

কৃপা কর ওহে প্রভু
আমি অধম হীন জনে।
আশা করিয়াছি মনে
দয়াময় নামটি শুনে ॥
ভব দরিয়া অকূল পাথার
আমি নাহি জানি সাঁতার।
আমায় তুমি করে হে পার
শ্রী চরণ তরণী দানে ॥

বিপদকালে কাঁদছি এবার
সঙ্গে নাই সাথী আমার।
দেখিতেছি চোখে অন্ধকার
ভবের ঐ ঝড় তুফানে ॥

হরিপদ ভাবছি পরে
ভুল করিয়া সংসারে।
সদায় ভালবেসে কুমতিরে
পূণ্য নাই সে পাপ বিনে ॥

৩.

(ওরে মন) হেলায় তুমি কাটাইলে জীবন।
আজ কাল না হয় পরশু ঘটিবে মরণ ॥
ওরে মন—
শিশু কালে ভাল ছিলে মায়ের কোলে হেসে খেলে
যৌবন কালে কু পথে চলিলে।
ভাল মন্দ না জেনে মজিলে ঋপুর প্রেমে
কুমতি তোর হইল আপন ॥
ওরে মন—
ভাণ্ডার ভরা ছিল ধনে বিকাইলে মূল্য বিনে
সাধের যৌবন ভাটি চলিল
আপন পর হইল দিনেতে আঁধার নামিল
রাহু করল সূর্য ভক্ষণ।
ওরে মন—

www.pathagar.com

হরিপদ কর্ম্ম দোষে
ভাবি এখন বেলা শেষে
কারা বাসে যাইব যখন।
ঘটিবে কত দুর্গতি
মিলিবেনা অব্যাহতি
নিবে যবে আসিয়া শমণ ॥

৪.

তোমার লীলা বুঝা দায়
সাজাইয়াছ এ ধরাকে কত অপূর্ব শোভায়।
যেখানে যাহা সাজে তা-দিয়েছ সে জায়গায় ॥
সৃষ্টি করে এক মানুষ
জাত দিয়াছ নারী পুরুষ,
ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দোষ
গুণও আছে তায়।
কেহ রাজা কেহ প্রজা
কেহ ভিক্ষা চেয়ে খায় ॥
মানুষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বলে
উড়োজাহাজে শুন্যে চলে,
কেহ থাকে গাছের তলে
কেহ সাত তলায়।
কেহ তোমার জন্যে পাগল
খুঁজে সর্বদায় ॥
সৃষ্টি হইতে আজ অবধি
চলিতেছে নিয়মনীতি,
সবই তোমার বাধ্য অতি
যত এই ধরায়
না বুঝিয়া হরিপদের
বৃথা জনম যায় ॥

৫.

ধোকায় পড়ে বোকা হয়েছ
সংসার সাগর মাঝে
লোভে পড়ে ডুবিয়াছ ॥
আপন দেশে মুক্ত ছিলে,
ভবে এসে দায় ঠেকিলে।
পড়ে ঋপুর কূট চালে
বেলা তুমি কাটাইয়াছ ॥
ভাই বন্ধু পরিবার,

www.pathagar.com

যন্ত্রণাময় এই সংসার।
বল তুমি সবই আমার
তোমার কি তুমি আছ ॥
ভব দরিয়া দিতে পাড়ি
হয়ে গেছে অনেক দেরি।
শমণ এসেছে খোঁজে বাড়ি
হরিপদ ঠেকিয়াছ ॥

৬.

কেন মন এ সংসারে
কিসের জন্য আসিয়াছ
মায়া রশি নীজ গলে
আপন সাধে বাঁধিয়াছ
মোহেতে রয়েছ ভোলা,
ডুবে যাচ্ছে যৌবন ভেলা।
এসেছে বার্ধ্যক্য জ্বালা
সন্ধ্যা বেলা পথ চলেছ ॥
পণ ছিল আসার কালে,
ভবে এসে সব ভুলিলে।
সার্থপর তুই সাজিলে,
আপন পর ভাবিয়াছ ॥
কুমতির সনে পিরীত,
কে তোমার হবে সুহৃদ।
না বুঝিয়া নীতি হীত,
হরি পদ কয় ঠেকিয়াছ ॥

৭.

মন আমার অবুজ ময়না ঘরে রয়না।
কত করে বুঝাই তারে
আমার কথা সে শুনেনা ॥
সদায় আমায় দিয়ে ফাঁকি
বন জঙ্গলে মারে লুকি।
কাকের রবে ডাকা ডাকি
ময়নার বুলি সে বুলেনা ॥
সেজন আমার প্রিয় পাখি
বস মানায়ে কেমনে রাখি।
তাঁহার জন্য ঝরে আঁখি
সে তো ফাঁকি ছাড়িলনা ॥

www.pathagar.com

হইতাম আমি চিরসুখি
ভাল বাসলে প্রাণ পাখি।
দুর হইত আমার দুর্গতি
সুখে থাকতাম দুই জনা ॥
হরিপদের বনের পাখি
জন্মের মত দিবে ফাঁকি।
যতই কর কান্না কাটি
ফিরে আর আসিবেনা ॥

৮.

মাটির ঘরে আছে বন্দি
অবুঝ ময়না আমার।
সদায় চাহে উড়ে যাইতে
ভাঙ্গিয়া ঘরের দ্বার ॥
এত ভাল বাসলাম তারে
সে শুধু ছলনা করে।
স্বার্থপর এই পাখিটারে
কী দিয়ে ভুলাব আর ॥
খাওয়াইলাম উদর পুরে
স্বযত্নে রেখে ঘরে।
যাবে যখন এঘর ছেড়ে
উচিৎ কি হবে তার ॥
হরিপদ কয় বনের পাখি
সবারে দিবে ফাঁকি।
ঘর ছাড়িলে দিবে লুকি
মিলিবেনা খুঁজ তাঁহার ॥

৯.

মন আমার পাগলা ঘোড়া হয়না খাড়া
দিবা নিশি ঘুরে বেড়ায়।
বুঝাইলে বুঝ মানেনা
তিলেক পরে ভুলিয়া যায় ॥
পারলাম না বসে আনিতে
সদায় চলে ভ্রান্ত পথে।
কামিনীর কাম রসেতে
মজে থাকতে চাহে সদায় ॥
হাওয়ার মাঝে দিয়া ভর
ঘুরে দেশ দেশান্তর ॥
দূর হতে দূর দূরান্তর
চলে সে আপন ইচ্ছায় ॥

www.pathagar.com

হরিপদের মন ঘোড়া
মুক্ত সদায় লাগাম ছাড়া ॥
বন্ধ হবে সে দিন দৌড়া
পাইলে কালে শেষ বেলায় ॥

১০.

আচানক এক ঘটনা না দেখলেকে বিশ্বাস করে
বেঙ্গি গাল ফুলাইয়া সাপ ধরিয়া
ইচ্ছামত আহার করে ॥
সর্প দেখলে পানি পড়ে
আহার লোভে ধীরে ধীরে জিব্বা নাড়ে।
বেঙ্গির সাহস দেখে সর্প বেটা
ক্রোধে যায়রে, তাঁহার ধারে ॥

সে মন্ত্র ছাড়া হয় সাপুড়ে
কাম ডোরে কৌশল করে সাপকে ধরে।
বেঙ্গি অহরহ ঘুরে ফিরে
সদায় থাকে কাম নগরে ॥
হরিপদ কয় খেলা করে
সাপে বেঙ্গে একত্রেতে আপন ঘরে।
শক্ত করে বাঁধ তুমি
বীজমন্ত্রে দুজনারে ॥

১১.

আসলে শ্যামরায় দিবনা বিদায়
প্রেম ডোরে বেঁধে তারে রাখিব হিঁয়ায় ॥

প্রেম কুটিরে শুয়াইব প্রেমের বিছানায়।
প্রেম খেলা খেলাইব মিলে দুজনায় ॥

প্রেম জলে স্নান করাব প্রেমের যমুনায়।
নিজ হাতে প্রেমের বসন পরাইব গাঁয় ॥

প্রেম বারী অতি শিতল জ্বর উঠিবে তায়।
প্রেমের ঔষধ খাওয়াইয়া রাখব নিরালায় ॥

হরিপদ কয় থাকব বন্ধুর চরণ সেবায়
ছাড়িয়া দিবনা প্রাণ থাকিতে দেহায় ॥

www.pathagar.com

১২.

পাষাণে বুক বাঁধিয়াছে গো সখি নিষ্টুর কালিয়া
সুখ হলনা পিরীতি করিয়া ॥
সখি গো...
তাঁর সনে পিরীত করে কলংক রইল সংসারে
অবলারে গেল সে ছাড়িয়া
গেল জাতি কুলমান দেহে মাত্র আছে প্রাণ
শ্যাম চাঁন বঞ্চিত হইয়া ॥
সখি গো...
কালার প্রেমে যে যন্ত্রনা তোরা কেহ তা জানিস্ না
তিন গুণে তিন দিকে যায় লইয়া
কৃষ্ণ নামে প্রাণে টানে নয়ন টানে রূপবানে
বাঁশি নেয় কুলমান হরিয়া ॥
সখি গো...
কুল হারাইয়া কলংকিনী লোকের মন্দ সদায় শুনি
গুন মনি না আসল ফিরিয়া
হরিপদ ভেবে মরে মন নিয়াছে সঙ্গে করে
প্রেম ডুরে রেখেছে বাঁধিয়া ॥

নদীয়া চাঁদ দাস রচিত সংগীত

আত্মতত্ত্ব

১.

একবার ভেবে দেখলে না মন
কোথায় তোমার ঠিকানা,
যেখানেতে মনরে তোমার
ভাবছ আস্তানা
এটা একটা সরাইখানা ॥
কেহ থাকে দু-চারদিন
কেহ থাকে মাস ছয়েক,
কেহ থাকে বর্ষ কয়েক
এর বেশি কেউ থাকেনা ॥
কোথায় তুমি যাবেরে মন
সেটা রইল অজানা
একটি বারও জানতে তুমি
চেষ্টা কভু করলেনা ॥

২.

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার
দিন ফুরায়ে যায়
কার উপকার করলাম আমি
ভাবি বেদনায় ॥

www.pathagar.com

যখন আমার যৌবন ছিল
গেলাম না সে চিন্তায়
ভব জালে বন্দি হয়ে
দিন গেল বৃথায় ॥

এখন আমার ভাঙা তরী
কেমনে দেব ভব পাড়ি
নিশি রাতে ঘুম আসেনা
থাকি সে চিন্তায় ॥

৩.

ওরে আমার মন বেপারি
কেমনে করি পাকা বাড়ি
সাথে আমার যাবার তরী
এক পলকে যেতে পারি ॥
যবে আমায় দিল ভবে
সাথে দিল যাবার তরী
কবে যাব কয়দিন রব
কিছু আমি জানতে নারি ॥

নিশি রাতে ঝড় তুফানে
যবে হবে শমন জারি
পারবেনা কেউ রাখতে ধরি
যেতে হবে সব ছাড়ি।

আত্মতত্ত্ব

সকাল বিকাল জল আনিতে
নদীর ঘাটে যাই
শূন্য কলসি কাকে নিয়া
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাই ॥
কত মাঝি উজান ভাটি
নাইওরে যাইতে পাই
নাইওর যাওয়া দেখে আমার
পরান জ্বলে ছাই ॥
মায়ে বাপে বিয়া দিলা
দূর দেশে ভাই
আমারে নাইওর নিতে
তাদের মনে নাই ॥

www.pathagar.com

ওরে ও মাঝি ভাই
তোমারে শুধাই
অচিনপুরে বাপের বাড়ি
কেমনে যাইতে পাই ॥

বিচ্ছেদি

মনের দুঃখ মনেরে বন্ধু
রেখেছি সব চাপিয়া
কার কাছে বলব দুঃখ
পাইনা তোমায় খুঁজিয়া ॥
আকাশ পানে চাইলে বন্ধু
বুক যায় মোর জ্বলিয়া
তারাগণে খেলা করে
পূর্ণচন্দ্র মধ্যে নিয়া ॥
ফুলে ফুলে ভ্রমর যখন
বেড়ায় মধু খাইয়া
দু নয়নে বারি ঝড়ে
তোমারে না পাইয়া ॥
ত্বরা করে আস বন্ধু
মধু যায় শুকাইয়া
দেরি করে আসলে বন্ধু
মধু যাবে ফুরাইয়া ॥

মাতৃ সংগীত

মা মা বলে ডাকলে পরে
শান্তি পাই মা অন্তরে
বলে দে মা ছেলের আপন
আর কে আছে সংসারে ॥
আমার মনে এই বাসনা
চরণ তলে ঠাঁই দে মা
তা না হলে কাঁদব মা
ভাসব আমি নয়ন নীরে ॥
মায়ের চরণ ধূলি দিলে শিরে
দুঃখ কি আর থাকতে পারে
কৃপা করে দেমা তোর
চরণ ধূলি মম শিরে ॥

www.pathagar.com

১৩. অন্যান্য সংগীত

প্রার্থনা

ও বন্ধু থাক আমার ঘরে
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাইওনা আর দূরে।

শতকোটি আরাধনায় পাইছি তোমারে
তুমি আমার পরানের ধন থাক হৃদয়ের মাজারে।
তোমার লাগি কলংক সওয়া যায় সংসারে
আপ্তাব মিয়া প্রেমের পাগল ভুলিওনা আমারে।

আত্মতত্ত্ব

১.

আমি কী করিলাম ফুরাইয়া গেল দিন,
দিনে দিনে সোনার তনু হইল হীন
আমি কী করিলাম রে...
মনরে আসিয়া এই ভবপুরে হইয়া সুমীন
ছয় জনারি কুমন্ত্রণায় হইলাম খমিন,
আমি কী করিলাম রে...
মনরে ষোল আনার জিনিস লইয়া আসলাম ব্যবসায়ে
পুঞ্জি পাত্তি বিনাশ হইল এখন আমি ফেরারি রে
আমি কী করিলাম রে...
মনরে ফকির আপ্তাব বলে
মুর্শিদের চরণে মোরে স্থান তোমার নিজগুণে
আমি কী করিলাম রে...॥

২.

কী করিলাম ভেবে এসে তাই ভেবে ব্যাকুল
জীবনের খাতায় হিসেবের পাতায় সবই দেখি ভুল ॥
দিন কাটাইলাম রঙ্গ রসে পড়ে রইলাম ঋপুর বশে
বেলা শেষে ঠেকলাম এসে- পাইনা কোন কুল।
কী করিলাম ভবে এসে তাই ভেবে ব্যাকুল ॥
ঘুমের ঘোরে দেখলে স্বজন মনে রয়না কারো যেমন
ভবে আমার কারণ তেমন গুলক ধাঁধারই গুল।
কী করিলাম ভবে এসে তাই ভেবে ব্যাকুল।
বেলা গেলো সন্ধ্যা হলো- পুঁজি পাতা সব হারাইলো
মেঘের জলে হয় কি বলো সেই ভুলে মাশুল ॥
সে কথা ছিলো আসার বেলায় ভুলে রইলাম সংসার মায়ায়
মুরাদে কয় আবার কি হয় না জানি কোন ভুল ॥

www.pathagar.com

৩.

ও মাঝিরে নাও ভিড়াইয়া আমায় তুলে নাও
এপারে বসে কান্দি সদা-ওপারে লয়ে যাও ॥
উথাল পাথাল ঢেউ দেখিয়া
ভয়ে ওঠে প্রাণ কাঁপিয়া
এই ঝড় তুফানে দুঃখীর পালে একবার ফিরে চাও ॥
বসে ভবের সাগর তীরে
ডাকি তোমায় বিনয় করে
চোখের জলে বুক ভেসে যায় ভাটিয়াল যখন গাও।
সঙ্গের সাথী যারা ছিলো
আমায় রেখে সবাই গেলো
মুরাদে কয় কর দয়া ধরি তোমার পাও ॥
ও মাঝিরে নাও ভিরাইয়া আমায় তুলে নাও
এপার বসে কান্দি সদা ওপার লয়ে যাও ⁷

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে সিলেটের সুনাম সর্বজনীন। ২৫ টির মতো প্রতিষ্ঠান সিলেট শহরে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছে। সিলেটের জিন্দাবাজার ও চৌহাট্টায় এ প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত। চৌহাট্টায় শব্দকর ও ঋষি সম্প্রদায় কয়েক পুরুষ ধরে বংশানুক্রমিকভাবে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে আসছেন। অপরদিকে বন্দর ও জিন্দাবাজারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এ পেশার সাথে জড়িত হয়েছেন। অন্যান্য উপজেলায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থাকলেও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই অল্প।

সিলেট অঞ্চলে প্রস্তুত হওয়া বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-হারমনিয়াম, তবলা, ঢোল, বাঁশি, মৃদঙ্গ, নাল, ডপকি জিপসি প্রভৃতি।

জিন্দাবাজারের *সুরশ্রী* সিলেটের বাদ্যযন্ত্র তৈরির একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৪০ বছর ধরে তারা এ ব্যবসার সাথে জড়িত। সুরশ্রীর সত্বাধিকারি মিন্টু কাসার বৈদ্য জানান, শব্দকর সম্প্রদায়ের বাইরে তিনিই প্রথম এ ব্যবসায় আসেন। বর্তমানে এ পেশায় কম হলেও ২০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তিনি জানান, প্রায় ৪০ বছর আগে অর্থৎ স্বাধীনতার পরপরই এ ব্যবসা শুরু করেন। তখন তাঁর ভাই কামিনী বৈদ্য ও তিনি দোকানে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁর ভাই নিজস্ব দোকান দিয়েছেন। তিনি (মিন্টু বৈদ্য) তাঁর দুই ছেলে রিংকু বৈদ্যও পিংকু বৈদ্যকে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ মুহূর্তে তাঁর দোকানে ১০ জন কর্মচারি এবং তিনি ও তাঁর দুই ছেলে কাজ করেন। সুরশ্রীর তৈরি বাদ্যযন্ত্র বিশেষত হারমোনিয়ম শুধু সিলেট নয় সারা দেশে এমনকি বিদেশেও রফতানি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, অনেকেই হারমোনিয়মকে পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্র বলে মনে করেন। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যে যন্ত্রটির ব্যবহার খুবই সামান্য। আমাদের দেশেই বরং তা অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কীর্তন, কাওয়ালি, ভজন প্রভৃতি সব গানে এর ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। সুর-অঙ্গ, সুরভী সহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হারমোনিয়ম, বাঁশি, দোতারা প্রভৃতি নির্মাণ করে।

চৌহাট্টার ঋষি সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্র তৈরির ইতিহাসও দীর্ঘদিনের। সম্ভবত এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এখানে আগমন করে থাকবেন। তবে হবিগঞ্জের মাধবপুর তাদের আদি নিবাস বলে আমাদের জানিয়েছেন। এরা কয়েক পুরুষ যাবৎ এখানে চামড়া দ্বারা তৈরি হয় এমন বাদ্যযন্ত্র যেমন: তবলা, নাল, ঢোল, খোল, ডপকি প্রভৃতি এবং জুতো তৈরি করেন। মেরামতের কাজও তাদেরই করতে হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ পেশাদার তবলা বা নাল বাদক। কেউ কেউ অবশ্য পড়াশুনা শিখে অন্য কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

লোকজ বাদ্যযন্ত্র

লোকজ বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করছেন

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. গোপীনাথের উৎসব

কানাইঘাট উপজেলার ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়নের দর্জিমাটি গ্রামে রয়েছে গোপীনাথ মন্দির। এই মন্দিরে প্রতি বৎসর ষোল প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন ও উৎসব হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে কীর্ত্তনীয়া দল এখানে আনা হয়। এঁরা উৎসবে কীর্ত্তন পরিবেশন করেন।

২. মহাপ্রভু মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যের জন্ম উপলক্ষে তাঁর পৈতৃক নিবাসে সপ্তাহ ব্যাপী কীর্তন, মেলা, আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এই অনুষ্ঠানে অগমন করেন।

৩. কাঠিয়া বাবার উৎসব

সিলেট শহরের নিম্বার্ক আশ্রমে বহু বৎসর যাবৎ রামদাস কাঠিয়া বাবার তিরোধান উৎসব উপলক্ষে নূন্যতম ৩৬ প্রহর ব্যাপী নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাতদিন অবিরাম এই উৎসব চলতে থাকে বিধায় মেলাও থাকে দিনরাত। মাটি ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, খেলনা, বাঁশি এবং ছবি ও খাদ্যদ্রব্য এই মেলায় ওঠে।

৪. জলসা

জলসা অনেকটা ওয়াজ মাহফিলের মতো। এখানে ধর্মপ্রাণ ও কোরআন হাদিসে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ মানুষের মাঝে ধর্মীয় তত্ত্বকথা পরিবেশন করেন। জলাসায় বক্তা যে বিশেষ ভঙিমায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তার সঙ্গে অন্য কোনো উপস্থাপনার সাদৃশ্য নেই। যদিও ধর্মীয় তত্ত্ব উপস্থাপনের মাঝে মাঝে কীর্তনের মতো সংগীতের সুরও ব্যবহার করা হয়, তবে তা বাদ্যযন্ত্র বিহীন এবং স্বতন্ত্র। ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জলসার সুর প্রচলিত অন্যান্য গানের সুর অপেক্ষা ব্যতিক্রম। এর বর্ণনাভঙ্গি ও সুরের মধ্যে দেশজ লোকপ্রভাব যথেষ্ট।

জলসাকে কেন্দ্র করে এর আশে পাশে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে বিভিন্ন রকম পসরা নিয়ে বসে দোকানিরা। সাধারণত মুড়ি, খুড়কা, লাড়ু ছোট বাচ্চার খেলার সামগ্রী প্রভৃতি এখানে বিক্রি হয়। অধিক রাত্রে কিংবা ভোরবেলায় জলসা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দোকানদারিরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

বস্তুত জলসা একটি আরবি শব্দ। আরবি শব্দ *জালিসাতুন* থেকে এর উদ্ভব। এর অর্থ হচ্ছে-বৈঠক, সভা, সমবেত জনসংঘ, সমাগম বা সম্মিলন।

যেখানে ধর্মীয় আলোচনা বা দ্বীনের কথাবার্তা হয়, তাকে জলসা বলে। নবী করীম (সঃ) তার সাহাবীদের নিয়ে নামাজের পরে নিয়মিত এ রকম আলোচনা করতেন।

সিলেটের গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ অঞ্চলে এ জলসা একটি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মাদ্রাসা কিংবা মসজিদ কর্তৃপক্ষ এ জলসার

www.pathagar.com

আয়োজন করে থাকে। বছরে সাধারণত দু'বার এ জলসার আয়োজন করা হয়ে থাকে। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত জলসাকে এনামী জলসা এবং মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত জলসাকে বার্ষিক জলসা বলা হয়। গোয়াইনঘাট থানাধীন আঙ্গারজুর আলিম মাদ্রাসা এবং কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত জলসা অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জলসা।

এ জলসাকে কেন্দ্র করে অত্র অঞ্চলে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। জলসার পেন্ডেল বা মঞ্চ তৈরিকরার জন্য সবার বাড়ী থেকে মাদ্রাসা ছাত্ররা এবং এলাকার মানুষ মিলে বাঁশ কেটে সংগ্রহ করে। তারপর পেন্ডেল এর উপরে ও চারপাশে লাল,সবুজ,নীল কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। যার ভেতরে বসে আগত মুসল্লিরা দ্বীনের আলোচনা শোনেন।

এ ধরনের আলোচনা সাধারণত ঐ দিন দুপুর ১২ টা থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত চলে। যে গ্রামে জলসা হয় সে গ্রামে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এসে জড়ো হন। সবার বাড়িতে ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের কাছে এ দিনের চাহিদা অনেক বেশি। কেননা, এ জলসাকে কেন্দ্র করে দোকানিরা বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলার সামগ্রী, ফল-মূল ও খাবার-দাবার নিয়ে আসে। শিশুরা আগে থেকেই টাকা-পয়সা যোগাড় করে রাখে এ জলসাতে তা খরচ করার জন্য।

জলসার মূল আকর্ষণ হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল। যেখানে বড় বড় আলিম, ওলামাদের আমন্ত্রণ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। আর, সাধারণ মানুষ সে আলোকে তাদের জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করে। যার মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-শান্তি লাভ করে।

৫. ওরস

ফেঞ্চুগঞ্জ ও কানাইঘাট অঞ্চল ওরসের জন্য বিখ্যাত। তন্মধ্যে তালবাড়ী খাল-পাড়ের ওরস অন্যতম। ওরসের সময় বহুদূর থেকে মানুষ নৌকা দিয়ে মুরগি, গরু, ছাগল প্রভৃতি নজরানা স্বরূপ নিয়ে আসেন।

সারারাত গান বাজনা চলে। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ দিন শিরনি বিতরণ করা হয়।

হযরত শাহজালালের মাজারে এবং শাবিপ্রবির নিবটস্থ মুইয়ার চরের হাবিবুর রহমান খোরাসানির মাজারে বেশ বড় ধরনের ওরস অনুষ্ঠিত হয়। শাজালালের ওফাত দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শাহজালালের ওরসে অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটে। অধিকাংশই নিম্ন আয়ের মানুষ, তবে কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে একটি গাড়ি ভাড়া করে আসেন বলে তাদের তেমন সমস্যা হয়না। রাত্রি-যাপনও প্রায় সকলেই দরগায় করেন। গান-বাজনা যারা করেন ও শুনেন তাদেরও অধিকাংশ নিম্ন আয়ের মানুষ।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষে এখানকার বিভিন্নস্থানে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। উপজেলা সদরে বসে বৈশাখী মেলা। আবহমান বাঙালির চিয়ায়ত বিভিন্ন মাটির সামগ্রী, কারুশিল্প, বস্ত্র প্রভৃতির নানা সমাহার এখানে দেখা যায়। বিভিন্ন লোকক্রীড়া এবং সংগীতেরও আয়োজন এ সময় হয়ে থাকে। দেশীয় খাদ্যদ্রব্য এবং খেলনারও হাট বসে এই মেলায়। শোভাযাত্রা, পান্তাভাত ভক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সকালে যে মেলার সূচনা হয়, গভীর রাতে লোকগান বা নাট্যের আসরের মধ্যে দিয়ে তা শেষ হয়। কোনো কোনো বৎসর এই মেলা দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত চলে।

সিলেট শহরের সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গনে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আড়ম্বড়ের সঙ্গে বৈশাখী বা বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিলেটের রবীন্দ্রসংগীতের প্রবাদপুরুষ রাণা কুমার সিংহ দুদশকেরও বেশি সময় যাবৎ এখানে এই উৎসবের আয়োজন করছেন। তাঁর সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত সংগীত পরিবেশন করেন। তবে আমন্ত্রিত হয়ে অন্যান্য সংগঠনও রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। রবীন্দ্র সংগীতের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখানে রুচিশীল দর্শকদের আগমন ঘটে এবং এতদুপলক্ষে অস্থায়ীভাবে মেলাও বসে থাকে। উল্লেখ্য, রাণাকুমার সিংহ মৈতৈ সম্প্রদায়ভুক্ত মণিপুরি এবং সিলেটের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পি।

নববর্ষ উপলক্ষে সিলেটে অবশ্য আরো অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে এম.সি কলেজ ও শাবিপ্রবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলা উল্লেখযোগ্য।

২. মাঘী মেলা

বিশ্বনাথের দশঘর ইউনিয়নের মিয়ার বাজারে অবস্থিত অদ্বৈত বৈষ্ণব রায়ের বাড়িতে প্রতি মাঘী পূর্ণিমার সময় বিরাট মেলা ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটে তখন। এখানে কয়েক শতাব্দী পুরোনো বকুল বৃক্ষ বর্তমান এবং এই বকুল তলাকে কেন্দ্র করে কিছু কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা স্নান বা তীর্থ স্নান করার পর এখানে আগমন করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলে অনেকের বিশ্বাস।

৩. পৌষ মেলা

পৌষ মাসে ছোট পরিসরে পিঠা তৈরি ও খাওয়া উপলক্ষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে মেলাটি অনেক বৃহৎ আকারে অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে তা কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। হিন্দুরা সংক্রান্তির দু/তিন পূর্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করেন এবং সংক্রান্তি দিন যে কোনো প্রশস্ত মাঠে সারাদিন ঘুড়ি উড়ানো ও পিঠা খাওয়ার আয়োজন করেন। ঘুড়ি ওড়ানো ও পিঠা খাওয়ার উৎসবে অবশ্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অংশগ্রহণ থাকে।

৪. একুশে মেলা

২১ ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপজেলার মাঠে একুশে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

www.pathagar.com

উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরাও এতে অংশ নেয়। এ উপলক্ষে মাঠে বসে বই মেলা। নানা রকম বই নিয়ে সাজানো হয় স্টল। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা এবং খাদ্যদ্রব্যও উক্ত মেলায় পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় খ্যাতিমান ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়/কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান অুষ্ঠিত হয়। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত চলে প্রভাত ফেরি।

৫. চড়ক মেলা

সিলেট শহরে চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা হয়। শব্দকর সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শহরের চালিবন্দরে বেশ ঘটা করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মাস-দুমাস আগে এরা শিব ও গৌরী সাজে সজ্জিত হয়ে দল-বল নিয়ে চাল, টাকা প্রভৃতি ভিক্ষা করতে বের হন। প্রয়োজনীয় অর্থ ও চাল সংগৃহীত হওয়ার পর এরা স্থানীয় শ্মশানের কাছে বিরাট আয়োজন করেন। এদিন এই সম্প্রদায় ধারালো দায়ের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব অবশ্য বড়শিতে ঝোলা। পূর্ব নির্ধারিত দুজনের পিঠে সেদিন বড় বড় বরশি গেঁথে শিবের কাছে প্রার্থনা করা হয়। পরে প্রতিটি বরশির সাথে একটি বড় দড়ি লাগানো হয়।

একটি শক্ত বাঁশের খুঁটির উপর প্রান্তে আর একটি বাঁশ বা কাঠ আড়াআড়িভাবে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যাতে এটি ঘুরতে পারে। পরে এর দুমাথায় দুজনকে বেঁধে প্রচণ্ড গতিতে শূন্যে ঘুরানো হয়। এগুলো দেখার জন্য আশে পাশে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এদিন মেলা বসে থাকে।

৬. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

সিলেট শহরের.মণিপুরি রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত এই মেলাও রেকাবি বাজোরের রথমেলার মতো প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। বারুণী উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলা পূর্বে চৈত্র মাসের প্রতি রোববার বিকেল তিনটে থেকে শুরু হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলতো। এখানে ক্রীড়া সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যেত। শিশু পার্ক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এখানে এসেই শিশুরা নাগর দোলা, চড়কি প্রভৃতিতে চড়তো। সারা বৎসর শিশু-কিশোররা তাই এই মেলার জন্য প্রতীক্ষা করতো। বর্তমানে খুবই স্বল্প পরিসরে মাত্র একদিনের জন্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শীতল পাটি সহ বেত সামগ্রীর জন্যও একসময় এই মেলা বিখ্যাত ছিল। বেতের পাটি বর্তমানে বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয়।

৭. রথযাত্রার মেলা

উপজেলায় জমজমাট ভাবে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা উৎসব। দুই দিন ব্যাপী এই উৎসবে রথ নিয়ে বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করা হয়। এছাড়া এ উপলক্ষে কীর্ত্তনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সিলেট শহরের রিকাবি বাজারে এখনো রথের সময় ২সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে। খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ পশুপাখি পর্যন্ত এই মেলায় ওঠে। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় নিয়ে অস্থায়ীভাবে এখানে অসংখ্য দোকান গড়ে ওঠে। জীবন্ত পশুপাখির কথা বাদ দিলে মেলাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অধিকাংশই দেশীয় সামগ্রী এই মেলায় ওঠে। প্রধানত মণিপুরিরা রথযাত্রার আয়োজন করলেও বাঙালিদের অংশগ্রহণেও কয়েকটি রথ যাত্রা করে। মেলার আয়োজক এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের অধিকাংশই মুসলমান।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হলেও মূল পর্ব চার-টি। প্রথম অংশ হচ্ছে **মঙ্গলাচরণ** বা প্রথমমঙ্গল। এদিন বর পক্ষের লোকজন এসে কনেকে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী, মিষ্টি, অলংকার এবং ধান-দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ করেন।

দ্বিতীয়মঙ্গল হচ্ছে **অধিবাস**। এটি গাত্র হরিদ্রা ও আদ্রি স্নান এই দুই অংশে বিভক্ত। বর ও কনে উভয়ের বাড়িতে এদিন বর বা কনেকে সন্ধ্যায় হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয়।

তৃতীয়মঙ্গল **বিয়ে**। কনের বাড়িতে বর আসার পর একটি সুসজ্জিত কুঞ্জে বরকে বসানো (চেয়ারে) হয় এবং তার চারপাশে কনেকে সাতবার ঘুড়ানো হয়। এটি সাত পাক নামে পরিচিত।

চতুর্থ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান **বৌ-ভাত** বা চতুর্থ মঙ্গল নামে পরিচিত। এদিন বৌ-কর্তৃক ভাত রন্ধন ও পরিবেশনের কথা থাকরেলও আজকাল এমনটি আর হয় না। তবে নিয়ম রক্ষার্থে বৌ কর্তৃক স্বামীকে সামান্য অন্ন পরিবেশন করানো হয়।

প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে একসময় সংগীত পরিবেশিত হতো। এখন বাদ্যযন্ত্রই কেবল বাজতে দেখা যায়।

বিবরণ

ছেলে বা মেয়ে যে কোনো পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব যেতে পারে। তবে মেয়ে পক্ষই প্রথমে ছেলে দেখতে যায়। ছেলে মেয়ে পছন্দ হলে প্রথমে মেয়ে পক্ষ স্বর্ণ বা টাকা ও ধান দূর্বা দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। পরে মেয়ের বাড়িতে যায় ছেলে পক্ষ। এরাও স্বর্ণ বা টাকা এবং ধান দূর্বা দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। উভয় পক্ষের পছন্দ পর্বের সময় পানবার্তা (পান-সুপারি) দিয়ে গাঁয়ের (পঞ্চায়েতের) ময়-মুরব্বিদের সঙ্গেও কেউ কেউ কথা বলেন। পঞ্চায়েতের মুরব্বীদের সামনে দেনা-পাওনা সহ বিয়ের আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আলোচনা করা হয়। পুরোহিত ঠাকুর, অথবা বয়োজ্যাষ্ঠ কেউ, যিনি পঞ্জিকা দেখতে জানেন তিনি পঞ্জিকা দেখে শুভদিন বের করেন। বিয়ের শুভদিন নির্ণয়ের পর মঙ্গলাচরণের তারিখ, অধিবাস ও বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর পঞ্জিকায় মুদ্রিত বিবাহ দিবসের পৃষ্ঠায় সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দেওয়া হয়। এসময় বাড়ির মেয়েদের উলু ধ্বনি দিতে দেখা যায়। প্রেমধ্বনি দেন পুরুষেরা। প্রেমধ্বনির কথাগুলো হল :

বল বল শ্রী কৃষ্ণ প্রেমানন্দে
বলিও প্রেম প্রেম
কহ শ্রী রাধে
কৃষ্ণ বল হরি।

www.pathagar.com

মঙ্গলাচরণ

হিন্দু বিয়ের প্রথম পর্ব মঙ্গলাচরণ। এ সময় ছেলের বাড়ি থেকে পাঁচ জন লোক শঙ্খ, শাখা-সিঁদুর, সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে পাঁচটি পুঁটি মাছ, সাধ্যমত বড় মাছ, দই, মিষ্টি, মেয়েদের যাবতীয় কসমেটিকস (সাজার সামগ্রী), স্বর্ণালংকার একটি সুটকেসে ভরে মেয়ের বাড়িতে নিয়ে যান। মেয়ের বাড়িতে পৌছার পর মেয়েরা উলু ধ্বনি দেয়। পুরোহিত ঠাকুর পঞ্জিকা দেখে সময় নির্বাচন করেন। নির্দিষ্ট সময়ে মেয়ে এবং ছেলের বাড়ির মুরব্বীদের সামনে পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়ে মেয়ের হাতে শাঁখা ও কপালে সিঁদুর পরান।

পানখিলি

পাঁচ-সাত বা বেজোড় সংখ্যার কয়েকজন সধবা নানা ভঙিতে উলুধ্বনি সহযোগে পানের খিলি তৈরি করবেন। পরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বর বা কনেকে আশীর্বাদ করবেন।

আর্দ্রিস্নান

কয়েকজন এয়ো মহিলা মিলে বর বা কনেকে স্নান করানোর অনুষ্ঠানের নাম আর্দ্রিস্নান। গ্রামের মহিলারা প্রথমে দল বেঁধে গীত গেয়ে গেয়ে পুকুর থেকে জল আনেন। তারপর সেই জল দিয়ে স্নান হয়। অনুষ্ঠান বরের বাড়িতে হলে বরকে, আর অনুষ্ঠান কনের বাড়িতে হলে কনেকে স্নান করানো হয়। বাদ্যযন্ত্র বা ব্যান্ড তখন বাজতে থাকে।

সোহাগ স্নান

মেয়ের মা অবর্তমানে মাতৃস্থানীয় কেউ একটি কুলা মাথায় নিয়ে ৫ থেকে ৭টি বাড়িতে নিজ কন্যার জন্য সোহাগ ভিক্ষে করতে যান। প্রতিবেশীগণ তখন সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ ধান, দুর্বা, তেল, সিঁদুর , ফল এবং চাল কুলার মধ্যে রাখেন। কুলা মাথায় নিয়ে বাসায় ফেরার পর কুলাস্থিত ধান-দুর্বা দ্বারা মা মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদেরও অনেকসময় বিয়ের কনেকে আশীর্বাদ করতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানটি সচরাচর উঠোনে সম্পন্ন করা হয় এবং ওই খানেই কনের মাথায় জল ঢেলে স্নান করানো হয়।

কনের মা কুলাস্থিত চাল সযত্নে ঘরে রেখে দেন। বিয়ের পর সেই চাল দ্বারা তৈরি মিষ্টান্ন বরকে খাওয়ানো হয়।

অধিবাস

বিয়ের আগের দিন অধিবাস অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এদিনও মেয়ে এবং ছেলের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। বর ও কনের বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বরযাত্রী ও বিয়ের আসর

বরযাত্রী নিয়ে বর মেয়ের বাড়িতে যান। বর বিয়ের দিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করেন। হাতে থাকে গামছা দিয়ে মোড়ানো দর্পণ (আয়না)। বর কনের বাড়িতে পৌঁছলে কনের

www.pathagar.com

বাড়ির লোকেরা গেট ধরে। এ সময় কনে পক্ষের লোকেরা (শ্যালক-শ্যালিকা) নতুন বরকে মিষ্টি মুখ করায় এবং গেট পারাপারের জন্য টাকা চায়। বর পক্ষ দরকষাকষি করে যা দিয়ে মানাতে পারে তা দিয়ে বর নিয়ে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। টাকা-পয়সার বিষয়টি কেউ কেউ বিয়ের পূর্বেই নির্ধারণ করে নেয়। বাড়িতে প্রবেশের পর কনের মা পাখাতে জল ছিটিয়ে উলু ধ্বনি দিয়ে বরকে বরণ করে নেন। এ সময় বর এবং বর যাত্রীরা যার যার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন।

সাত পাকের পূর্বে অর্থাৎ বিয়ের নির্দিষ্ট লগ্ন শুরু হওয়ার আগে বরযাত্রীদের নিয়ে আসর বসে। এই ঘরে কনে এবং বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশন করেন। একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার আমেজ এর মধ্যে থাকে।

বিয়ের লগ্ন শুরু হয়ে গেলে কুঞ্জের মধ্যে সাতপাকের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের পরের দিন কনের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় বাসি বিয়ে। এরপর কন্যাকে বরের সাথে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো হয়।

বিয়ের পর বরের বাড়িতে চতুর্থমঙ্গল বা বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে এটি বিয়ের দুদিন পর। বিয়ের পরদিন কনের বাড়িতে বাসি বিয়ে, তারপরের দিন কালরাত্রি। কালরাত্রির দিন বর এবং কনের মুখ দেখা নিষিদ্ধ থাকে। দুজন দু ঘরে এমনকি দুই বাসায় সেদিন অবস্থান করেন। পরের দিন চতুর্থমঙ্গল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

গেট ধরা

সিলেট জেলার গ্রামাঞ্চলে বিয়ের গেট ধরা নিয়ে চমৎকার রঙ্গ-রস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বরযাত্রী এসে বিয়ের গেটের সামনে থামেন। সেখানে বরসহ বর-যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা থাকে। সামনে রাখা থাকে মিষ্টি, দুধ ও পানের খিলি।

তবে বর এসেই তা খেতে পারেন না। এসময় ঠাট্টার সম্পর্কীয়রা নানা রকমের ঠাট্টা, ধাঁধা ও বিভিন্ন মজার মজার প্রশ্ন করেন। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বরকে কনে পক্ষের দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করতে হয়।

প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ:

প্রশ্ন : কিতারে ভাই এনে আর মেনে
জামাই আইছইন শ্বশুর বাড়ি
তোমরা আইছ কেনে ?

উত্তর : হুনুক্কা ভাই উবা আর ছুবা (শুনুন)
জামাই আইছইন শ্বশুর বাড়ি
আমরা আইছি শোভা। প্রভৃতি।

ঘর সঞ্চার

নতুন ঘর বা বাড়ি নির্মাণের পর সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে শুভ দিন দেখে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার নাম ঘর সঞ্চার বা গৃহ-সঞ্চার। এই অনুষ্ঠানে মূলত বাস্তু-দেবীকে পূজা করা হয়। তবে অতিরিক্ত হিসেবে কেউ কেউ নাম সংকীর্তন, লুট বা শক্তিদেবীরও আরাধনা করে থাকেন।

www.pathagar.com

হরি বাসর

হরি বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান, তারই নাম হরিবাসর। উল্লেখ্য, হিন্দুদের বিশ্বাস, ঈশ্বর সত্যযুগে হরি, ত্রেতা যুগে রাম, এবং দ্বাপর যুগে কৃষ্ণরূপে মর্তে আগমন করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করেছিলেন। তাই যিনি হরি, তিনিই কৃষ্ণ। সপ্তাহে একদিন হরি বাসর করা হয়।

সেবার উপকরণ : লুটের জন্য তিলু, বাতাসা ও কলার প্রয়োজন পড়ে।

২. মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত উৎসব

এই জেলার মুসলমান সম্প্রদায় ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, আশুরা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোথাও কোথাও বদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ব্যতিরেকে, আবার কোথাও কোথাও বাজনা সহ ধর্মীয়গান পরিবেশন করা হয়। ঈদের সময় ডিভিডি বা সিডি প্লেয়ারে উচ্চ স্বরে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি গান ছেড়ে, তার সঙ্গে তরুণ যুবাদের নৃত্য পরিবেশন করার দৃশ্যও অনেকাংশে প্রত্যক্ষ হয়।

পদ্ধতি

প্রথমে আসর সাজানো হয়। পঞ্চতত্ত্বের ছবি সেই আসনে থাকে। ছবির নিচে চরণে ফুল নিবেদন করতে হয়। লুটের উপকরণগুলো একটি রেকাবিতে সাজানো থাকে। তারপর ভক্তবৃন্দরা সমবেত হয়ে পঞ্চতত্ত্বের উদ্দেশ্যে কীর্তন করেন।

কীর্তন গুলোর একটি এরকম :

আইলোরে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়
রাই কোম্পানীর জংশন হইল শ্রীবাস আঙিনায়।
.... আইলোরে ॥
শ্রী অদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার
নিত্যানন্দ টিকেট গো মাস্টার।
শ্রী গৌরাঙ্গ হইয়া ড্রাইভার
সেই গাড়ি চালায় ॥

বিভিন্ন সংগীত পরিবেশনের পর লুটের গান গেয়ে লুট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হলেও ভক্তদের মধ্যে লুট ধরার আগ্রহ বেশি। ভক্তের বিশ্বাস লুট হচ্ছে ভাগ্যের প্রতীক, এটি ধরতে পরলে সৌভাগ্য হস্তগত হয়।

৩. ব্রতাচার

সিলেট জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষাকে উপলক্ষ করে অথবা কোন অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্রতাচার পালন করেন। তন্মধ্যে সুসন্তান বা সুপুত্র এবং উত্তম বর কামনাতেই সর্বাধিক সংখ্যক ব্রতাচার পালিত হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ বা সংকট পরিত্রাণমূলক ব্রতের সংখ্যাও একেবারে কম নয়।

www.pathagar.com

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেট অঞ্চলেও একসময় ব্যাপকভাবে ব্রতাচার পালিত হয়েছে। সম্ভবত এতদঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক ব্রত ছিল একসময় প্রচলিত ।

সিলেট অঞ্চলে পূর্বে প্রচলিত ব্রতাচারসমূহের মধ্যে রয়েছে—

১. রূপসী ব্রত। ২. মদন দ্বাদশী ব্রত। ৩. দুলাইকুলাই ব্রত।
৪. কার্তিক ব্রত। ৫. দুর্বাষ্টমী ব্রত। ৬. জামাইষষ্ঠী ব্রত।
৭. বিপদ-নাশিনী ব্রত। ৮. সংটাদেবী ব্রত। ৯. সুবচনী ব্রত।
১০. মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। ১১. অরণ্যষষ্ঠী ব্রত। ১২. শীতলাষষ্ঠী ব্রত।
১৩. সাবিত্রী ব্রত। ১৪. শনি ব্রত। ১৫. ঠাকুরব্রত।
১৬. সত্যনারায়ণ ব্রত। ১৭. চাতুর্মাস্য ব্রত। ১৮. শিবচতুর্দশী ব্রত।
১৯. ঝট্‌ফট্‌ ব্রত। ২০. গঙ্গা ব্রত। ২১. নির্জলা একাদশী ব্রত।
২২. সন্তোষী ব্রত। ২৩. মাঘমণ্ডল ব্রত। ২৪. সূর্যব্রত। প্রভৃতি।[৬]

তন্মধ্যে গঙ্গাব্রত, কার্তিকব্রত, জামাইষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, বিপদ-নাশিনী ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, সূর্যব্রত, শনি ব্রত, শিবচতুর্দশী ব্রত, রূপসীব্রত ও শীতলাষষ্ঠী ব্রত (শীতলী ব্রত), অদ্যাবধি এতদঞ্চলে প্রচলিত।
সাধারণত বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সূচনালগ্নে গঙ্গা পূজার আয়োজন করা হয়। তবে সপ্তাহের যে কোনো দিনই তা উদ্‌যাপন করা যায়। পূজার দিন পূজারি বা ব্রতীদের উপবাস পালন করতে হয়।

পূজাপদ্ধতি

নদী বা পুকুর পাড় পূজার আয়োজন স্থল।
ভোর বেলা স্নান সমাপন পূর্বক উপবাস থাকা অবস্থায় নদী অথবা পুকুর পাড়ে ব্রতী বা পূজারিবৃন্দ সমবেত হয়ে এই পূজার আয়োজন করেন। পুকুর বা নদীর পাড়ে অবশ্য পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়না। পাড় থেকে হাটু জলে নেমে গঙ্গার উদ্দেশ্যে কিছু মন্ত্র পড়ে বা নিজ নিজ মনোবাসনা জানিয়ে প্রথমে গঙ্গা দেবীকে প্রণাম জানানো হয়। পরে সাজি থেকে কিছু ফুল নিয়ে ব্রতী বা পূজারিগণ গঙ্গার উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দেন। থালা থেকে কিছু ফল নিয়ে সেগুলোকেও নদী বা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এরপর সংগ্রহ করে আনা হড়িতকিও অনুরূপভাবে জলে ছিটিয়ে দেন। পূজা শেষে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বর্ষার জল যাতে জনগণের জন্য আশীর্বাদ হয়, এ প্রত্যাশাতেই গঙ্গা পূজার এই আয়োজন।

অকল্যাণী ব্রত

সচরাচর অবিবাহিত কন্যার মা *অকল্যাণী ব্রত* পালন করেন। মেয়ের ত্বরিৎ বিবাহের জন্য এই ব্রতাচার পালন করা হয়। যেসব মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, অথবা ভাল পাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না, তার উদ্দেশ্যেই কন্যার মা এই ব্রত পালন করেন।

www.pathagar.com

পূজাপদ্ধতি

সকালে স্নান সমাপন পূর্বক পুকুর ঘাটের নির্দিষ্ট একটি স্থান ভাল করে পরিষ্কার করে; সেখানটা গোবর দিয়ে উত্তমরূপে লেপে, একটি ছোট আসনের উপর অনুরূপ একটি ছোট ঘট বসিয়ে দেয়া হয়। এরপর পূজারি আসনের উপর অবস্থিত ঘট্‌কে (ঈশ্বরের প্রতীক) ধান-দূর্বা-ফুল দ্বারা পূজা দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে ফল-মূল প্রদান করেন। পূজা শেষে একটি ডিম ঘটের গায়ে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়া হয়। মেয়ের অকল্যাণ দূরীভূত হওয়ার প্রতীকি ব্যঞ্জনা সকল মা'কেই মানসিক দিক দিয়ে তৃপ্ত করে। পূজা শেষে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হাজীপুর ঠাকুরের ব্রত

কারো কোনোকিছু হারিয়ে গেলে হাজীপুর ঠাকুরের ব্রত পালন করা হয়। প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ফেঞ্চুগঞ্জে হাজীপুর নামে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কারো কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তার অবস্থান বলে দিতে পারতেন। ব্যক্তিটির মৃত্যুর পর তাই এতদঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষ হাজীপুর ঠাকুরের ব্রত পালন শুরু করে। কারো কোনো কিছু হারালেই কেবল এই ঠাকুরের ব্রত পালন করা হয়।

ব্রতপদ্ধতি

প্রথমে বাড়ির উঠোনের একটি নির্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার করে এয়ো মহিলাগণ ছোট নতুন কাপড়ের টুকরার উপর ঘট স্থাপন করেন। এরপর স্নান করে বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে, গলায় শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে, হাজীপুর বাবার নাম ২০ থেকে ২৫ বার মনে-মনে বা সজোরে উচ্চারণ করেন। বাবার আগমন ঘটেছে এইরূপ ভাবার পর মহিলাগণ ঘটের সামনে বসে জোর হাতে তাকে প্রণাম জানান। দই, কলা ও চিড়া দ্বারা ভোগের ব্যবস্থা করা হয় এর অব্যবহিত পর। যার যে বস্তু হারিয়েছে, সে সেই বস্তু ফেরত পাবার কামনা করার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

অন্যান্য ব্রতের মতো এই অনুষ্ঠানের পরও ব্রতীগণ দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন।

শীতলী ব্রত

শীতলী ব্রত বছরের যে কোনো সময় যে কোনো উদ্দেশ্যে পালন করা যায়। তবে পূর্বে কেবল রোগমুক্তি বা আরোগ্য লাভের জন্য এই পূজার অয়োজন করা হতো।

পদ্ধতি

শীতলীব্রত মূলত সন্ধ্যার সময় উদ্‌যাপিত হয়, তবে ভোর বেলা থেকেই চলতে থাকে এর প্রস্তুতি। পূজা বা ব্রতের দিন ঠিক সূর্য ওঠার সময় রমণীগণ পুকুর বা নদীতে গিয়ে স্নান সম্পন্ন করেন (অবশ্য শহরের মানুষ বর্তমানে বাথরুমেই এই কর্ম সম্পাদন করেন)। অতঃপর ফুল ও কলাপাতার অগ্রভাগ নিজ বাসা বা অন্য কারো বাসা থেকে সংগ্রহ করে উঠোনের নির্দিষ্ট একটি স্থানে করেন ঘট প্রতিষ্ঠা। ঘট প্রতিষ্ঠার পূর্বে অবশ্য স্থানটি ভালো করে পরিষ্কার করে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

ঘটে শীতলীদেবীকে আহ্বান জানানোর পর পূজারিবৃন্দ কলাপাতার অগ্রভাগে রক্ষিত ফুল দ্বারা তাঁকে পূজা করেন। অতঃপর কলাপাতার আর একটি অগ্রভাগে কিছু ফল-মূল রেখে তা দেবীর উদ্দেশ্যে করা হয় নিবেদন। শীতলীর উদ্দেশ্যে পাঁচালী বা গল্প পাঠ করার পর শুরু হয় সংগীত। বিভিন্ন ধরনের ভক্তিমূলত গীত এসময় পরিবেশন করা হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলে কোনো কোনো ব্রতী প্রসাদ হিসেবে ফলাদি আহার করেন। অন্যরা পুজানুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত করেন উপবাস। এসময় প্রদীপ প্রজ্বলন শুরু হয়। স্থানীয় ভাষায় এই প্রদীপকে বলে চাটা। ছোট্ট পিতলের চাটায় চিকন ও সরু একটি সলতে থাকে। মোট পাঁচ থেকে সাতটি চাটা এসময় জ্বালানো হয়। কেউ কেউ পূর্বে সংগৃহীত দুর্বা দ্বারা এই সময় আর্ঘও করেন।

সাগু বা চালের সঙ্গে কয়েকটি কলা ছিলে এসময় দেবীকে প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে এবং ওই সময়ই ব্রতীগণ প্রসাদ ভক্ষণের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করেন।

কালাচাঁন ব্রত

সাধারণত বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। তবে সন্তান লাভের জন্যেও কেউ কেউ উক্ত ব্রত পালন করে থাকেন।

পূজা পদ্ধতি

সন্ধ্যার সময় স্নান করে বটগাছের নিচে একটি লাল কাপড় পেতে কালাচাঁন ব্রত উৎযাপন করতে হয়। ব্রতীগণ অন্যান্য ব্রতের মতো একটি ঘট এই কাপড়ে স্থাপন করে, সম্মুখভাগে সযত্নে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে ব্রতীরা নিম্নোক্ত ধরনের গান পরিবেশন করেন।–

ওরে কালাচাঁন নিষ্ঠুর পাষাণ
দয়া মায়া নাই তোর
পান গুয়া (সুপারি) সাজাইয়া
আমি রইলাম বসিয়া
তুমি যাও রঙ্গের তরী বাইয়া।
ফলফসারি সাজাইয়া, আমি রইলাম বসিয়া
তুমি যাও রঙ্গের তরী বাইয়া
ধুপ ধুনা জ্বালাইয়া, আমি রইলাম বসিয়া
তুমি যাও রঙ্গের তরী বাইয়া।

তারপর একটি কাগজে পান সুপারি নিয়ে, কালাচাঁনের উদ্দেশ্যে বটগাছের নিচে রেখে আসা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে পূজা অনুষ্ঠানের ইতি ঘটে। পূজার পর দর্শণার্থী ও প্রিয়জনের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত

বছরের যে কোনো মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করা যায়। সাধারণত পরিবার ও জগতের মঙ্গল কামনায় ব্রতীগণ এই ব্রত পালন করেন।

www.pathagar.com

ব্রতের নিয়ম

এই ব্রত পালনের তিন দিন পূর্ব থেকে ব্রতীগণ শুধুমাত্র ফলমূল খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ শনি, রবি ও সোমবার ফলমূল খেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্নান করে তারা উঠোনে ঘট বসিয়ে পূজা দেন।

পূজা পদ্ধতি

প্রথমে ব্রতী ঘটের চারপাশে ধান ছিটিয়ে দেন। পরে পঞ্চপত্র বিশিষ্ট আম্রডালের অগ্রভাগ ঘটে বসিয়ে, ঘটটি জল দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। ব্রতী এরপর একটি পাত্রে ফুল ও ফল একসাথে নিয়ে মাথায় শাড়ীর আঁচল দিয়ে পাত্রটি ঘটের সামনে রাখেন। সহযোগী বা অন্যান্য ব্রতীগণ ঘটে তিন থেকে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করেন।

পূজা শেষে এক টুকরো নৈবেদ্য ঘটে দিয়ে ভোগ লাগানো হয় এবং পরে সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ফুলকুমারী ব্রত

সাধারণত বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবার এই ব্রত পালন করা হয়।

পূজা পদ্ধতি

ব্রতীগণ সকালে স্নান সম্পন্ন করে বাড়ির উঠোন, পুকুর বা নদীর পাড়ে (তীরে) ঘট বসান। তারপর ঘটের চারপাশে ধান দূর্বা ছড়িয়ে দেন। ঘটে সিঁদুরের তিনটি ফোঁটা প্রদানের পর একটি পাত্রে ফলমূল নিয়ে নিত্য দিনকার মতো পূজা অর্চনা চলে। এক ঘণ্টার মধ্যে পূজা অনুষ্ঠানের ইতি ঘটে। পূজা শেষে নদীতে ঘট বিসর্জন দিয়ে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধারণত জগতের মঙ্গল কামনায় ব্রতীগণ এই ব্রত পালন করেন।

রক্ষাকালী ব্রত

সাধারণত কালী পূজার দুই দিন আগে আবার আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত পালন করা হয়।

পূজা পদ্ধতি

ব্রতীগণ ব্রতের দুই দিন পূর্বে শুধুমাত্র ফলমূল খেয়ে থাকেন। ব্রতের দিন সন্ধ্যায় স্নান করে উঠোনে ঘট বসিয়ে তার চারপাশে ধান দুর্বা ছড়িয়ে দেন। ঘটে পরিমাণ মতো জল ঢেলে তাতে পঞ্চপত্র বিশিষ্ট আম্রডালের অগ্রভাগ বসিয়ে পূজার সময় ব্রতীগণ নিম্নোক্ত গান পরিবেশন করেন–

চল যাই শ্যামা মার নিকটে
শ্যামা শ্যামা বামা নহে,
বিভিন্ন রূপে পূর্ণ সে যে

www.pathagar.com

অভেদ তামসী, ব্রজের কাল শশী, বাজায় মোহন বাঁশি
ত্রি জগৎ ভরে।
চল যাই শ্যামা মার নিকটে।

পূজা শেষে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কার্ত্তিক ব্রত

কার্তিক মাসের শেষ দিন এই ব্রত পালন করা হয়।

পূজা পদ্ধতি

কার্ত্তিক মাসের প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে কীর্ত্তন হয়। তারপর মাসের শেষ দিন প্রত্যেকের বাড়ি থেকে সামর্থ অনুযায়ী চাল, ডাল, অর্থ কিংবা অন্য জিনিস সংগ্রহ করে যে কোনো একজনের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় সকলে একত্র হয়ে আরতী ও নাম সংকীর্ত্তন করেন। সবশেষে প্রসাদ বিতরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি ঘটে।

এ পূজার দিনে সাধারণত দুই জন উপবাস করে পূজা দেয়। অন্যদের উপবাস না করলেও চলে। তবে আরতী ও নাম সংকীর্ত্তনে সবাই অংশগ্রহণ করে।

শনিব্রত

মানুষ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে এই ব্রত পালন করে থাকে। সাধারণত শনিবার সারাদিন উপোষ করে বাড়ির গৃহিণী উঠোনে এই পূজা দেন।

পূজার উপকরণ

পাঁচ প্রকার ফল, পান-সুপারি, তিল, মাষকলাই, কালপাড়ের ধূতি, নীল রঙের গামছা, প্রদীপ, নৈবেদ্য মিষ্টান্ন, বাতাসা, দধি, মধু, অপরা-জিতার মালা প্রভৃতি।

শালগ্রামে শনিদেবের পূজা হয়। শালগ্রাম না থাকলে মাটির কিংবা পিতলের ঘটে পূজা দিতে হয়।

পূজা বিধি

উঠোনে ঘট বসানোর পর তা পানিতে পূর্ণ করে ঘটের উপর আম্রপল্লব দিয়ে ঘটের চারপাশে ফুল, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধান ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে সূর্যদেবকে আরাধনা করা হয়–

ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃ-ক্ষপা।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।
ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

এরপর 'নবগ্রহস্তোত্রম্' মন্ত্র পঠিত হয়–

ওঁ জবাকুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।

www.pathagar.com

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম।
দিব্যশঙ্ক তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোমুকুট ভূষণম্।

নবগ্রহস্তোত্রমের পর পূজারী 'শনিস্তোত্রম্' পাঠ করেন–

শ্রী শনৈশ্চরায় নমঃ।
অস্য শ্রীশনৈশ্চরস্তোত্র মন্ত্রস্য দশরথ ঋষিঃ
শনৈশ্চরো দেবতা ত্রিষ্টুপছন্দ ঃ
শনৈশ্চর প্রত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

শনির সেবা

শনিব্রতকে অনেকে শনিসেবা নামেও উল্লেখ করেন। এ ব্রত/পূজা শহরে মহিলা কর্তৃক, আবার গ্রামে পুরুষ কর্তৃক উদযাপিত হতে দেখা যায়। কেবল শনিবার সন্ধ্যায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষত্ব

শনিপূজা ঘরের বাইরে হয়। শনি ঠাকুরের প্রসাদ ঘরের ভেতরে নেওয়া হয় না।

পূজার নিয়ম

ব্রতীগণ ঘরের বাইরে যে স্থানে শনি পূজা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন, সে স্থানটি খুব ভালো করে নিকানো হয়। সচরাচর তুলসী বেদীতে শনিঠাকুরের পূজা/সেবা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজারী পূজার আগে স্নান সমাপন পূর্বক নতুন বস্ত্র পরিধান করে পূজার যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করেন। কেউ কেউ শনি পূজা নিজেই করেন। কেউ আবার পুরোহিত ডেকে এনে বিরাট আয়োজন করেন। পূজা শেষে শনির পাঁচালী পড়া হয়। কোথাও কোথাও শনির গানও গাওয়া হয়। শনি ঠাকুরের একটি গানের প্রথম কলি এরকম–*নব গ্রহ সঙ্গে নিয়ে আসিলেন গোসাই*। এই গানটি সিলেটে খুবই জনপ্রিয় এবং প্রায় সকলেই শনিপূজার পর এ গান পরিবেশন করে থাকেন।

সচরাচর শনি গ্রহ মানুষের ভাগ্যে কু-প্রভাব ফেলতে পারে এ বিশ্বাস থেকে শনি পূজার প্রচলন হয়।

নৈবেদ্য

সাধারণত ব্রতী বা পূজারির সাধ্যমত নৈবেদ্যর আয়োজন করা হয়। নানা রকমের ঋতু ভিত্তিক ফলই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। তবে এক্ষেত্রেও সাবু ও চিড়ার প্রয়োজন পড়ে। পূজার পর পূজারিণী এসব দিয়ে প্রসাদ মেখে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেন। তবে

www.pathagar.com

পূজার প্রসাদ কখনও ঘরের ভেতর নেওয়া হয় না। শনির প্রসাদ ঘরে নিলে ঘরে শনির দশা কাটে না বলে এ ধরনের সতর্কতা পালন করা হয়।

বিপদনাশিনীর ব্রত (বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ)

বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহর-গ্রামের মধ্যবিত্ত রমণীগণ এই ব্রতাচার পালন করেন। সচরাচর শনি কিংবা মঙ্গলবারে উক্ত পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল কিংবা দুপুরের দিকে সাধারণত পূজার কাজ শুরু হয়।

ব্রতের প্রয়োজনীয় উপকরণ

ঘট, ধূপ, আগরবাতি, আমপাতা, ফুল, দুর্বা, তৈল, সিঁদুর, নৈবেদ্য ইত্যাদি।

বিশেষ উপকরণ

পান-সুপারী ব্রতের প্রধান উপকরণ। আর এইজন্য অনেকে এই ব্রতাচারকে *পান দান* (স্থানীয় উচ্চারণে পান দেয়া) বলে থাকে। প্রথমে পান-সুপারী এবং তারপর নৈবেদ্যের জন্য বিভিন্ন ফল-ফলাদি সংগ্রহ করে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবতার সামনে রাখতে হয়।

পূজা পদ্ধতি

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে গোটা বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। ঠাকুর ঘর ধোঁয়ামোছার পর ঠাকুরের বাসন-কোসন ধৌত করা হয়। ব্রতী বা পূজারিণী উপবাস অবস্থায় স্নান করে এসে পূজার উপকরণ ও নৈবদ্য সাজান। ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে পিতল বা মাটির ঘটে জল ভরে, পাঁচটি আম পাতা তার মধ্যে ডুবাতে হয়। পাতাগুলো ঘটের উপরে প্রসারিত থাকে। এসময় ঘট এবং আমপাতায় পাঁচটি করে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হয় এবং ঘটে মনুষ্যাকৃতির একটি মূর্তি অঙ্কন করা হয়। বলাবাহুল্য তিনিই বিপদনাশিনী। পরে কলা গাছের অগ্রপাতায় কিছু ধান-দুর্বা নিয়ে তার উপর সেই ঘট বসানো হয়। পাশে একটি গ্লাসে দূর্বা সমেত জল রাখা হয়। ঘর শুদ্ধ করতে এই গ্লাস থেকে জল নিয়ে চতুর্দিকে ছিটানো হয়।

পূজারিণী এরপর ফুল দিয়ে পূজা সম্পন্ন করেন। বিপদ নাশিনীর পাঁচালী বা গল্প পাঠ হয় এরপর। ব্রতী এই পাঁচালী পাঠ করেন আর অন্যান্য ভক্তগণ তা শ্রবণ করেন। ব্রতী একাধিক হলে যে কোনো একজন তা পাঠ করেন এবং অন্যান্যরা ভক্তি সহকারে শুনতে থাকেন। পাঁচালীর পরিবর্তে গল্প বলা হলে, তাও গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভক্তগণ শ্রবণ করেন। এমনকি একাধিকবার শ্রবণ করা গল্পও একইরকম উৎসাহের সঙ্গে তারা শ্রবণ করতে থাকেন। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অনেকে জোকারও (উলু ধ্বনি) প্রদান করেন। পাঁচালী পাঠ শেষে ভক্তরা ষাষ্ঠাঙ্গে মা বিপদনাশিনীকে প্রণাম করেন। পরে ঘটে রাখা দুর্বা সমেত জল ভক্তগণের উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দেয়া হয়। এই জলের স্পর্শ নেয়ার জন্য ভক্তগণের মধ্যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। অনেকে তা মাথায়ও লাগান। এসময় সকলে পা ঢেকে রাখেন, যাতে পায়ে জল না লাগে।

www.pathagar.com

ব্রতের শেষে ব্রতীগণ প্রসাদ ভক্ষণের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করেন এবং উপস্থিত সবাইকে ডাকেন প্রসাদ খাওয়ার জন্য। সবাই এসে লাইন ধরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রসাদ

যা নৈবেদ্য, তা-ই প্রসাদ। পূজার আগে, দেবতাকে উৎসর্গ করার পূর্বে, যেসব ফল-মূল সাজানো হয়, তার নাম নৈবেদ্য। আর দেবতার পূজার পর ওই ফল-মূলেরই নাম হয় প্রসাদ।

সাধারণত ব্রতীর সাধ্যানুযায়ী নৈবেদ্যর আয়োজন করা হয়। নানা রকমের ঋতু ভিত্তিক ফল যেমন আম, কাঁঠাল, আনারস, তরমুজ, লিচু প্রভৃতি নৈবদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। তবে সারা বছর কলা পাওয়া যায় বিধায় এই ফলই আবশ্যিক নৈবেদ্য। নৈবেদ্যর জন্য জন্য ফল ব্যতীত আবশ্যিক দ্রব্য হচ্ছে সাবু বা চাল। তবে চিড়ারও প্রয়োজন পড়ে। সাবু ও চিড়ার মধ্যে চিনি, কলা, মধু, ঘি ও কর্পূর দেওয়া হয়। পূজার পর পূজারিণী এসব দিয়ে প্রসাদ মেখে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেন।

লালফুল বিপদনাশিনীর প্রিয়। তবে যারা আড়ম্বরের সঙ্গে বিপদনাশিনী পূজা করেন, তারা তের (১৩) জাতের ফুল ও তের জাতের ফল তাঁর উদ্দেশ্যে প্রদান করেন।

সুমতি ব্রত

মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়।

যে কোনো শুক্রবার সুমতি ব্রত পালন করা যায়।

এই ব্রতের জন্য প্রয়োজন আম্রপলব, মাটির ছোট ঘট, কলাপাতার অগ্রভাগ এবং ফুল। নৈবেদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফল দেয়া হয়। তবে সাবু এবং কলা আবশ্যক হিসেবে থাকে।

ব্রতের দিন পূজোর পূর্ব পর্যন্ত উপোষ থাকতে হয়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ব্রতী নিজ হাতে গাছ থেকে ফুল তুলেন। কলা পাতা অবশ্য তিনি আগের দিনও কেটে রাখতে পারেন। বাসায় কলা গাছ না থাকলে অন্য কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেয়া হয়। ফল সচরাচর বাজার থেকে কিনে আনা হয়, তবে কারো কারো বাসায় কলা গাছ থাকে। এই গাছ থেকে কলার পাতা এমনকি কলাও পেড়ে আনা হতে পারে।

নৈবেদ্য সাজিয়ে ব্রতী প্রথমে ঘটে জল ভর্তি করেন। তারপর এতে আম্রপলব ডুবিয়ে রাখেন। আমের পাতা ব্রতী এমন ভাবে পানিতে ডুবান, যাতে পাতা অংশটুকু ঘটের বাইরে এবং নিচের অংশ জলে থাকে। পাতাগুলো সচরাচর এক বোটায় জোড়া লাগানো থাকে এবং সংখ্যা হয় পাঁচ থেকে সাতটি।

জলে পাতা ডুবানোর পর ব্রতী ঘটের যে কোনো একটি প্রান্তে সিঁদুর দিয়ে সুমতি দেবীর ছবি আঁকেন। এই ছবিতে মানুষের মতো একটি মাথা, দুটি হাত ও দুটি পা অঙ্কিত হয়। মূর্তি বা ছবির দিকে মুখ করে বসে অতঃপর ব্রতী তাঁকে ফুল দিয়ে পূজো করেন। পূজোর আগে অবশ্য তিনি ঘটে সিঁদুর দিয়ে ৫টি ফোঁটা দেন।

www.pathagar.com

পূজোর পর ব্রতী সুমতির মাহাত্মসূচক একটি কাহিনি উপস্থাপন করেন। উপস্থিত অতিথি বা বাসার অন্যান্য রমণীগণ তখন এই কাহিনি শ্রবণ করেন। এর পর দেবীর উদ্দেশ্যে তিনি ও অন্যান্যরা প্রণাম জানান। মাটিতে পড়ে এই প্রণাম করা হয়। এভাবে পূজা বা ব্রতানুষ্ঠান শেষ হলে উপস্থিত সবার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সুমতি ব্রতের কাহিনি লোককথা অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিপদনাশিনী ব্রত (খাদিম-জৈন্তা)

বিপদ দূর করার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। ব্রতাচারটি অন্যান্য ব্রতাচারের মতোই বাড়ির মহিলা বা কিশোরী কর্তৃক হয় পালিত।

ব্রতীগণ সচরাচর মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করেন। অন্যান্য ব্রতাচারের মতো ব্রতের দিন উপবাস পালন করতে হয় এবং নৈবেদ্য হিসেবে কলা সাগুর প্রয়োজন পড়ে। বিভিন্নরকম মৌসুমী ফল এবং ফুলও যথারীতি এই ব্রতে লাগে। এই ব্রতেও ঘট থাকে এবং তাতে জল ভর্তি করে আম্রপলব দিতে হয়। ঘটের একপাশে ব্রতী সিঁদুর দিয়ে বিপদনাশিণী দেবীর ছবি আঁকেন, এবং তার পাশে বা উপরে সিঁদুর দিয়েই মঙ্গল সূচক ৫টি ফোঁটা আঁকেন।

পূজানুষ্ঠানের পর ব্রত কাহিনি পাঠ করা হয় এবং তারপর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কেউ কেউ ঘটের নিচে ধান রাখেন এবং তার আশেপাশে অঙ্কন করেন সুদৃশ্য মণ্ডল।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সময় মহিলাগণ সুউচ্চ স্বরে জোকার বা উলুধ্বনি প্রদান করেন।

ধূপ এবং প্রদীপ এসময় প্রজ্জ্বলিত থাকে।

সন্তোষী মায়ের ব্রত

যে কোনো শুক্রবার সন্তোষী মায়ের ব্রত পালন করা যায়। পূজোর পূর্ব পর্যন্ত উপবাস থাকতে হয়। কোনো প্রকার টক্ যাতীয় দ্রব্য সেদিন আহার করা যায়না। নৈবেদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফল, সাগু, চাল এবং ফুলের মধ্যে অতসী ও নীলকণ্ঠ ফুল অগ্রগণ্য। কলাপাতার সামনের অংশে নৈবেদ্য প্রদান করতে হয়। ঘটে আম্রপলব লাগে। পূজোর পর উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত

যে কোনো মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডী ব্রত উদযাপন করা যায়। নৈবেদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফল, সাগু, চাল এবং ফুলের মধ্যে লাল বর্ণের ফুল অগ্রগণ্য। কলাপাতার সামনের অংশে নৈবেদ্য প্রদান করতে হয়। ঘটে যথারীতি আম্রপলব লাগে। পূজোর পর উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সংসারের মঙ্গল কামনা করে এই ব্রত পালন করা হয়।

ঝটফট ব্রত

জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোনো শনি অথবা মঙ্গলবার ঝটফট ঠাকুরের ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সচরাচর ব্রতানুষ্ঠান দেবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু ঝটফট ঠাকুর দেবী নন পুরুষ দেবতা।

www.pathagar.com

অন্যান্য ব্রতাচারে যা যা লাগে, এই ব্রতাচারেও তারই প্রয়োজন পড়ে। তবে অতিরিক্ত হিসেবে এই অনুষ্ঠানে প্রয়োজন পড়ে এক কলকি তামাক, কয়েকটি পান, তেল এবং সিঁদুর। কেউ কেউ অবশ্য কেবল তামাক, পান এবং তেল সামনে রাখেন। এই অনুষ্ঠনের শেষ দিকেও ব্রতকাহিনি উপস্থাপন করা হয়।

সূর্যব্রত

মাঘ মাসের যে কোনো রোববার সূর্যব্রত পালন করা যায়। ব্রতী সূর্য উঠার পূর্বে ঘর থেকে বেরুবে আর সূর্য ডোবার পর ঘরে প্রবেশ করবে। সূর্য ঠাকুরকে নৈবেদ্য হিসেবে ফল, খিচুরি, মিষ্টান্ন প্রদান করা হবে। যে উপবাস করবে সে পূজার পরপরই প্রসাদ খাবেনা। সারাদিন সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে সূর্যের উপাসনা করবে এবং সূর্য ডোবার পর বাড়ির আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ফল ভক্ষণের মাধমে ব্রতী উপবাস ভাঙ্গবে। একজন পুরোহিত বা বয়স্ক গৃহকর্তী পূজোর সময় মন্ত্র ধরিয়ে দিবে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সময় ধামাইল গান অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মাদিত্য ব্রত

একে কর্মপুরুষের ব্রতও বলা হয়ে থাকে। দুই ভাগ চিড়ার সঙ্গে খই, তেজপাতা, মরিচের গুড়ো, লাউ বিচি, শিম বিচি,লবণ প্রভৃতি মিশিয়ে গুড়ো করা হয়। একে কর্মগুড়ো বলে। উপবাসের পর অর্থাৎ পূজো শেষে এই কর্মগুড়ো খেয়েই ব্রতী উপবাস ভঙ্গ করেন।

২. সাধ ভক্ষণ

হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের সন্তান সম্ভবা হওয়ার ৫ থেকে ৭ মাসের মাথায় এই আচার পালিত হয়। বাড়ির সধবা মহিলাগণ ধান দূর্বা দ্বারা অর্ঘ্য করার পর প্রতিবেশী সধবা মহিলাগণও এতে অংশ গ্রহণ করেন। সন্তানসম্ভবা মহিলাকে অতঃপর তার ইচ্ছে অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য খেতে দেয়া হয়।

৩. অন্নপ্রাশন

সাধারণত শিশু জন্মের ৭-৮ মাস পর তার প্রথম ভাত খাওয়া উপলক্ষে অন্নপ্রাশন আচার পালিত হয়। এতে বাড়ির সকলে বয়োক্রম অনুযায়ী শিশুর মুখে ভাত স্পর্শ করেন। এই স্পর্শ করানোর দিন থেকেই শিশুর আনুষ্ঠানিক ভাত খাওয়া শুরু হয়। ভাত স্পর্শ করার আগে অবশ্য নারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাড়ির বয়োজ্যাষ্ঠ কর্তাব্যক্তি যেমন দাদা বা জ্যাঠারা শিশুর মাথায় ধান দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ করেন। নারায়ণের প্রসাদ খাওয়ানোর মধ্য দিয়েই ভোজনের সূত্রপাত ঘটে। কেবল হিন্দু সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করেন।

৪. মনসাপূজা

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ শেষদিন মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থাবানরা মাটির মূর্তি তৈরি করে এবং অন্যান্যরা ঘটের মাধ্যমে এই পূজা সম্পন্ন করেন। পূজার আগের

www.pathagar.com

দিন পূজারিরা সংযম অর্থাৎ উপবাস করেন। মনসা দেবীর মূর্তি কিনে এনে সেইদিন বা পূজার দিন মূর্তিকে মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। তার আগে শ্রাবণ মাসের এক তারিখ থেকে পরিবারের লোকজন বা ব্রতীগণ মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মপুরাণ পাঠ করেন।

পূজার উপকরণ

সাদাপদ্মফুল মনসা দেবীর প্রিয়ফুল। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে সাদা ভেটফুল। ছোলা, মটর, চানা এবং সব ধরনের ফল নৈবেদ্য হিসেব নিবেদন করা যায়। এছাড়া চিড়া, চাল, সাবুর সঙ্গে দিয়ে চিনি, কলা, মধু, ঘি ও কর্পূর মিশ্রিত করে নৈবদ্য সাজানো হয়। পূজার দিন কোথাও কোথাও পাঠা (পুরুষ ছাগল), কিংবা হাঁস (অবশ্যই পুরুষ) বলির প্রচলন আছে। মনসা পূজার পরের দিন চন্দ্রধরের পূজা করা হয়। চন্দ্রধরের পূজার দিনও অনেকে বলি দেন। এক কোপে গলা কর্তনকে বলি বলে। এক কোপে (ছেদে) বলি না হলে সেটা ফেলে আবারও বলির জন্য পাঠা বা হাঁস নিয়ে আসতে হয়।

পূজার উদ্দেশ্য

মূলত সর্প উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসাকে পূজা করা হয়। সিলেট অঞ্চল পাহাড়-টিলা-হাওর-অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় বহুপূর্ব থেকেই এতদঞ্চলে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ধনী দরিদ্র সকলেই একসময় মনসার পূজা সম্পন্ন করতেন। বর্তমানে অবশ্য সাধারণ মানুষের নিকটই এর আগ্রহ বেশি।

৪. ভোলা ছাড়ান

সচরাচর কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন গ্রামের কিশোর-তরুণ কর্তৃক এই আচার পালন করা হয়।

প্রথমে কলা গাছের ডগা (কলা পাতার মধ্যবর্তী লম্বা শক্ত অংশ) দ্বারা মানুষ তৈরি করে উৎসাহী তরুণ-কিশোররা একে নিয়ে বাড়ির চতুর্দিকে তিনবার ঘুরে আসে। এসময় এরা বলতে থাকে—

ভোলা ছাড় ভুলি ছাড়
বার মাইয়া পিচারি ছাড়।
ভোলা ছাড় ভুলি ছাড়
বার মাইয়া অসুখ ছাড়।

কলাগাছেরই ডগা দ্বারা তৈরি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র দ্বারা এসময় এরা সশব্দে তাল দেয়। এরপর এই মানুষ সদৃশ কলার ডগাকে পুকুরে নিয়ে, পুকুরের মাটিতে পুতে, পুকুর থেকে সামান্য মাটি একটি কোলায় উঠিয়ে, এক নিঃশ্বাসে কোলাটিকে মাথায় তুলে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে। অন্যরা পথিমধ্যে তখন বলতে থাকে-

মাথাত্ করি কিতা নেও?

উত্তর না দিয়ে; শ্বাস বন্ধ রেখে, বাড়ি ফিরে ছেলেরা নতুন শ্বাস নিয়ে বলে-

www.pathagar.com

মশা মাছি বাইর কর
ধানে চালে ঘর ভর।

এভাবে কিছু লম্ফ-ঝম্ফ বা আনন্দ নৃত্যের মধ্য দিয়ে আচারটির সমাপ্তি ঘটে।

৫. আকিকা

কোথাও জন্মের ৩ দিন পর অর্থাৎ চতুর্থ দিন আবার কোথাও জন্মের ৭ দিনের দিন আকিকা অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির বয়োজ্যাষ্ঠ কোনো ব্যক্তি অথবা পিতা-মাতার কেউ এই অনুষ্ঠানে শিশুর নাম রাখেন। সামর্থ্য অনুযায়ী গরু কিংবা খাসি স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে শিশুর জন্য পছন্দ-সই একটি নাম রাখা হয়। জবাইকৃত গরু কিংবা খাসির মাংস ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। দুই ভাগ এলাকার মানুষের জন্য এবং ১ ভাগ নিজের পরিবারের জন্য রাখা হয়ে থাকে। অনেকে ৭ম দিন না করে এ আয়োজন ১১তম দিনে করে থাকেন।

অনেক শিশুর জন্মের ৪০তম দিনে শিশুর মঙ্গলের জন্য চল্লিশ জন মুরব্বিকে দাওয়াত করে খাওয়ান।

৬. গর্ভজান

সাধারণত সন্তান মাতৃগর্ভে থাকার সময়, বিশেষত ষষ্ট মাসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনা এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সন্তানের পিতা-মাতা বা দাদু-দাদিরা পাড়া প্রতিবেশীকে এদিন দাওয়াত করে খাওয়ান। অনেকে এই দিনে পুকুরের মাঝে একটি ডাব ছুড়ে মারেন।

তথ্যদাতা

১. মো. সাজ্জাদুর রহমান, পিতাঃ মৃত-আসাদ্দর আলী, মাতা-আলফাতুন্নেসা, বয়সঃ ২৭, বার্নি, খাগাইল কোম্পানীগঞ্জ
২. মায়া রাণী নাথ ময়না, স্বামীঃ ফনিন্দ্র নাথ, বয়সঃ ৪০ বৎসর, নাথ কলোনি; হাওয়ালদার পাড়া, সিলেট
৩. তনুশ্রী ভট্টাচার্য, পিতা : প্রবোধলাল ভট্টাচার্য, মাতাঃ মন্দিরা ভট্টাচার্য, হাওয়ালদার পাড়া, সিলেট
৪. রেণুবালা চন্দ, পিতা : ঈশ্বর চন্দ, মাতা : বিনোদিনী চন্দ, বিনোদপুর, গৌরীপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট
৫. সন্ধ্যা রাণী দেবী, পিতা : মতিলাল শীল, মাতা : অবলা রাণী শীল, ৫৯ বৎসর, নাথ কলোনী, ফেঞ্চুগঞ্জ
৬. দানেশ সাংমা, মাতাঃ বড়জিনি সাংমা, পিতাঃ মৃতঃ মনোবি মারাৎ, নয়া সড়ক, সিলেট।
৭. শিপ্রা রাণী নাথ, স্বামীঃ সঞ্জয় কুমার নাথ, শেখঘাট, সিলেট
৮. বিশ্বেশ্বর গোস্বামী, পিতা : বিমল কৃষ্ণ গোস্বামী, বয়সঃ ৪৩ বৎসর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

www.pathagar.com

৯. অর্পণা রাণী দাস, স্বামীঃ কানাই লাল দাস, বয়সঃ ৭০ বৎসর, গোলাপগঞ্জ
১০. সুস্মিতা চৌধুরী, পিতাঃ সুদীপ চৌধুরী, বয়সঃ ২২ বৎসর, বিয়ানী বাজার, সিলেট
১১. শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পিতাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতাঃ ভুবনেশ্বরী দেবী, বয়সঃ ৬৮ বৎসর, সিলেট সদর
১২. প্রবীর দেবনাথ, পিতাঃ প্রফুল্ল দেবনাথ, মাতাঃ শৈবালিনী দেবী, বয়সঃ ৫৮, শাগপরান গেইট, খাদিম
১৩. মোছা. শাহীনা আক্তার, স্বামীঃ সালেহ আহমদ, বয়সঃ ৩৫, কানাইঘাট
১৪. সিরাজুন বেগম, স্বামীঃ আহমদ হোসেন, বয়সঃ ৬০, গাছবাড়ী, কানাইঘাট

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় সিলেটেও নানা ধরনের পিঠা, মিষ্টি এবং তরকারি তৈরি করা হয়। তবে এর অনেকগুলোই অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ব্যতিক্রম। ডালের পিঠা, আলুর পিঠা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পাতি-লাউ, চাল-কুমড়া, মাগুর মাছের ঝোল, মুসরি ডাল প্রভৃতি তৈরিতে এই ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এমনকি এখানকার হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের পিঠা-তরকারির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে সিলেটের সকল উপজেলাতে প্রচলিত কিছু খাদ্য সামগ্রির নাম ও এর প্রস্তুত প্রযুক্তি উপস্থাপন করা হলো।

১. আলুর পিঠা

উপকরণ

আধাকেজি, চিনি: আধাকেজি, দারুচিনি: ২৫০ গ্রাম, তেল: আধালিটার, তেজপাতা: ৫টি।

প্রস্তুত প্রণালী

আলু সিদ্ধ করে ভাল করে মথতে হবে। তারপর এরমধ্যে ময়দা দিয়ে গোল গোল করে লাড্ডুর মত করে বানাতে হবে। কড়াইয়ে তেল দিয়ে লাড্ডু গুলো ভাজা প্রয়োজন। এরপর চিনির শিরা তৈরি করে, তেজপাতা দিয়ে লাড্ডু গুলো ছাড়তে হবে। চুলার উপর থাকা গরম শিরার মধ্যে দারচিনি গুড়া দিয়ে, লাড্ডু গুলো এর মধ্যে ছেড়ে দিলেই তৈরি হয়ে গেল গরম গরম আলুর পিঠা।

২. চন্দন কাঠ পিঠা

অতি অল্প খরচে পিঠা তৈরি করা যায়।

১০ জন মানুষের জন্য যদি এই পিঠা প্রস্তুত করতে হয়, তবে লাগবে-

দুধ: ১ লিটার, চিনি: আধাকেজি, নারিকেল: ১টা, কিসমিস: ২ চামচ, কাজুবাদাম: ১চামচ, তেজপাতা : ৪টা, ঘি: আধাকাপ, চিনি আতপচাল : ১ পোয়া

প্রস্তুত প্রণালী

চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে দুধ, তেজপাতা, এলাচ দিয়ে ঘন করে জ্বাল দেয়া প্রয়োজন। এরপর চিনি আতপচাল ধুয়ে অন্য একটি পাত্রে পানি ঝড়িয়ে রাখতে হবে। পানি ঝড়ে গেলে শিল পাটায় আতপচাল অর্ধবাটা করে বাটার প্রয়োজন পড়ে। এরপর দুধের মধ্যে অর্ধ বাটা চাল ছেড়ে দিয়ে নাড়তে হবে। দুধ এবং চাল ঘন হয়ে আসলে এরমধ্যে চিনি ও নারিকেল কুড়া দিয়ে নাড়া দরকার। সম্পূর্ণ ঘন হয়ে আসলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। এরপর এরমধ্যে ঢালতে হবে ঘি। একটি থালে ঘি মাখিয়ে মিশ্রণটি ঢেলে দিয়ে

www.pathagar.com

কিসমিস ও কাজু বাদাম দিয়ে চাকু দিয়ে বরফি বরফি করে কাটলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু চন্দনকাঠ পিঠা।

৩. ডালের পিঠা

উপকরণ : ডাল: আধাকেজি, চিনি: আধাকেজি, তেল: ৩কাপ, তেজপাতা: ৫টি, এলাচ: ৬টি, ময়দা পরিমাণ মত, যাতে ময়দা মিশানোর পরে ডাল শক্ত হয়ে না যায়।

প্রস্তুতপ্রণালী

প্রস্তুতকারক প্রথমে ডাল সিদ্ধ করে বাটেন। এরপর ডালের মধ্যে ময়দা মিশিয়ে কাই তৈরি করেন। কাই দিয়ে এরপর তিনি গোল গোল করে চাক বানাতে থাকেন। চাকগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে ভাজা প্রয়োজন। চিনির শিরা তৈরি করে তেজপাতা, এলাচ গুড়া দিয়ে ডালের ভাজা চাক গুলো এরপর এই শিরায় ছেড়ে দেয়া হয়।

বাস্, তৈরি হয়ে গেল মজাদার ডালের পিঠা।

৪. চালের পিঠা

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে চালকে ভাল করে গুড়ো করা প্রয়োজন। এরপর একে গরম পানিতে মিশিয়ে নরম *কাই* বানাতে হয়। একটি কড়াইয়ে প্রয়োজন মতো তেল গরম করে, চালের গুড়ো দ্বারা বানানো টুকরো টুকরো গুল্লি এতে ছেড়ে দিলে চালের পিঠা তৈরি হয়। কড়াইয়ে তেল এমন পরিমাণ থাকবে, যাতে পিঠা গুলো ভেসে থাকতে পারে। ৩-৪ মিনিট পরই পিঠা কড়াই থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে, নয়তো পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই পিঠাকে অনেকে তেলের পিঠা বলে।

৫. ধুনি পিঠা

প্রস্তুত প্রণালী

এই পিঠা তৈরিতে প্রথমে চালের গুড়িকে ভাল করে হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে নরম করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে দ্রবণটি এমন হতে হবে যাতে গলে না যায়। এবার নরম চালের গুড়ি হাতের তালুতে নিয়ে তা ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়ে অনেকটা গর্তের মতো করে তার ভেতর গুড়, চিনি দিয়ে ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। এরপর গরম পানিতে ভালভাবে সেদ্ধ করে নিলেই তৈরি হয়ে যায় ধুনি পিঠা। ১০-১২টি পিঠা একসাথে সেদ্ধ হতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় লাগে।

৬. চাল-আলুর পিঠা

প্রস্তুত প্রণালী

এই পিঠার প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা ধুনি পিঠার অনুরূপ। প্রথমে চালের গুড়িকে ভাল করে হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে নরম করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মিশ্রণটি এমন হতে হবে, যাতে গলে না যায়। এরপর প্রস্তুতকারক আলু ও অন্যান্য সবজি ভাল করে মশলায় মিশিয়ে তরকারি তৈরি করেন। পানি মিশ্রিত নরম চালের গুড়ি হাতের তালুতে

www.pathagar.com

নিয়ে ভালভাবে ছড়িয়ে অনেকটা গর্তের মতো তৈরি করা হয়। সবজি বা তরকারি এরপর হাতের তালুতে রাখা চালের গুড়োর গর্তে রেখে এমনভাবে মুড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে তা বেরিয়ে আসতে না পারে। এরপর গরম পানিতে ভালভাবে সেদ্ধ করে নিলেই তৈরি হয়ে যায় চাল-আলুর পিঠা। এই পিঠারও ১০-১২ টি একসাথে সেদ্ধ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে।

৭. মালপা

উপকরণ : চালের গুড়া, ময়দা, চিনি/গুড়, সোয়াবিন তেল ।

প্রস্তুত প্রণালী

চালের গুড়া, ময়দা, চিনি, গুড় পানিতে ভালোভাবে মাখিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হয়। গরম কড়াইয়ে আন্দাজ মতো তেল গরম করে মিশ্রণকৃত মণ্ড গরম তেলে ভেজে নিলে তৈরি হয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী মালপা পিঠা।

৮. বকফুল

উপকরণ

দুই কেজি ময়দা বা চালের গুড়া, এককেজি গুড় বা আধাকেজি চিনি, একটি কোড়ানো নারিকেল, এক লিটার সোয়াবিন তেল।

প্রস্তুত প্রণালী .

প্রথমে কোড়ানো নারিকেল; গুড় বা চিনির সাথে মাখিয়ে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন। পরে ময়দা বা চালের গুড়া পরিমাণ মতো নিয়ে তার সাথে পানি মিশিয়ে মণ্ড বা কাই তৈরি করতে হবে। মণ্ড থেকে পরে ছোট ছোট রুটি তৈরি করা হয়। প্রস্তুতকারক এই রুটির ভেতর, মাখানো গুড়-নারিকেল ঢুকিয়ে হাত দিয়ে বকফুল আকৃতির পিঠা তৈরি করেন। তবে ইদানিং বাজারে বিভিন্ন আকৃতির সাজ (ফর্মা) কিনতে পাওয়া যায়। পিঠা শিল্পিরা পিঠাকে বকফুল আকৃতি দেয়ার জন্য ওইগুলিই ব্যবহার করেন। কাঁচা বকফুল গুলিকে গরম তেলের কড়াইতে ভাজা হয়। পিঠার আকার লাল হয়ে গেলেই নামিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

৯. চোঙ্গা পিঠা

চোঙ্গার ভিতর ঢুকিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে বাঁশের চোঙার ভেতর বিরইন (বিন্নি ধানের চাল) চাল, গুড় দিয়ে মেখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রস্তুতকারক এটিকে আগুনে পোড়ান। পোড়ানো বাঁশ থেকে পরে পিঠা বের করা হয়। এ পিঠা দেখতে বাঁশের মতো লম্বা হয়ে থাকে। প্রয়োজন মতো কেটে অবশ্য একে ছোটও করা যায়। দুধের মধ্যে অনেকক্ষণ রেখে পরিবেশন করা

www.pathagar.com

হয়। কেউ কেউ মাছের ভাজার সাথেও চোঙ্গা পিঠা পরিবেশন করে থাকেন। এ নিয়ে একটি ছড়া আছে এরকম :

চোঙ্গা পোড়া (পিঠা) মিষ্টি-ঝাল
খাইতেনিরে নন্দলাল।

১০. আলুর জাম

উপকরণ : আলু: ৭-৮টি মাঝারি, চিনি: ২৫০ গ্রাম, কালিজিরা: পরিমাণমত, লবণ: আন্দাজ মতো, তেল ও ময়দা: ২ চা-চামচ, চালের গুড়া: ১ কাপ।

প্রণালী

প্রথমে আলু ধুয়ে সিদ্ধ করা প্রয়োজন। এরপর এক চিমটি লবণ ও সামান্য কালাজিরা সিদ্ধ আলুর সাথে ভালবাবে চটকে, দুই চা চামচ ময়দা দিয়ে ভালোভাবে মাখতে হবে। প্রস্তুতকারক এরপর মাখানো ময়দা দিয়ে জাম আকৃতির ছোট ছোট গুলি তৈরি করেন। সবশেষে চালের গুড়াতে জাম গুলো গড়িয়ে নিয়ে ডুবো তেলে ভাজা হয়।

সিরা তৈরি

২.৫ কাপ পানিতে ২৫০ গ্রাম চিনি দিয়ে মৃদু আঁচে জাল দিতে হবে। আঠা ধরে এলে আগে ভেজে রাখা জাম গুলো দিয়ে দিতে হবে। ঘন্টাদুয়েক পর পরিবেশন করলে সুস্বাদু হয়।

১১. মুগের বরফি

উপকরণ : মুগ ডাল: ২৫০ গ্রাম, চিনি: ২৫০ গ্রাম, কালিজিরা: পরিমাণ মত, ঘি: আন্দাজমত, তেল ও ময়দা: ১কাপ

প্রণালী

প্রথমে মুগডাল সিদ্ধ করে বেটে নিতে হবে। তারপর এতে ঘি, কালিজিরা ও ময়দা মাখা প্রয়োজন। মিশ্রণকে রুটির মত বেলে নিতে হবে। এরপর বরফির আকারে কেটে নিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিলে তৈরি হয়ে যাবে মুগের বরফি।

সিরা তৈরি

২/১ কাপ পানিতে ২৫০ গ্রাম চিনি দিয়ে মৃদু আঁচে জ্বাল দিতে হবে। আঠা ধরে এলে আগে ভেজে রাখা বরফি গুলো ওতে ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। ঘণ্টা দুয়েক এভাবেই রেখে দিতে হবে।

সিলেটে প্রচলিত অন্যান্য সুস্বাদু পিঠার মধ্যে রয়েছে -অলোঝলো, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, নারকেলের তকতি, পাটিচেপ্টা, লুচি প্রভৃতি। নারকেল, মুড়ি, চিড়া এবং খৈ -এর তৈরি নানা ধরনের লাড়ু বা নাড্ডু এবং দুধের তৈরি বিভিন্ন ধরনের সন্দেশও অবশ্য অছে এগুলোর সাথে। এসব পিঠা সচরাচর হিন্দু সম্প্রদায় পৌষ মাসের সংক্রান্তি ও লক্ষ্মী পূজার সময় তৈরি করেন।

www.pathagar.com

১২. হাতকরার চুকা (টক্) বা খাট্টা (সাতকরার টক)

পরিচিতি

সিলেটের সাতকরা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ফল। দেখতে বাতাবি নেবুর মতো এই ফল সিলেটবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে অতি প্রিয়। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে হাতকরা। শুধু সাতকরা দিয়ে তৈরি খাবারকে বলে হাতকরার চুকা বা খাট্টা। বিভিন্ন তরকারিতে সাতকরা ব্যবহার করা হলেও শুধু সাতকরা দিয়ে যে তরকারি করা হয় সেটাকে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী তরকারি বলা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে সাতকরাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে। কড়াই গরম হলে তেল, রসুন, হলুদ, লবণ সাতকরার সঙ্গে একসাথে ঢেলে দিতে হয়। তার পর একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে অল্প সময় চুলার উপর রাখলেই তৈরি হয় খাট্টা।

১৩. আলুর দম

উপকরণ : ৫-৬ টি আলু, শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ, পাঁচফোড়ন, গরম মশলা, ঘি অথবা তেল, তেজপাতা, আদা, লবণ এবং হলুদ,মরিচ ও জিরার গুড়া।

প্রস্তুত প্রণালী

শুরুতে আলু সিদ্ধ দেওয়ার পর আলু টিপে রেখে দিতে হবে। কড়াইতে ঘি অথবা তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ, তেজপাতা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে হয় ।

এগুলো ভাজা হয়ে গেলে হলুদের গুড়াঁ, মরিচের গুড়াঁ, আদা, লবণ মিশ্রণের উপর ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপর এগুলো ভাজা হয়ে গেলে সিদ্ধ আলু এগুলোর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে । এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নামিয়ে ফেলা দরকার। নামিয়ে ফেলার পর আলুর দমে কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দেওয়া যায় ।

১৪. নারিকেল ইলিশের ঝোল

উপকরণ : পাঁচ জনের জন্য তৈরি করতে যা লাগে তা হল–

অর্ধেক নারিকেল, ১ টি ইলিশ (মাঝারি), ধনিয়ার গুড়া – চা চামচে ১ চামচ, মরিচের গুড়া – ৩ চামচ, হলুদের গুড়া – দেড় চামচ, পেঁয়াজ – ৩ বা ৪ বাটি (বড় আকৃতির), লবণ – ৩ চা চামচ, তৈল – (সয়াবিন) ১০০/১৫০ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ইলিশ মাছকে পরিমাণমত টুকরো করে ভাল করে ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। তারপর নারিকেল অতি ছোট করে কুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর চুলার উপর তৈল মিশ্রিত গরম কড়াইয়ে মাছ ছেড়ে দিলে ১৫-২০ মিনিট পর তা ভাজি হয়ে যায়। মাছ ভাজি হয়ে গেলে নারিকেল ও অন্যান্য মশলা, লবণ, পেঁয়াজ কড়াইয়ে ছেড়ে প্রয়োজনমত পানি

www.pathagar.com

দিতে হয়। যদি ঝোল বেশি রাখার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে পানি এবং মশলা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। বিশ মিনিট পরই তৈরি হয়ে যায় ইলিশ নারিকেল ঝোল।

সতর্কতা

পরিবেশনের সময় ইলিশ মাছগুলো কড়াই থেকে অতি সাবধানে তুলতে হয়। তা না হলে ইলিশ মাছ ভেঙ্গে যেতে পারে।

১৫. থুনিমানকুনির (থানকুনির) ভর্তা

৩-৪ জনের জন্য থুনিমানকুনির ভর্তা তৈরি করতে প্রয়োজন : থুনিমানকুনি পাতা – আন্দাজমতো, লবণ – দেড় চামচ, পেঁয়াজ ৪/৫ টি, রসুন ১ টি

প্রস্তুত প্রণালী

সাধারণত পাটা পোতায় থুনিমানকুনি পাতা নিয়ে তার সাথে পেঁয়াজ ও রসুন এক সাথে মিশিয়ে পিষা হয়। লবণ মিশিয়ে পুনরায় ভালোভাবে পিষলে ভর্তা তৈরি হয়ে যায়।

১৬. ডুমোর তরকারি

৭-৮ জনের জন্য এ তরকারি তৈরিতে প্রয়োজন : ডুমোর-৫-৬ টি, ইচা মাছ (চিংড়ি) – আন্দাজমতো, লবণ – চা চামচে ৪/৫ চামচ, মরিচ – ৫০-১০০ গ্রাম, হলুদ – এক বা দেড় চামচ, ধনিয়া – এক বা দেড় চামচ, তেল – ৫০ গ্রাম বা তার বেশি।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রস্তুতকারক প্রথমে ছোট চিংড়ি মাছকে ভাল করে ধুয়ে তা চুলায় বসানো তৈল মিশ্রিত পাত্রে ঢেলে দেন। ১০-১৫ মিনিটে মাছ ভাজি হয়ে গেলে ডুমোর কচি কচি করে কেটে তার সাথে লবণ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, মাখিয়ে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে চুলার উপরের পাত্রে ছাড়েন। তারপর ভাল করে মাছের সাথে ডুমোর নাড়া-চাড়া করে দেওয়ার পর ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে নামিয়ে দেন। এভাবে তৈরি হয়ে যায় ডুমোর তরকারি।

১৭. বাঁধাকপি

উপকরণ

বাঁধাকপি- ১ কেজি পরিমাপের ১টা, আলু- ২৫০ গ্রাম, হলুদ -১ চামচ, জিরাবাটা- ৩ চামচ, ঝালবাটা-১ চামচ, ঘি- ১চামচ, দারচিনি- ৫/৬টি, গরম মসলা, বাটা- ১/২ চামচ, লবণ-পরিমাণমত

প্রস্তুত প্রণালী

বাঁধাকপি ও আলু কেটে নিতে হবে। বাঁধাকপি কাটতে হবে খুব কুচিকুচি করে, আলু কাটতে হবে টুকরা টুকরা করে। তারপর তেলের মধ্যে আলুর টুকরা গুলো ভেজে আলাদা পাত্রে রাখা প্রয়োজন। কড়াইয়ের মধ্যে জিরা, তেজপাতা পূরণ দিয়ে এরপর

www.pathagar.com

বাঁধাকপিকে, হলুদ লবণ দিয়ে ভাজতে হবে। এরপর জিরাবাটা, আদাবাটা দিয়ে নাড়া দরকার। অর্থাৎ কষানো প্রয়োজন। তারপর ভাজাআলু গুলি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং গরম জল দিতে হবে। জল শুকিয়ে গেলে মিশ্রণের মধ্যে ঘি, গরম মসলা এবং সামান্য চিনি দিয়ে নাড়লে তৈরি হবে সিলেটি বাঁধাকপি তরকারি।

১৮. তরমুজের খোলা ভাজা

উপকরণ

কুচিকুচি করে কাটা তরমুজের খোলার সাদা অংশ আধাবাটি। তেল- ১কাপ, কালিজিরা ১/২ চামচ, শুকনা মরিচ-৪টা, লবণ-উপর্যুক্ত উপাদানের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। চিনি উপর্যুক্ত উপাদানের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। গরম জলে কুচি করা খোলা ছেড়ে দিয়ে চিপে নিতে হবে। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে কালি-জিরা পুরণ দিতে হবে। তেলের মধ্যে শুকনা মরিচ লাল করে ভেজে-নেয়া প্রয়োজন। ভাজা হয়ে গেলে তেলের মধ্যে কুচি কুচি করা তরমুজের খোলা ছেড়ে দিয়ে হলুদ লবণ, শুকনা মরিচ দিতে হবে। নামানোর আগে চিনি দিয়ে মাখালে প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

১৯. করলার শুকতো

উপকরণ

করলা- আধা কেজি, বেগুন-১পোয়া, হলুদ-১চামচ, পাঁচপুরণ-১চিমটি, শুকনা মরিচ-৩/৪টি, আদাবাটা -১চামচ, লবন- পরিমাণ মত, চিনি- ১ চামচ

প্রস্তুতপ্রণালী

প্রথমে কড়াইয়ে তেল দিয়ে তার মধ্যে শুকনামরিচ ও পাঁচপূরণ দিতে হবে। তারপর এরমধ্যে করলা ও বেগুন ছাড়া প্রয়োজন। বেগুন ও করলাগুলো ছোট ছোট করে কেটে হলুদ ও লবণ দিয়ে আগে কসাতে হবে। এরপর সামান্য জল দিয়ে মিশ্রণটিকে ঢেকে দেয়া প্রয়োজন। নামানোর আগে চিনি ও আদা-বাটা মিশিয়ে নাড়তে হবে।

২০. পুঁই পাতার বড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে পুঁইপাতা গুলি কুচি কুচি করে কাটতে হবে। পরে এরমধ্যে হলুদ, লবণ, ময়দা ও সামান্য চালের গুড়ি দিয়ে মাখাতে হবে। মিশ্রণটি এরপর চুলার উপর গরম তেলের মধ্যে দিলে, ছোট ছোট বড়া তৈরি হয়ে যাবে। কেউ কেউ বিকালে নাস্তার সময় চায়ের সঙ্গে এ ধরনের বড়া আহার করেন।

২১. আলু ডিম বড়া

উপকরণ

আলু ৪টি, ডিম ২টি, লবণ, হলুদগুড়ো, জিরা বাটা, আদাবাটা, তেজপাতা, পেঁয়াজ বাটা, কাচামরিচ, গরম মসলা ও আটা আন্দাজ মত।

www.pathagar.com

১মপর্ব

আলু সিদ্ধ করে তার মধ্যে ভাঙা ডিম ছেড়ে ভাল ভাবে মাখতে হবে। তারপর এর মধ্যে হলুদ, মরিচ এবং লবণ মেশাতে হবে। সামান্য আটা দিয়ে মিশ্রণকে আবার মাখানো প্রয়োজন। মিশ্রণকে এখন গরম তেলে ছেড়ে বড়া করতে হবে।

২য় পর্ব

একটি কড়াইয়ে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে, একটা তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি তার মধ্যে ছেড়ে, আগুনে খানিকটা ভেজে তার মধ্যে জিরা বাটা, হলুদ, মরিচ গুড়া, আদা বাটা দিয়ে উত্তম রূপে ভাজতে হবে। সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে এরপর একে জাল ওঠা পর্যন্ত গরম করা আবশ্যক। এরপর মিশ্রণটিতে পিঁয়াজ বাটা দিতে হবে এবং তারপর এর মধ্যে ১ম পর্বে করা আলু ডিম বড়াগুলো ছাড়তে হবে।

আর একটু জাল উঠলেই তৈরি হয়ে যাবে আলু ডিম বড়ার তরকারি।

২২. কচু পাতার বড়া

প্রস্তুতপ্রণালী

কচু পাতা প্রথমে কুচি কুচি করে কাটতে হবে। এরপর এরমধ্যে হলুদ, লবণ, কুচানো কাঁচামরিচ, কুড়ানো নারিকেল ও সামান্য চিনি, চালের গুড়া মাখিয়ে ডুবন্ত তেলে বড়ার আকৃতি করে ভাজতে হবে। তৈরি হয়ে গেল গরম গরম কচু কচু পাতার বড়া।

২৩. আলু মাছের ভর্তা

প্রস্তুতপ্রণালী : কর্তিত রুই মাছ ৬ টুকরো, আলু-আধা টুকরো, পেঁয়াজ কুচানো-আধাবাটি, রসুন কুচানো-১চামচ, লবণ-পরিমাণমতো, তেল-১কাপ, শুকানো মরিচ-৫টা, হলুদ - ৫ চামচ

তৈরি পদ্ধতি

প্রস্তুতকারক প্রথমে মাছ সিদ্ধ করে কাটা ছাড়িয়ে নেন। পরে তা ভেজে একটি বাটিতে রাখেন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে এরপর তিনি শুকনা মরিচ ভাজেন। তেলের মধ্যে পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে এরপর তিনি লাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। পেঁয়াজ ও রসুন লাল হয়ে গেলে আলু সিদ্ধ ভর্তা তার মধ্যে দিয়ে হলুদ ও লবণ দেয়া প্রয়োজন। তারপর তার মধ্যে সিদ্ধ করা মাছ মিশিয়ে ভেজে নামাতে হবে। শুকনা মরিচ ভাজা দিয়ে ভর্তাটা মাখিয়ে পরিবেশন করলে সুস্বাদু হয়। এই তরকারি রুই মাছ, বোয়াল মাছ, ইলিশ মাছ, লাটি (টাকি) মাছ দিয়ে তৈরি করা যায়।

২৪. শুটকি ভর্তা

উপকরণ : ছোট-ছোট মলা মাছ, চ্যাপা শুটকি, কাচামরিচ- ৮/১০টি, পেঁয়াজকুচি- ১ কাপ, ধনিয়া পাতা -প্রয়োজনমত, লবণ- পরিমাণমত, কলাপাতা- ৪টা।

www.pathagar.com

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোটমাছ ও শুটকি, পেয়াজ-কাঁচামরিচ-লবণ-ধনিয়াপাতার সাথে মিশাতে হবে। মেশানো উপকরণ গুলো এরপর কলাপাতার মধ্যে রেখে মুড়ে দেয়া প্রয়োজন। তাওয়ার উপর রেখে এরপর মিশ্রণটিকে এপিঠ ওপিঠ সেঁকতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে তাওয়া থেকে কলাপাতা মুড়ানোকে উঠাতে হবে। এটাই শুটকি ভর্তা।

২৫. হাঁস-বাঁশের মাংস

হাঁস বাঁশের মাংস তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে সাধারণত বাঁশ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। বাঁশ গাছ জন্ম নেয়ার ১-২ মাস পর তা একটি পাতিল দিয়ে ঢেকে দিলে ১৫-২০ দিন পর নতুন বাঁশটি পাতিলের মতো গোলাকৃতি ধারণ করে। একে বাঁশের করুল বলে। এই করুল কেটে নিয়ে আসতে হবে। হাঁস বাঁশের মাংস তৈরির জন্য উপাদান : ১টি হাঁস, ১টি বাঁশের করুল, ধরিয়ার গুড়া– ৩ চা চামচ, হলুদের গুড়া– ৪ চা চামচ, মরিচের গুড়া– ৬ চা চামচ, জিরা– ১৫০ গ্রাম, দারুচিনি– ৫০ গ্রাম, লবণ– ৫ চা চামচ, তৈল সয়াবিন– ২০০ গ্রাম, রসুন– ২-৩ টি, পেঁয়াজ– ৫-৬ টি

তৈরির পদ্ধতি

প্রথমে বাঁশের করুলকে খণ্ড খণ্ড করে টুকরো করা হয়। তারপর তৈল মিশ্রিত গরম পাত্রে হাঁসের মাংস ভাল করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। সাধারণত চুলায় বসানোর আধ ঘণ্টা পরই মাংস সেদ্ধ হয়ে যায়। সেদ্ধ মাংসে বাঁশের করুলের টুকরো ছেড়ে দেয়ার ১৫-২০ মিনিট পর সকল মশলার গুড়া, লবণ, রসুন, পেঁয়াজ, দারুচিনি প্রভৃতি মিশিয়ে ভালভাবে নাড়া-চাড়া করে দিতে হবে। এর প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে হাঁস-বাঁশের মাংস।

২৬. চিংড়ি সিদ্ধ

তৈরি পদ্ধতি

প্রথমে চিংড়ি মাছকে ভালভাবে ধূয়ে পরিষ্কারের অংশ হিসেবে মাছের উপরের শক্ত আবরণ ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলতে হবে। এরপর পরিষ্কার চিংড়িকে সরিষার তেলে মাখিয়ে কলাপাতায় ভাল করে মুড়িয়ে তা একটি বাটিতে নিতে হয়। সদ্য রান্না করা একটি ভাতের পাত্রের (ডেগের) উপরের ভাত সরিয়ে চিংড়ির বাটিটিকে এরপর পাত্রের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে পূর্বের মতো ভাত দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর ত্রিশ মিনিট পরই চিংড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। পূর্বের গরম ভাত সরিয়ে বাটিটিকে নিয়ে আসতে হবে।

২৭. লাউ-বড়ই টক

উপকরণ

৭-৮ জনের এই টক তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি মাঝারি আকৃতির লাউ, বড়ই- ১০-১৫টি, মেথি–৫০ গ্রাম, ধরিয়ার গুড়া–দেড় চা চামচ, হলুদের গুড়া–৩ চা চামচ,

www.pathagar.com

মরিচের গুড়া–৩ চা চামচ, লবণ–৩-৪ চা চামচ, মরিচের গুড়ার পরিবর্তে কাঁচা মরিচ দেয়া যেতে পারে, এক্ষেত্রে ৪-৫টি কাঁচা মরিচ দিতে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে লাউকে পরিমাণমত কেটে নিতে হবে। তারপর গরম পানিতে সেদ্ধ করার পর তাতে শুকনো বড়ই ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। বড়ই ছাড়ার ১০ মিনিট পরে মেথি, ধনিয়া, লবণ, মরিচ প্রভৃতি লাউ ও বড়ইয়ের সাথে ভাল করে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর প্রায় ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় লাউ-বড়ই টক।

২৮. জারুল ভর্তা

প্রথমে জারুল কুচি কুচি করে কেটে নিতে হয়। তারপর তা লবণ মরিচ ও চিনি (পরিমাণমত) দিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে নিলেই ভর্তা হয়ে যায়।

জারুল কুচি কুচি করে কেটে তা ভাল করে পিষে (পাটা-পোতায়) পরিমাণমত লবণ, মরিচ ও চিনি দিয়ে মাখিয়েও এই ভর্তা তৈরি করা যায়।এক্ষেত্রে লবণ মরিচ ও চিনি কতটুকু লাগবে তা নির্ভর করে ভর্তার পরিমাণের উপর। প্রয়োজনে যিনি ভর্তা তৈরি করেন তিনি ভর্তা তৈরির পর এ স্বাদ দেখে নিতে পারেন এবং কোন কিছু কম হলে বাড়িয়ে দিতে হবে।

২৯. কুচিলা পাতার বড়া

কুচিলার পাতার বড়া তৈরির জন্য প্রথমে আধঘন্টা আগে ভেজানো আতপ চাউল ভাল করে পিষে নিতে হবে। তারপর চাউলের গুড়ায় পরিমাণমত লবণ, মরিচের গুড়া, হলুদ মিশিয়ে পানি দিয়ে গুড়াকে খানিকটা পাতলা করে নিতে হয়। তারপর ১/২টি করে কুচিলার পাতা নিয়ে তা মশলা মেশানো চাউলের গুড়ায় ভাল করে মাখিয়ে তৈল মিশ্রিত পাত্রে দিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যায় কুচিলা পাতার বড়া।

৩০. ইলিশ শুটকির বড়া

সাধারণত ইলিশ শুটকির বড়া তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ– ইলিশ শুটকি, কুমড়ো পাতা, মরিচ/কাঁচা বা গুড়া, পেঁয়াজ, লবণ

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে কুমড়ো পাতাকে ভাল ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এবং পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। এরপর পেঁয়াজ, মরিচ লবণ ও ইলিশ শুটকি একসাথে ভাল করে মাখিয়ে তা প্রথমে একটি কুমড়ো পাতায় রেখে, পরে আরেকটি কুমড়ো পাতা দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে, যাতে মশলা বা শুটকি পড়ে না যায়। মুড়ানোর পর তেল সমেত কড়াই চুলায় বসিয়ে তাতে বড়া ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। ১০-১২ মিনিট বড়া উল্টেপাল্টে ভাজলেই ইলিশ শুটকির বড়া তৈরি হয়।

www.pathagar.com

৩১. পাম রুটি

এই রুটির তৈরি পদ্ধতি অন্যান্য রুটির মতোই।

৪ বা ৫ টি রুটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ : ময়দা ০.৫ কেজি বা তার কিছু কম, গুড় ১৫০ গ্রাম, চিনি ৩/৪ চামচ, নারিকেল প্রয়োজনমত, গাজর ১/২ টি, লবণ দেড় চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ময়দার সঙ্গে ভাল করে গরম পানি মিশিয়ে নরম কাই তৈরি করা হয়। এরপর তার সাথে গুড়, চিনি, নারিকেল, গাজর, লবণ উত্তমরূপে ডলতে হয়। ময়দার কাই তৈরির পর গরম পাত্রে (তৈল মিশ্রিত বা ছাড়া) তা ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যায় পাম রুটি।

সতর্কতা : গরম পাত্রে ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন পুড়ে না যায়। পুড়লে এর স্বাদ নষ্ট হয়।

৩২. চা-পাতা ভর্তা

প্রস্তুত প্রণালী

চা-পাতা ভর্তা তৈরির জন্য প্রথমে চায়ের কয়েকটি অতি কঁচি পাতা (সবুজ) নিয়ে ভাল করে পিষতে হয়। তারপর পেঁয়াজ, লবণ, মরিচ প্রয়োজনমত দিয়ে পুনরায় ভাল করে পিষে নিলেই তৈরি হয়ে যায় চা পাতা ভর্তা। এ ভর্তা অবশ্য খুব কম প্রচলিত।

৩৩. ভুনা খিচুড়ি-১

উপকরণ

আতপ চাল, মসুরি ডাল, আদা, রসুন, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ গুড়াঁ, শুকনা মরিচ, গরম মসলা, লবণ ও পরিমাণ মতো পানি।

প্রস্তুত প্রণালী

চাল-ডাল ধুয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পানি ঝড়াতে দিতে হবে। এরপর পেঁয়াজ ও শুকনা মরিচ ছাড়া বাকি সব উপকরণ একটি সসপ্যান বা কড়াইয়ে ঢেলে ভালো করে সেদ্ধ করে নেয়া প্রয়োজন। খিচুড়িতে পরিমাণ মতো পানি ঢেলে দিয়ে এবং একটু নাড়াচাড়া করলে সুস্বাদু ভুনা খিচুড়ি পাওয়া যায়।

ভুনাখিচুড়ি-২

উপকরণ- চাল ১ কেজি, ডাল- আদাকেজি, লবণ-১ চামচ, হলুদ-৫চামচ, তেল-২কাপ, জিরা- ৪ চামচ, তেজপাতা- ৪টি, কিসমিস-২ চামচ, এলাচ-৪/৫টি, ঘি-৩ চামচ।

প্রস্তুতপ্রণালী

চাল ধূয়ে ভেজে রাখতে হবে এবং মুগডাল ভেজে ধুয়ে আলাদা পাত্রে রাখতে হবে। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে তেল ঢেলে জিরা তেজপাতা পূরণ দেয়া প্রয়োজন। চাল, ডাল

www.pathagar.com

ছেড়ে দিয়ে হলুদ, লবণ, জিরা বাটা, আদা বাটা দিয়ে মিশ্রণটি ভাজতে হবে। পরিমাণমত গরম জল এর মধ্যে দিয়ে মিশ্রণটি এরপর ঢেকে দিতে হবে। চাল, ডাল, সিদ্ধ হয়ে গেলে তারমধ্যে কিসমিস, দারচিনি, ঘি এবং সামান্য চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামাতে হবে। নামানোর আগে কাঁচামরিচ বিছিয়ে দেয়া আবশ্যক। এভাবেইন তৈরি হয়ে যায় মজাদার ভুনাখিচুরি।

সাবুর (সাগু) খিচুরি

৫ জনের জন্য রান্না করতে প্রয়োজন- আলু : ০.৫ কেজি, গাগু : ০.৫কেজি, যে কোনো একটি সবজি যথা : ফুল কপি, সীম : ০.৫ কেজি, লবণ : ৪ চা-চামচ, ধনে পাতা : ২০০ গ্রাম /ধনিয়ার গুড়া: ০.৫ চা-চামচ, সয়াবিন তেল : ১০০ গ্রাম, কাঁচামরিচ : ৫টি শুকনো বা লঙ্কা মরিচ : ৭টি, হলুদের গুড়া : ৪ চা-চামচ, জিরা : ৫০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে আলু ও সবজির সাথে ধনে পাতা দিয়ে তাকে চুলার উপরে রাখা কড়াইয়ে ঢালতে হবে। কড়াইয়ে আগে থেকেই পরিমাণ মতো তেল দেয়া ছিল। কড়াইয়ে আধা লিটার জল ঢেলে মিশ্রণটি সিদ্ধ করতে হবে। লাকড়ির চুলা হলে ৩০ থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। সিদ্ধ হওয়ার পর জিরা, হলুদের গুড়া, লবণ ও কাঁচা-মরিচ মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। মশলা মেশানোর এক ঘণ্টা আগে ভেজানো সাগু, সবজি মিশ্রণের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ১০ মিনিট নাড়া চাড়া করলেই সাগুর খিচুরি তৈরি হয়ে যাবে।

৩৪. চিড়ার পোলাও

উপকরণ: (৫জনের জন্য), চিড়া- আধাকেজি, চিনি- ১কাপ, কিসমিস-২ চামচ, এলাচ- ৫/৬ টা, তেজপাতা- ৩/৪টা, তেল-১ কাপ, ঘি- ৩ চামচ

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে চিড়া ধূয়ে চিপে জল ছাড়াতে হবে। তারপর চুলায় তেল গরম করে, তার মধ্যে তেজপাতা, আদা, কাঁচামরিচ ছেয়ে এরই মধ্যে ধোয়া চিড়া ঢেলে নাড়তে হবে। মিশ্রণটি ৫মিনিট নাড়াচাড়া করার পর তারমধ্যে ঘি, চিনি, কিসমিস দিয়ে পুনরায় নাড়াচাড়া করলেই পেয়ে যাব চিড়ার পোলাও।

৩৫. সিদ্ধ চালের পোলাও

উপকরণ : সিদ্ধ চাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, আস্তা ছানা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, হলুদ গুঁড়া, লবণ, তেল অথবা ঘি।

প্রণালী

প্রথমে সিদ্ধ চাল ভাজতে হবে। এরপর একসাথে শিমের বিচি, চানা-মটর ভাজতে হয়। একসাথে এগুলো সিদ্ধ দেয়ার পর আদা, রসুন, পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, হলুদ গুঁড়া ও

www.pathagar.com

লবণ দিয়ে একসাথে তেলে ভেজে নেয়া প্রয়োজন।এগুলো ভাজা হয়ে গেলে সিদ্ধ চাল এগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য সিদ্ধ চালের মধ্যে ঘি দেওয়া যেতে পারে। আর এভাবেই তৈরি হয়ে গেল মজাদার লোভনীয় সিদ্ধ চালের পোলাও।

৩৬. পটল পোলাও

উপকরণ : পটল-আধাকেজি, আদাবাটা- ১চামচ, চিকন চাল -আধাকেজি, ঘি-২চামচ, লবন- ২ চামচ, হলুদ- ১ চামচ, কিসমিস+বাদাম+এলাচ- ১চামচ করে, তেল ২ কাপ, তেজপাতা- ৪টা, জিরা- ২ টেবিল চামচ

প্রস্তুতপ্রণালী

প্রথমে তেলে হলুদ, লবণ দিয়ে গোটা পটল ভেজে রাখতে হবে। এরপর সমস্ত চাল ধুয়ে বাতাসে মেলে দেয়া প্রয়োজন। তেলের মধ্যে জিরা-তেজপাতা পূরণ দেয়ার পর, চাল ছেড়ে দিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে লবণ, হলুদ, জিরা বাটা, আদাবাটা দিয়ে নাড়তে হবে। এরপর এরমধ্যে গরম জল দিয়ে তার মধ্যে গোটা ভাজা পটল ছেড়ে,দেয়া প্রয়োজন। চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে নামানোর আগে ঘি, চিনি, কিসমিস, এলাচ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

৩৭. চাটনি

বেলফই (জলপাই)

উপকরণ : গোটা দশেক বেলফই (জলপাই), কাঁচামরিচ, সরিষার তেল, লবন, রসুন, ধনে পাতা, শুকনা গুড়া মরিচ।

তৈরি পদ্ধতি

প্রথমে ৮/১০টা বেলফই শিল-পাটায় ছেঁচে অথবা বটি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। তারপর পেস্ট তৈরি করতে হয়। পরিমাণমত তেল, লবন, রসুন, ধনেপাতা, শুকনা মরিচ দিয়ে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যায় বেলফই চাটনি। কেউ কেউ এতে চিনি অথবা দুধের সরও মেশান ।গ্রীষ্মের দুপরে অনেকেই বেলফই চাটনি আহার করেন।

খ. মণিপুরিদের খাদ্য

পাল্টই

মণিপুরীদের একটি বিশেষ খারারের নাম পাল্টই। সিদল শুটকি ও আলু দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে প্রস্তুতকারক আলু সিদ্ধ করেন। পরে এই সিদ্ধ আলুর বাকল ছিলে টিপে ভর্তা করা হয়। তারপর কাঁচামরিচ সিদ্ধ করেন। প্রস্তুতকারক এরপর সিদল শুটকিকে আগুনে

www.pathagar.com

পুড়িয়ে গুড়া করেন। পরে ল্যাং ল্যাং নামক একধরনের পাতা দিয়ে শুটকি ও আলু-লবণ-কাচামরিচ মেখে পাল্টই তৈরি করেন।

এ খাবারটি বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরিরা খেয়ে থাকেন।

গ. গারোদের তরকারি

মুরগীর মাংস ও চালের গুড়ি দিয়ে মাংস

১০ জনের আহারের জন্য :

১.	মুরগির মাংস	২.৫ কেজি
২.	আতপ চালের গুড়ি	৫০০গ্রাম
৩.	খাবার সোডা	১ চা চামচ
৪.	কাঁচা মরিচ (পেসা/ ফালি করে কাটা)	১০০ গ্রাম
৫.	পানি	১.৫ কেজি
৬.	চাল কুমড়ার পাতা ৮/১০ টি	কুচি কুচি করে কাটা
৭.	লবণ	পরিমাণ মতো

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে মাংস, লবণ, কাচা মরিচ ও খাবার সোডা একসাথে মিশিয়ে কড়াইয়ে কসিয়ে মাংসের পানি একটু শুকাতে হবে। মাংসের পানি একটু শুকিয়ে গেলে পানি দেয়া প্রয়োজন। মাংস সিদ্ধ হওয়ার পর চাল কুমড়ার কচিপাতা এর উপর দিতে হবে। তারপর মাংসের ঝোলের উপর চালের গুড়ি ধীরে ধীরে নাড়িয়ে দিতে হবে। যখন চালের গুড়ি মাংসের সাথে একটু ঘন হয়ে আসবে, তখনই তরকারি রান্না সম্পন্ন হবে।

ঘ. মিষ্টিজাত খাদ্য

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র দে জীবিকার উদ্দেশ্যে সিলেট আসেন। তিনি ছিলেন মিষ্টি তৈরির একজন দক্ষ কারিগর। সিলেটে এসে শহরের লন্ডন ম্যানশনের সামনে সীতারাম রেস্টুরেন্টে কাজ নেন। সেখানে দুই বছর কাজ করার পর দাড়িয়া পাড়াস্থ নিজ বাসভবনে মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করেন। বাসার সদস্যদেও দ্বারা রাতে দিনে তৈরি মিষ্টি শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে সরবরাহ করা হতো। বর্তমানে যদিও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের মিষ্টি-প্রতিষ্ঠান সিলেটে তাদের শাখা তৈরি করেছে, তবুও সিলেটের মিষ্টি তৈরির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনামের সাথে এরা কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে গোপাল বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর নিজ সন্তানরা এ ব্যবসা চালাচ্ছেন। সিলেটের বড় বড় অনুষ্ঠান যেমন- বিয়ে, অন্নপ্রাসন, পূজা, শ্রাদ্ধসহ যেকোন অনুষ্ঠানে এ প্রতিষ্ঠান মিষ্টির অর্ডার পেয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত নিমকি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই অন্যান্য মিষ্টি ভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করা হলেও নিমকি সকলেই সচরাচর এই প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করার চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

সিলেটে মোহনলাল মিষ্টিও বিখ্যাত। পূর্বে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বনফুল, স্বাদ, ফুলকলি প্রভৃতি কোম্পানীর আগ্রাসনে স্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত মোহনলাল ঘোষ মহাশয় শতবর্ষ পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিলেন বলে জানা গেছে।

তথ্যদাতা

১. আব্দুল খালেক, পিতা : আব্দুল ফকির, মাতা : ফিরোজা বেগম, পশ্চিম বাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
২. মো. কামাল উদ্দিন, পিতাঃ শামসুল ইসলাম, বয়সঃ ২৭, মহিষখেড়, বড়নগর, গোয়াইন ঘাট
৩. মো. সাজ্জাদুর রহমান, পিতাঃ মৃত-আসাদ্দর আলী, মাতা-আলফাতুন্নেসা, বয়সঃ ২৭, বার্নি, খাগাইল কোম্পানীগঞ্জ
৪. কানাই লাল দাস, পিতাঃ ভরতচন্দ্র দাস, মাতাঃ সৌদামিনী দাস, বয়সঃ ৮৫ বৎসর, গোলাপগঞ্জ
৫. আহমেদ হুসাইন, পিতাঃ রইছ উদ্দিন, মাতাঃ লিলি বেগম, গ্রামঃ নারাইনপুর, কানাইঘাট
৬. রিংকু বৈদ্য, পিতা- মিন্টু কাসার বৈদ্য, পুরানলেইন, সিলেট সদর
৭. সুদর্শন পাল, পিতা-বল্লভচন্দ্র পাল, বয়স- ৫০ বৎসর, দাড়িয়াপাড়া, সিলেট সদর
৮. জয়ন্তী চন্দ, পিতা-দীনেশচন্দ, মাতা-মালতী রাণী চন্দ, তুফান বাজার, বিশ্বনাথ
৯. জয়ন্তীরানী নাথ, স্বামী-মৃতঃ বোলনাথ, বয়স-৬৩ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
১০. রত্না ভট্টাচার্য, স্বামী-শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বয়স-৬৫ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
১১. বিভা রানী দেবী, পিতাঃ সতীন্দ্র মোহন দেবনাথ, মাতা : প্রমিলা দেবী, নাথ কলোনী, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
১২. রাধিকা দত্ত, পিতাঃ গৌরীরমাহন দত্ত, মাতাঃ ঈশা দত্ত, বয়সঃ ৫০ বৎসর, বালাগঞ্জ সদর
১৩. নীপা চক্রবর্ত্তী, পিতাঃ মন্তোষ চক্রবর্ত্তী, মাতাঃ কল্পনা চক্রবর্ত্তী, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট।
১৪. তন্বী ভৌমিক, পিতাঃ সমরেন্দ্র ভৌমিক, মাতাঃ গীতা দাস, বয়সঃ ২৩ বৎসর, করের পাড়া, সিলেট

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

সিলেট অঞ্চল একসময় গাজির গান, জারি, পালাগান প্রভৃতি লোকনাট্য এবং ধামাইল সহ বিভিন্ন লোকনৃত্যে সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে ধামাইল নৃত্য পরিবেশিত হলেও লোকনাট্য কদাচিৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। গ্রামে-গঞ্জে কখনো কখনো পূর্ণাঙ্গ জারি গানের আসর বসলেও শহরে এধরনের অনুষ্ঠান এখন আর অনুষ্ঠিত হয়-ই না। গাজি গানের গায়কগণ তাই অংশবিশেষ পরিবেশন করেন। গ্রাম থেকে বৎসরে একবার তারা শহরে বের হন এবং কখনো একা একা, আবার কখনো একজন সহযোগী বাদ্যযন্ত্রী সহ বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান শুনিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। গায়ক একা পরিবেশন কালে নিজেই ডবকি বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে গানটিকে আধ্যাত্মিক রূপ দানের জন্য কখনো কখনো তারা সঙ্গে থাকা একটি ত্রিশূল মাটিতে পোতেন এবং গৃহস্থের নিকট থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে তার গোড়ায় ঢেলে সংগীত শুরু করেন। এদের কারো কারো পরিধানে থাকে লম্বা পাঞ্জাবি সদৃশ বাহারি পোশাক। এগুলো আবার বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের টুকরা দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে।

সিলেট শহরের হাওয়ালদার পাড়াস্থ *ভাটি বাংলা* নামক সংগঠন (যা বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত; একটির নাম *ভাটি বাংলা* অগ্রদূত যুবসংঘ) দুর্গা পূজা ও কালী পূজার সময় প্রতি বৎসর সিলেট শহরে ঢপ যাত্রার আয়োজন করে। এতদুপলক্ষে অনেক আগে থেকে তারা প্রস্তুতি বা মহড়া শুরু করেন। এখানে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই সুনামগঞ্জের বিভিন্ন ভাটি অঞ্চলের অধিবাসী। তবে স্থানীয়রাও কখনো কখনো এতে অংশ নেন। ভাটি অঞ্চলের অধিবাসীদের যারা দীর্ঘদিন যাবৎ কর্ম উপলক্ষে শহরে বসবাস করছেন তারাই মূলত এই যাত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন।

ঢপ যাত্রা পরিবেশনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে যাত্রার মতো, তবে সংগীত এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় বেশি। পালার মতো সংগীতের সাহায্যে কাহিনি অগ্রবর্তী হয়। বাদ্য-বাজনা, বন্দনা প্রভৃতি যাত্রার অনুরূপ হয়ে থাকে।

সিলেটে এখন আর কবিগান অনুষ্ঠিত হয় না। কবিগানের বয়োবৃদ্ধ শিল্পি সুচৈতন্য দাস যিনি শহরের করের পাড়ায় বসবাস করেন, তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, শহরে এধরনের গানের প্রতি আগ্রহ না থাকায় তারা এখন প্রায় বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। গানের কয়েকটি টিউশনি করে বর্তমানে তিনি কোনোরকমে সংসার-জীবন পরিচালনা করছেন।

সিলেটে স্বল্প প্রচলিত নাট্যের মধ্যে রয়েছে *কলাগান*। তবে স্থানীয় কোনো শিল্পি কর্তৃক এই নাট্য পরিবেশিত হয় না। মৌলভীবাজার থেকে আগত কয়েকজন শিল্পি

www.pathagar.com

কলাগান পরিবেশন করেন। বৎসরে একবার এরা শহরে আসেন এবং হিন্দু অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে গান পরিবেশন করেন।

কলাগানের বিষয়বস্তু হলো বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি। মনসা দেবীর কাহিনি লোক সুর ও ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এতে থাকে ঢোল অথবা খোল এবং মন্দিরা। বাদকগণ দোহার হিসেবে কখনো গানের পঙক্তি উচ্চারণ করেন, কখনো বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে হ্যাঁ, হু, বেশ প্রভৃতি শব্দ বলেন আবার কখনো মূল অভিনেতা বা গায়ককে গান গেয়ে সহায়তা করেন।

এরা বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করেন।

সিলেটে প্রচলিত নাট্যের মধ্যে বৈষ্ণব পালা-ই অধিকতর জনপ্রিয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার উপলক্ষে বিত্তবান বা মধ্যবিত্তদের বাসায় পালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আখড়ায়ও কখনো কখনো পালা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

বৈষ্ণব পালার কুমিলা, চাঁদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ধারাটির নাম পূর্ববঙ্গীয় ধারা। এ ধারা স্থানীয় সুর ও রীতির কারণে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য সিলেট-ময়মনসিংহ ধারাটি (সিলেট থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত এই ধারাটি প্রচলিত বিধায় এই নামকরণ) বরিশাল-কুমিলা ধারা অপেক্ষাও স্বতন্ত্র। স্থানীয় বাওলা, ভাটিয়ালি ও সারির প্রভাবের কারণেই অন্যান্য অঞ্চলের কীর্তন অপেক্ষা তা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারী সিলেট অঞ্চলে বেশ কয়েকবার বৈষ্ণব পালা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেসব পালার বিষয় বস্তুর অধিকাংশই শ্রীচৈতন্য বা রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত।[১]

অনুষ্ঠানের একেবারে গোড়াতে বৈদিক সুরে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করা হয়। এসময় উপস্থিত মহিলাগণ উলুধ্বনি দেন এবং পুরুষগণ দু'হাত মাথার উপরে তুলে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দকে প্রণাম জানান। কীর্তনীয়া এরপর গুরুবন্দনা সম্বলিত একটি সংগীত দোহার সহযোগে উপহার দেন। সংগীতটি দীন শরৎ, রাধারমণ বা অন্য কোনো কবি কর্তৃক রচিত হতে পারে। এমনকি পালাকার নিজের লেখা গানও অনেক সময় এক্ষেত্রে উপস্থাপন করেন। তবে সংগীতটি অবশ্যই রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক হতে হবে। সংগীত পরিবেশনের পর তিনি বলে ওঠেন- (চৈতন্য বিষয়ক পালা হলে চৈতন্য বন্দনা, কৃষ্ণ বিষয়ক হলে কৃষ্ণ বন্দনা)

আমার প্রণাম লহ গৌর হরি
তব নামে মেতে উঠুক
বিশ্বের নরনারী ॥ ...

খোল, মন্দিরা, হারমোনিয়ম এসময় বাজতে থাকে।

দোহারগণ তাদের কর্তব্য শেষ করলে কীর্তনীয়া আর একটি চরণ উপস্থাপন করেন।

তুমি শ্যাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাধার বনমালী
ত্রেতাতে তুমি রাম, কলিতে গৌরাঙ্গ হরি ॥

www.pathagar.com

এভাবে ৮/১০ মিনিট চলার পর সংগীতটির পরিবেশনা শেষ হয় এবং কীর্তনীয়া গদ্যে কিন্তু সুর ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শ্রীচৈতন্যের ধরাধামে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর পৃথিবীতে জীবের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করে চৈতন্যের মনের কী অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা করেন সংগীতের সুরে সুরে-

এঁকে প্রেমে মাতোয়ারা
চোখে তাই বহে ধারা
কেঁদে গৌর হয়েছে সারা ॥...

এভাবে কিছুক্ষণ দোহার কীর্তনীয়ার যুগল বন্দীর পর আবারো গদ্যে ব্যাখ্যা-জাতি, বর্ণ, ধর্ম ভেদে আক্রান্ত বাঙলাকে শান্তির প্রেমের রসে সিক্ত করতে চৈতন্য শুরু করলেন কীর্তন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য প্রেমহীন জীবকে প্রেমময় করে তোলা। কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি এই অসাধ্য সাধনে করলেন আত্মনিয়োগ। তাঁর নামকীর্তন শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করে অবশ্য ভক্তরাও হলেন আনন্দিত। তারা বললেন—

ভালো রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল
ভালো রঙ্গে নাচে নিতাই দয়াল।
বিশাল হৃদয়ে দোলে বনফুল হার
পদ সঙ্গে ঝংকারে নূপুর টংকার ॥...

তারপর আবারো গদ্যে ব্যাখা—

তিনি উপলব্ধি করলেন, কথা বলে কোনো লাভ হবেনা, উপদেশ দিয়ে কোনো উপকার হবেনা। তাই তিনি নাচলেন, গাইলেন। নেচে গেয়ে প্রচার করলেন সাম্যের বাণী।

এসময় আসরে পুনরায় উলুধ্বনি ওঠে এবং তিন থেকে চার মিনিট ব্যাপী চলতে থাকে যন্ত্র সংগীত।

এবার শুরু হয় মূল পালা। প্রথমেই চরিত্র পরিচিতি। এই পরিচয় পর্ব চলে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে। জানা যায়, পালার প্রধান চরিত্র মুরারি গুপ্ত ও শ্রীচৈতন্য। মুরারিগুপ্ত যিনি শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন; তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসকও ছিলেন। দর্শন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যই তিনি সিলেট থেকে নবদ্বীপে গমন করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তিনি খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পান। তিনি মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্য) অপেক্ষা বয়সে ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন।

চৈতন্যের পরিচয় সম্পর্কে সকল ভক্তই পরিজ্ঞাত। তবু কীর্তনীয়াকে তার পরিচয় বর্ণনা করতে হয়। এই বর্ণনার মাঝে মাঝে আসরে পুনরায় উলুধ্বনি ওঠে এবং চার থেকে ছয় মিনিট যাবৎ চলতে থাকে যন্ত্র সংগীত।

এবার মূল কাহিনি উপস্থাপন। শুরুতে চৈতন্যকে একজন দূরন্ত ও অবাধ্য প্রকৃতির বলে মনে হয়। পঞ্চদশ বৎসরের অনুজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নানা বিষয়ে শান্ত মুরারি গুপ্তকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি আঘাত করতে থাকেন তাঁর

www.pathagar.com

শ্রীহট্টীয় (সিলেটি) উপভাষাকে। দর্শন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত স্বাভাবিক ভাবেই এতে কিছুটা উত্তেজিত হন এবং নিমাইকে (চৈতন্য) উদ্দেশ্য করে বলেন—

শ্রীহট্টীয়াগণ বলে অয় অয়।
তুমি কোন দেশী, তাহা কহ তো নিশ্চয় ॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
কহ দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ?

(প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, চৈতন্যের জন্ম নবদ্বীপে হলেও তার পৈতৃক নিবাস সিলেটে এবং তিনিও সিলেটেই মাতৃগর্ভে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তাঁর দুই পত্নিও সিলেটেরই সন্তান।)

কিন্তু কে শুনে কার কথা, নিমাই মুরারির অনুকরণে হস্ত সঞ্চালন পূর্বক অধিকতর বিরক্তিকর ভাবে ঠাট্টা করতে থাকেন, উপহাস করতে থাকেন মুরারি গুপ্তকে। মুরারি গুপ্তের এতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, এবং বলে ওঠেন—

কে বলে নিমাই মহা পণ্ডিত, কে বলে সে ভালো মানুষ,
সে জগন্নাথ মিশ্রের অপদার্থ পুত্র; দেখতেই কেবল সুপুরুষ।

এভাবে কাহিনি এগিয়ে যায় এবং ভক্তগণ আকুল হয়ে তা শ্রবণ ও দর্শন করেতে থাকেন।

গীতিকারও এক নাম *পালা*। এই পালা শব্দটির সঙ্গে অভিনয়ের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। উলেখ্য, *পল* বা *প্রহর শব্দ থেকে পালা* শব্দটির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। কয়েক প্রহর যাবৎ কাহিনি গীত বা অভিনীত হতো বলেই এর এ ধরনের নামকরণ। অবশ্য মানুষের ব্যাপক ও বিস্তৃত জীবনের বিভিন্ন দিক পালাক্রমে উপস্থাপিত হতো বলেও তার এই নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।

বাংলা গীতিকা ষোড়শ শতকেই একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক লাভে সমর্থ হয়।[২] কৃত্য পাঁচালী বা প্রণয় পাঁচালীর রীতি থেকে এ হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর অন্তর্গত কাহিনি এবং উক্ত কাহিনির উপস্থাপনা সবই লোকনাট্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করে। বলা যায়, দেব-দেবী ও জীন-পরীদের বৃত্ত ভেঙ্গে গীতিকা হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের জীবন শিল্প।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য গীতিকার ন্যায় সিলেট অঞ্চলের গীতিকাও মূলত পরিবার ও সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এর পরিবেশনারীতিও মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার অনুরূপ।

বিলুপ্ত প্রায় পালাগানের বর্তমান, যে রূপ; তা সম্পূর্ণই নাট্যগুণ সম্পন্ন। গায়েন এ ক্ষেত্রে প্রধান অভিনেতার কাজ করেন। তবে বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ সহ-অভিনেতা হিসেবে কখনো সংলাপ বলেন, আবার কখনো প্রধান অভিনেতার বর্ণনা অংশের দু একটি পংক্তি পুন পুন উচ্চারণের মাধ্যমে আসরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়তা করেন।[৩] অবশ্য ধুয়া অংশের উপস্থাপনাতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। যেমন, মূল গায়েন প্রথমে ধুয়া হিসেবে গাইলেন- *বাওনের জমিদার বাবু*

www.pathagar.com

চন্দ্রনারাইন/দেশের মাঝে ঢেউ খেলায় বাবুর খোশনাম- এরপর দোহারগণও একই সুরে একইভাবে তার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু গায়েন যখন প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, তখন দোহারগণ সেখানে গমন করলেন না। তারা গায়েন কর্তৃক গীত ধুয়া অংশই প্রতি অনুচ্ছেদের পর পরিবেশন করলেন।

যেমন- গায়েন গাইলেন—

হায়রে—
'বাওনের' জমিদার বাবু চন্দ্রনারাইন নাম [গ্রামের নাম]
দেশের মাঝে ঢেউ খেলায় বাবুর খোশনাম।
ছামনেতে যারা যায় খাজনাপাতি লইয়া
আ'সি মুখে জিকার করে আ'সে খল্‌খলাইয়া ॥ [জিজ্ঞেস]
তোমার বাড়ী কোন গাউ কও চাইরে বাপ্
হুনিদনো ক ঘর পরজার খাজনাপাতি মাফ। [শুনি তো]
রাড়ীভুড়ি গরীব গুরবায় জল পানি নি পায়
পূজা পাইলে পুরোহিতে নি গাউ ঘর জানায় ॥
দোহাররা এ অংশের অন্তে গাইলেন-

বাওনের জমিদার বাবু চন্দ্রনারাইন
দেশের মাঝে ঢেউ খেলায় বাবুর খোশনাম

গায়েন পুনরায় শুরু করলেন-

হায়রে-
ইন্দু মছলমান পাচপুরী মিলি মিশি নি আছে
বিপদ্ আপ্‌দে একজনানী যায় আর জনোর কাছে।
কার বেটা কার নাতি হুনিদনো কও
যারযির আন্দাজ মতো মাগুবঘরো বও ॥ [যার যার]
মাগুব ঘরো বও গিয়া কইরাম অধুয়ায়
দই চিরা রাব যেনু তোমরারে খাওয়ায়।
তোমরারে খাওয়ায় যেনু ছামনে উবাইয়া [দাঁড়াইয়া]
তিরুট কইলে যাইবার কালে মোরে যাইতো কইয়া ॥ [ত্রুটি]

এ অংশের অন্তেও দোহার যন্ত্রীগণ গাইলেন-

বাওনের জমিদার বাবু চন্দ্রনারাইন
দেশের মাঝে ঢেউ খেলায় বাবুর খোশনাম। [রংগমালা; সিলেট গীতিকা।]

কাহিনির এক পর্যায়ে যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে জমিদারের সংঘর্ষ বাঁধে,তখন গীতিকায় উদ্ধৃত নয় এমন একটি অংশ গায়েনের কণ্ঠ থেকে দোহারদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়- যেমন:

যুদ্ধ লাগিলরে/চাচা ভাতিজায় যুদ্ধ লাগিলরে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকে এই ধুয়া শুরু হয় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত যখনই দোহারদের পালা এসেছে তখনই উপর্যুক্ত অংশটি তারা পরিবেশন করেছেন।

www.pathagar.com

গীতিকায় উপস্থাপিত সংলাপ এবং বর্ণনার প্রায় সবই সুরের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য মাঝে মধ্যে প্রধান অভিনেতা নিরেট গদ্যও ব্যবহার করেন; এর মাধ্যমে তিনি কখনো কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান, কখনো হাস্যরস সৃষ্টি করেন; আবার কখনো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেন। কাহিনীটি দৃশ্যায়িত করার জন্য এই অভিনেতা গামছা, বালিশ, ওড়না, বাশের কঞ্চি ইত্যাদিও ব্যবহার করে থাকেন। তবে পরিবেশনের জন্য দলের সদস্য কর্তৃক পৃথক কোনো পোশাক ব্যবহৃত হয়না। লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি বা পাঞ্জাবি পরেই তারা কাহিনীটি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত পালাটি অবশ্য বয়াতির স্ব-রচিতও হতে পারে।

সিলেটের গীতিকাসমূহ মূলত ভাটিয়ালি ও মুড়াই এই দুই সুরে পরিবেশিত হয়। তবে ভাটিয়ালির বিচ্ছেদ লহরটিই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় বেশি। অবশ্য কোনো গীতিকাই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র সুরে পরিবেশিত হতে দেখা যায় না। বিশেষত প্রেমের অংশে প্রায় সব গীতিকাতেই ঝাঁপ লহরের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারী[৪] সিলেট অঞ্চলে যে ঢপকীর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে লক্ষ্য করা গেছে, একেবারে গোড়াতেই হারমোনিয়ম, খোল, সানাই, মন্দিরা ও বাঁশি সহযোগে একটা জমজমাট যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। যাত্রা গানের অনুরূপ ৮/১০ মিনিট বাদ্য-বাজনার পর একজন মহিলা উপবিষ্ট অবস্থায় হারমোনিয়ম সহযোগে বন্দনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ধীর লয় ও লম্বা লম্বা টানে উক্ত শিল্পি ও সহযোগীদের পরিবেশিত বন্দনা সংগীতটির পরিবেশনারীতিতে কীর্তনের প্রভাব স্পষ্ট।

মহিলা হারমোনিয়ম বাজিয়ে সংগীত পরিবেশনের পর মঞ্চে সূত্রধারের আগমন ঘটে। বাদ্যযন্ত্রের সুর ও তালে তালে আগত সূত্রধার প্রথমেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ট প্রণাম জানান। অতঃপর ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হয়ে করজোড় অবস্থায় দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে বলে ওঠেন-

'আমরা কয়েকজন সাধারণ বালক সম্মিলিত হয়ে আপনাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি হরির গুণকীর্তন করতে। হরির গুণকীর্তন করে আমরা যে আপনাদের সন্তুষ্ট করবো, সেই ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ, আমরা অজ্ঞান, অধম, ধর্ম ও বিদ্যাহীন। তবু ভক্ত সাধারণের পদধূলি শিরে ধারণ করে আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি হরির গুণকীর্তন করবার জন্য। হরির গুণকীর্তন করতে আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে। এ বিষয়টি আপনারা আপনাদের নিজ গুণ ও মহত্ত্বে মার্জনা করে দেবেন।

আজ আমরা যে কীর্তনখানা আরম্ভ করতে মনস্থ করেছি তার নাম 'নৌকা বিলাস'।-'নৌ-কা বি-লাস'। নৌকাবিলাস অভিনয় করতে আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে। এ ভুলের সব দায় আমাদের। আর যেটুকু ভলো লাগবে তা হরি ও আপনাদের আশীর্বাদ বলে মনে করবো। আপনাদের সবাইকে জানাই আবারো প্রণাম।'

(বিনয় সম্ভাষণ গোষ্ঠগানের অনুরূপ মনে হলেও কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য এতে দৃশ্যমান। গোষ্ঠগানে যে সম্ভাষণ থাকে সংগীতের অনুরূপ, ঢপ সংগীতে সেই সম্ভাষণই

www.pathagar.com

যাত্রার সংলাপের মতো উচ্চারিত হয়। অবশ্য ঢপ কীর্তনে যাত্রার অনুরূপ পাত্র-পাত্রীও বর্তমান; কিন্তু গোষ্ঠগানে কোনো পাত্র-পাত্রী নেই, মূল কীর্তনীয়াই কখনো গদ্যে, কখনো পদ্যে কাহিনি উপস্থাপন করেন। গোষ্ঠগানের সংলাপও নিরেট গদ্য হয়না; সংগীতের মতোই তা হয় গীতধর্মী।)

এই উক্তির অন্তে মহিলা সূত্রধারের প্রস্থান ঘটে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগমন ঘটে কৃষ্ণরূপ ধারী এক যুবকের।

যাত্রাগানের রাজার পোশাকের ন্যায় কালো বর্ণের লম্বা জামা ও সরু মুকুট পরিহিত কৃষ্ণ মঞ্চে এসেই বলে ওঠেন-*আমার মনটা আজ উতলা কেন বাশি, তুই কি তা বলতে পারিস? এই বাঁশি বলনা।* কিছুক্ষণ বাঁশিটি নাড়াচাড়া করার পর একসময় তিনি এতে সুর তোলেন। বাঁশির সুরে ৪/৫মিনিট কেটে যাওয়ার পর তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন—মন আমার উতলা হবেনা কেন, রাধা যে আমায় স্মরণ করছে। 'ও রাধা তুমি কোথায় আছো, আমার যে তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে' এই বলে তিনি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পূর্ববৎ লম্বা টান ও ধীর লয়ে শুরু হওয়া সঙ্গীতটি অবশ্য শেষের দিকে একই তালে জলদ হয়ে ওঠে এবং এই অবস্থাতেই পরিণতি পায়। বাজনার মৃদু স্বর চলন্ত অবস্থায় কৃষ্ণ তখন ধীর লয় কিন্তু সুউচ্চ স্বরে বলেন-*আজ আমার শ্রীমতির সঙ্গে ওই যমুনার শীতল সলিলে মিলন করতে হবে(মিলিত হতে হবে), আজ তাহলে আমি এখন যাই, দেখি আমার শ্রীমতি কেমন আছে বা কী করছে?*

বাক্যটি শেষ হওয়ার পর কৃষ্ণ প্রস্থান করেন, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বাজনা থাকে চলমান এবং তা পূর্বাপেক্ষা অনেক দ্রুত ও উচ্চ স্বরে। তন্মধ্যে বাঁশির সুরটাই অধিক স্পষ্ট ও জোড়ালো হয়ে ওঠে।

এ অবস্থাতেই আকর্ষণীয় পোশাক পরিহিতা রাধা ও সখির প্রবেশ ঘটে।

রাধা : সখিরে সখি, তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস?
সখি : না তো।
রাধা : কী বলছিস, তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস না?
সখি : আমিতো বলছি আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।
রাধা : তাহলে তোর কানটা বাজে হয়ে গেছে।
সখি : ওমা; আমার হয়েছে বাজে কান, আর তোমার খুব ভালো কান, তাইনা? আচ্ছা বলতো তুই কী শুনতে পাচ্ছিস?
রাধা : কালা যে বাঁশিতে আমায় ডাকছে।
সখি সহাস্যে : ও এই কথা? আমরা কি তবে কান চেপে ধরেছি?
রাধা : সখিরে, তাহলে আমি বলছি; তুই শোন।

বাঁশি বাজে কানে বাজেনা। (গান)

দোহার : বাঁশি বাজে কানে বাজেনা।
রাধা : বাঁশি বাজে কানে বাজেনা। (এরূপ ৫/৬ বার)

www.pathagar.com

রাধা : ভালো কানে বাজে বাঁশি, বাজে কানে বাজেনা।

দোহার : ভালো কানে বাজে বাঁশি, বাজে কানে বাজেনা।

এভাবে গানটি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ৫/৬ মিনিট পর শেষ হয়। গানের মূল বক্তব্য হচ্ছে- উন্নত মানের কান ও কৃষ্ণানুরাগী না হলে কৃষ্ণের বাঁশির সুর ও তার মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়না। সখিরা তাই কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনতে পায়না।

এভাবে সংগীত ও কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।

খ. লোকনৃত্য

সিলেটে প্রচলিত লোকনৃত্যের মধ্যে চা-নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য, ঝুমুর এবং ধামাইল উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে মণিপুরি নৃত্য মণিপুরীদের দ্বারা সৃষ্ট হলেও চা-নৃত্য বাঙালি কর্তৃক প্রণিত বলে অনুমিত। উল্লেখ্য চা-শ্রমিকদের সিংহভাগই অবাঙালি। তারা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গাছ থেকে চা-পাতা সংগ্রহ করেন। তাদের এই চা-উত্তোলন পদ্ধতিটিকে বাঙালিরাই নৃত্যরূপ দান করেছেন বলে আমাদের ধারণা।

১. ধামাইল

সিলেটের হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ এক ধরনের নৃত্যগীত বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এর নাম ধামাইল। কয়েকজন মহিলা বা কিশোরী নেচে নেচে এই সংগীত পরিবেশন করেন। অবশ্য মূলত বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হলেও প্রায় সকলপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্যগীতের প্রচলন রয়েছে।

'ধামাইল সঙ্গীত পরিবেশনকারীগণ প্রথমে বৃত্তাকার সমবেত হয়ে দলনেত্রীর জন্য অপেক্ষা করেন; নেত্রী কোনো একটি সঙ্গীতের প্রথম চরণ একক কণ্ঠে উপস্থাপন করা মাত্র সঙ্গীরা তাতে কণ্ঠ দেন। খুবই ধীর লয়ে শুরু হওয়া এই গান পরিবেশনকারীগণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে হস্ত দ্বারা তালি প্রদান পূর্বক পরিবেশন করতে থাকেন। মিনিট তিন-চার এভাবে চলার পর গানের লয় বৃদ্ধি পায়। এসময় শিল্পীরা ধীর গতিতে ডান দিকে দু'কদম অগ্রবর্তী হয়ে বাঁ-দিকে এককদম পিছিয়ে আসেন; ফলে অত্যন্ত ধীরে ধীরেই চক্রাকার বৃত্তটি দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সচল হয়ে ওঠে। মিনিট তিন-চার এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর গানের লয় আরো বৃদ্ধি পায়। এই সময় পরিবেশনকারীগণ বেশ দ্রুত গতিতে (হস্ত দ্বারা তালি প্রদানরত অবস্থাতেই) ডান দিকে পরিক্রমণ করতে থাকেন। বাঁ-দিকে পিছিয়ে না আসার কারণে পূর্বাপেক্ষা অনেক দ্রুত গতিতে তখন চক্রাকার বৃত্তটি আবর্তিত হয়। প্রথম চরণ ব্যতীত সংগীতের অন্যান্য অংশ দলনেত্রী ও সঙ্গীগণ একই সঙ্গে উপস্থাপন করেন।

গানের লয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চললে কিছুক্ষণ পর নৃত্যগীত পরিবেশনকারীগণ আরো দ্রুত গতিতে বৃত্তমধ্যে ঘুরতে থাকেন। ধীর থেকে ক্রমান্বয়ে দ্রুত এবং পরে অতি দ্রুত লয়ে পরিবেশনের ফলে এসময় বেশ জমজমাট অবস্থার সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য,

www.pathagar.com

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পরিস্থিতিতেই সঙ্গীতটির পরিবেশনার সমাপ্তি ঘটে। (হস্ত দ্বারা তালি প্রদানের পরিবর্তে অনেকে অবশ্য পেতলের করতালের সাহায্যেও তালি দিয়ে থাকেন।)'[৪]

২. ঝুমুর নৃত্য

ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করেন মূলত চা-শ্রমিকগণ। অনেকটা ধামাইলের অনুরূপ হলেও এই নৃত্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ধামাইল সংগীতের পরিবেশনকারীগণ বৃত্তাকার দণ্ডায়মান হয়ে ঘুরে ঘুরে সংগীত পরিবেশন করেন। আর ঝুমুর পরিবেশনকারীগণ ঘুরলেও তাদের অবস্থান হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এটিও সকল আনন্দ উৎসবে পরিবেশিত হয়।

৩. চড়ক নৃত্য

চড়ক পূজা উপলক্ষে সিলেট শহরে বাদ্যকর সম্প্রদায় চালিবন্দরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তবে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তথা অর্থ সংগ্রহের জন্য এরা এক-দুই মাস আগে থেকে বাড়ি বাড়ি গমন করেন। একজন শিব এবং একজন গৌরী সাজে সজ্জিত হয়ে *শিব-গৌরী* নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং কয়েকজন চাল, ডাল, অর্থ প্রভৃতি সংগ্রহে মনোযোগী হন। এদের এক একটি দলে সচরাচর ৮/১০ জন থাকেন এবং কয়েকজন শিব গৌরীর সঙ্গে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন।

৪. হিজড়া নৃত্য

সিলেটে হিজড়াদেরে খুব একটা দেখা না গেলেও কখনো কখনো বিয়ে বা সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এদের আগমন ঘটে। এসময় এরা নানা ভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন করেন। এদের একজনের হাতে এসময় ঢোলক থাকে। তিনি নানা ভঙ্গিতে বাজনা বাজিয়ে গান করেন। অন্যদেরে হাতে তালি দিয়ে নৃত্যরত অবস্থায় তাকে সহায়তা করতে দেখা যায়।

তথ্যপঞ্জি

১. সিলেটের হাওয়ালদার পাড়াস্থ সুবোধচন্দ্র দেবের বাসভবন, জিন্দাবাজারস্থ জগন্নাথ জিঁউর আখড়া, কাজল শাহস্থ ইসকন মন্দির এবং পনিটুলার আখড়ায় এধরনের পালা পরিবেশিত হয়। নাম ও কাহিনি ভিন্ন হলেও এসব পালার উপস্থাপনরীতি একই রকম।
২. সেলিম আল দীন; মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য; বাংলা একাডেমী-১৯৯৬ খ্রিঃ; ভূমিকা অংশের প্রথম পৃষ্ঠা
৩. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; সিলেটের লোকগীতি ও লোকনাট্যের ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য এবং পরিবেশনারীতি; পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; শিক্ষাবর্ষ: ২০০১-০২; নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার ঢাকা; পৃ. ১৮৮
৪. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৯

www.pathagar.com

তথ্যদাতা

১. প্রতাপ দেবনাথ, পিতা: মৃতঃ পুষ্প দেব, মাতা; হিরন্মালা দেবী, বয়স: ৫৩, মধ্যবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ

২. প্রবীর দেবনাথ, পিতা: প্রফুল্ল দেবনাথ, মাতা : শৈবলিনী দেবী, বয়স : ৫৮, বহর নওয়া গাঁও , শাহপরাণ গেইট, সিলেট

৩. প্রবাল কান্তি ভট্টাচার্য, পিতা: প্রবোধ লাল ভট্টাচার্য, মাতা: মন্দিরা ভট্টাচার্য, বয়স: ৩৫ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট

৪. বীণা রাণী নাথ, স্বামী: সুধীর নাথ, বয়স: ৪৬ বৎসর, নাথকলোনী, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট

৫. অপর্ণা রাণী দাস, স্বামী: কানাই লাল দাস, বয়স: ৭০ বৎসর, গোলাপগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

সিলেট জেলার শহর ও উপজেলাগুলোতে এখনো পর্যন্ত যেসব লোকক্রীড়া মাঝে মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১.মার্বেল

ক. দান

বিভিন্ন প্রকার মার্বেল খেলা রয়েছে। যেমন–দান, টিবি, মরিচ প্রভৃতি। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা প্রদান করা হলো।

খেলোয়াড় সংখ্যা: দুই বা তার অধিক।

খেলার পদ্ধতি

মাটিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাগ কেটে তার থেকে ৫ কিংবা ৬ হাত দূরে আরেকটি দাগ কাটতে হবে। খেলোয়াড়রা ২য় দাগের পেছন থেকে ১ম দাগের দিকে মার্বেল ছুড়ে। যার মার্বেল দাগের খুব নিকটবর্তী হয় সে প্রথম হবে। দাগের দুরত্ব অনুসারে ২য়, ৩য় স্থান নির্ধারিত হয়। স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রথম জন প্রথম দান মারার যোগ্যতা অর্জন করেন।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা যদি ২জন হয়, তবে উভয়ের সম্মতি ক্রমে ১টি করে মোট ২টি, অথবা ২টি করে ৪টি অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে যতখুশি মার্বেল নিয়ে তা দ্বারা দান খেলা যায়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়লে স্বাভাবিক ভাবেই মার্বেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ৩জন হলে ২টি করে ৬টি, অথবা ৩টি করে ৯টি মার্বেল নিয়ে ১ম জন ২য় দাগের পেছন থেকে ১ম দাগের বাইরে সবকটি মার্বেল ছুড়বে। এসময় অন্যরা একটি নির্দিষ্ট মার্বেল ব্যতীত অন্য যে কোনো একটি মার্বেল তার মার্বেল দ্বারা স্পর্শ করার জন্য বলে। যদি ১ম জন ওই নির্দিষ্ট মার্বেল ছাড়া অন্য মার্বেল স্পর্শ করতে পারে তবে সবগুলো মার্বেল তার হবে। তবে খেলোয়াড়কে যে কোনো একটি মার্বেল স্পর্শ করতে হবে, একাধিক মার্বেল স্পর্শ করলে অথবা কোনো মার্বেল স্পর্শ করতে না পারলে প্রথমজন বাদ পড়ে যাবে। তখন ক্রমান্বয়ে ২য়, ৩য় জন খেলতে থাকবে। এভাবে খেলাটি খেলোয়াড়দের ইচ্ছেমতো সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ হবে।

খ.টিবি

খেলোয়াড় : দুই বা ততোধিক।

খেলার পদ্ধতি

মাটিতে একটি নির্দিষ্ট দাগ কেটে প্রত্যেক খেলোয়াড় দাঁড়ায়। এই দাগ থেকে ৪ বা ৫ হাত দূরে একটি চার কোনাকৃতি ঘর বা বক্স আঁকা হয়। প্রত্যেকে দাগের বাইরে থেকে

www.pathagar.com

বক্সে মার্বেল ছুড়ে। যার মার্বেল বক্সের দাগের খুব নিকটবর্তী থাকে সে হয় ১ম। এভাবে দুরত্ব অনুসারে ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারিত হয়।

মার্বেলের সংখ্যা খেলোয়াড়ের সংখ্যা ও ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থাৎ খেলোয়ড়ের সংখ্যা যদি ৪ জন হয় তবে প্রত্যেকে ২টি করে মোট ৮টি মার্বেল খেলবে, কিন্তু খেলোয়াড়ের সংখ্যা যদি ৩ জন হয় তবে ২টি করে খেলবে মোট ৬টি। আবার খেলোয়াড়গণ যদি ২টির পরিবর্তে ৩টি বা ৪টি করে মার্বেল নেয় তবে এর সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১২ বা ১৬ (চারজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে)।

১ম জন বাক্সের ভিতর বসে সবকটি মার্বেল দাগের বাইরে ছুড়ে। সবাই যে মার্বেলটি স্পর্শ করতে বলবে ১ম জন যদি শূন্যে মার্বেল ছুড়ে সেই মার্বেলটি স্পর্শ করতে পারে, তবে সবকটি তার হয়। তবে এসময় অন্য কোনো মার্বেল স্পর্শ করা যায় না এবং দাগের ভেতরে কোনো মার্বেল ফেলা যায় না।

এই শর্তাবলী পূরণ করতে না পারলে পরের জন খেলা শুরু করে। আর শর্তপূরণ পূর্বক সমূদয় মার্বেল ১ম জনের হস্তগত হলে নতুন করে পুনরায় খেলা শুরু হয়।

গ. মরিচ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা: দুই বা ততোধিক।

খেলার পদ্ধতি

মাটিতে ২টি দাগ কাটা হয়। ১ম থেকে ২য় দাগের দুরত্ব ৭ থেকে ৮ হাত। ১ম দাগের বাইরে প্রত্যেক খেলোয়াড় অবস্থান করে ২য় দাগের দিকে মার্বেল ছুঁড়ে। দাগের খুব কাছাকাছি জন ১ম ও দুরত্ব অনুসারে ২য় ও ৩য় হবে। তারপর সবার সম্মতিক্রমে ২টি বা ৩টি করে মার্বেল বা তারও বেশি নিয়ে আড়াআড়িভাবে সারি করে ২য় দাগে বসাবে। ১ম জন ২য় দাগের দিকে মাটিতে ঘেঁষে মার্বেল ছুঁড়ে। যদি তার মার্বেল ২য় দাগের যে কোনো একটি মার্বেল অন্য কোনো মার্বেলের স্পর্শ ছাড়া স্পর্শ করতে পারে তবে সে বিজয়ী হয়ে সবকটি মার্বেল নিয়ে যায়। যদি অন্য মার্বেল স্পর্শ করে কিংবা কোনো মার্বেল স্পর্শ করতে না পারে তবে ২য় জন খেলা শুরু করে।

২. সাত পাতা

খেলোয়াড় : সাত পাতা খেলার জন্য সাতজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়।

খেলার পদ্ধতি

সাতজন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকের হাতে যে কোনো গাছের সাতটি পাতা দেয়া হয়। তারপর প্রত্যেকে তাদের পাতা এক হাতের তালুতে রেখে অন্য হাতের তালু দিয়ে অনেকটা করতালির মতো ৮-১০ বার আঘাত করে। যার হাতের পাতা ছিড়ে যায় সে 'কাউ' হবে। যদি দুইজন কাউ হয় তাহলে তাদের আবার একইভাবে পাতা নিতে হয়। তখন যারটি ছিড়ে সে 'কাউ' হয়। বাকি ছয় জন খেলোয়াড় দৌড়াতে শুরু করে। যে

www.pathagar.com

কাউ সে অন্য যে কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। যদি স্পর্শ করতে পারে তাহলে যাকে স্পর্শ করবে সে কাউ হবে। কাউ যতক্ষণ কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না, ততক্ষণ দৌড়াবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

৩. মাংস

খেলোয়াড় : ১০-১২ জন খেলোয়াড় সমান ২টি দলে ভাগ হয়ে দল গঠন করে। প্রত্যেক দলে ৫ বা ৬ জন খেলোয়াড় থাকে।

খেলার নিয়মাবলী

দুই দলের দলপতির মধ্যে লটারিতে যে বিজয়ী হয়, তার দল প্রথমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এরা মাটিতে একটি দাগ কেটে তার থেকে ২০-২৫ হাত দূরে গোলাকার একটি বৃত্তে মাংস (ইটের টুকরো বা পাথর) রাখে। জয়ী দল দাগে দাঁড়ায়। বিজীত দল অদূরে দাঁড়িয়ে গোলাকার বৃত্তের মাংস পাহাড়া দেয়। বিজয়ী দলের দলপতি ছাড়া অন্যরা দাগ থেকে বেরিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এসময় একবার নিঃশ্বাস নিয়ে মাংস-মাংস বলতে বলতে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছুঁতে হয়। না পারলে নিঃশ্বাস থাকা অবস্থায় দাগে ফিরে আসতে হবে। এই ফাঁকে যদি দলপতি কারো স্পর্শ ছাড়া মাংস নিয়ে আসতে পারে তবে ১ মাংস বা ১ গেম হয়। তবে যদি নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যায় এবং এই সময় বিপক্ষ দলের কেউ ছুঁয়ে ফেলে তাহলে সে খেলা থেকে বাদ পড়ে। এভাবে প্রত্যেককে বিপক্ষ দল ডেড করলে দলপতিকে দাগ থেকে বের হতে হয়। দলপতিও ডেড হলে বিপক্ষ দল দাগে এসে বৃত্ত থেকে একই প্রক্রিয়ায় মাংস আনার চেষ্টা করে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

৪. বড়া

সাধারণত গ্রীষ্মকালে বা আমের সময়কালে এ খেলা হয়। কারণ এতে আমের বড়ার (আঁটি) প্রয়োজন হয়। খেলোয়াড়ঃ দুই জন।

খেলার পদ্ধতি

মাটিতে একটি গোলাকার বৃত্ত করা হয়। তারপর দুজনের মধ্যে টস জয়ী খেলোয়াড় গোলাকার বৃত্তে দাঁড়ায়। অন্যজন বাইরে তার ইচ্ছেমত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তবে বৃত্তের ব্যক্তি বাইরের জনের পিছন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। তারপর বৃত্তের ব্যক্তি নিজের মাথার উপর দিয়ে একটি আমের বড়া উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে। বাইরের জন তা লুফে (ক্যাচ) নিতে পারলে সে বৃত্তে এসে একইভাবে মারে। যদি লুফে নিতে না পারে তাহলে আমের বড়াটি যতদূরে পরে সেখান থেকে এক পা তুলে অন্য পা দিয়ে তিনবার লাথি মেরে বৃত্তে নিয়ে আসে। যদি তিনবারে না আনতে পারে তাহলেও বিপক্ষ জন বৃত্তে এসে একই ভাবে বড়া ছুঁড়ে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

www.pathagar.com

৫. ঘোড়া

খেলোয়াড়ঃ দুই জন করে দুইটি দল থাকে।

খেলার পদ্ধতি

প্রথমে কিছু পাতা, কাগজ, ইট, বা চক দ্বারা গোলাকার ২টি বৃত্ত করা হয়। বৃত্ত দুটির মধ্যকার দূরত্ব ১০ বা ১২ হাত। বৃত্ত তৈরির পর একটি ছোট কাগজ, পাতা বা পয়সা দিয়ে টস হয়। এতে যারা হেরে যায়, সেই দলের ২ জন সদস্য দুটি বৃত্তে হাঁটু গেড়ে বসে। তারা একে অপরের পিছন মুখ করে বসে। জয়ী দলের ২ সদস্য বিজীত দলের দুই সদস্যের কাঁধে বসে। তারপর বিজীত দলের সদস্য ২ জন একটি করে পয়সা তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে অন্যের বৃত্তে ঢোকানোর চেষ্টা করে। যদি কোনো একটি পয়সা বৃত্তে ঢুকে যায়, তবে পূর্বের জয়ী দল হাঁটু গেড়ে বসে ও বিপরীত সদস্যরা তাদের কাঁধে বসে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

৬. সাতচাড়া

খেলোয়াড় : ২টি দল থাকে, প্রত্যেক দলে নূন্যতম চারজন করে খেলোয়াড় থাকে। এরপর টস হয়।

খেলার পদ্ধতি

একটি ছোট বৃত্তে সাতটি চাড়া (ইটের হালকা চ্যাপ্টা টুকরো) বসানো হয়। টুকরোর আকৃতি অনুসারে এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে এগুলো ভেঙে পরে না যায় এবং একটি স্তম্ভাকারে সজ্জিত থাকে। তারপর ১০ বা ১৫ হাত দূর থেকে ২টি দলের মধ্যে টস জয়ী দলের সদস্যরা নরম বল (টেনিস) ছুঁড়ে স্তম্ভের টুকরো ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। অপর দলের সদস্যরা তখন বৃত্তের চারপাশে থাকে। যদি জয়ী সদস্যরা স্তম্ভ ভেঙ্গে দিতে পারে, তবে প্রত্যেক সদস্য দৌড় শুরু করে। এ সময় বিপক্ষ দলের সদস্যরা বল কুড়িয়ে তাদের শরীরে ছুঁড়ার চেষ্টা করে। যদি এক এক করে চারজনকেই বল ছুঁড়ে স্পর্শ করতে পারে তবে অপর দল একইভাবে স্তম্ভ ভাঙ্গার চেষ্টা করে। আর যদি এই সময়ের মধ্যে স্তম্ভ ভাঙ্গার দল এসে স্তম্ভটিকে পূর্বের মত তৈরি করে রাখতে পারে, তাহলে এরা ১ পয়েন্ট পায়।

অন্যদিকে যদি টস জয়ী দল সাতবার বল ছুঁড়েও স্তম্ভ ভাঙ্গতে না পারে, কিংবা ভেঙে যাওয়া ৭টি চাড়া পূর্ববৎ সজ্জিত করার পূর্বে সকলে ডেড হয়ে যায়, তবে অপর দল একইভাবে স্তম্ভ নির্মাণ পূর্বক খেলা শুরু করে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

বিঃ দ্রঃ বল হাতে নিয়ে দৌড়ানো যায়না, একজনের হাত থেকে আর এক জনের হাতে দিতে হয়।

৭. ছিক্

খেলোয়াড়ঃ নূন্যতম দুই জন।

খেলার পদ্ধতি

একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র গর্ত থেকে একজন একটি ইটের ছিক্ (লোহা বা পাথরেরও হতে পারে, তবে এটি হালকা এবং চ্যাপ্টা হতে হয়, আনুমানিক ১.৫ থেকে ৩ বর্গ ইঞ্চির মধ্যে) তার ইচ্ছেমত দূরত্বে ছুঁড়ে ২য় জনের কাছে ২টি ইচ্ছা প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

১. ক্ষুদ্র গর্ত থেকে ছিক-টিকে স্পর্শ করবে? নাকি

২. ছিক-টিকে ওই স্থান থেকে গর্তে ফিরিয়ে আনবে-

যদি ২য়জন ছিক-টি স্পর্শ করতে চায়, তবে ১মজন তার ইচ্ছেমত তাস (দিয়াশলাই অথবা সিগেরেটের বাক্স) গোপনে অথবা প্রকাশ্যে বাজি ধরে। যেমনঃ ৫, ৩, বা ২টি। যদি সে গর্ত থেকে তার ইটের টুকরো ছুঁড়ে বিপক্ষের টুকরোটিকে স্পর্শ করতে পারে বা যদি তার টুকরোটি এমন জায়গায় পড়ে যেখান থেকে অন্য টুকরোর দুরত্ব ০.৫ হাতের কম হয় (এ ব্যাপারে খেলার আগে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা থাকতে হয়), তবে সে বাজির তাস অর্জন করে। না পারলে সমপরিমাণ তাস উল্টো তাকে প্রদান করতে হয়। এক ব্রান্ডের তাসের এক এক মূল্যমান হয়ে থাকে। যেমনঃ স্টার ২০০, কমেট ৫০০, ব্রিস্টল ১০০০, গোল্ডেন স্টার ১০০ প্রভৃতি। কেউ এক কমেট বাজি ধরলে এবং পরাজিত বিপক্ষ দলের নিকট এটি না থাকলে স্টার দুটি এবং গোল্ডেন স্টার একটি প্রদান করতে পারবে। স্থান ভেদে এই মূল্য মানের তারতম্য ঘটে।

অন্যদিকে যদি ২য় জন, ১ম জনকে তার ছিক্ গর্তে ফিরিয়ে আনতে বলে, তখন ২য়জন তার ইচ্ছেমত তাস গোপনে আথবা প্রকাশ্যে বাজি ধরে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তখন তার ইটের ছিকটিকে হাতে নিয়ে সেখান থেকে গর্তের দিকে ছুঁড়ে মারে। যদি তা গর্তে পরে কিংবা ০.৫ হাত দূরত্বের মধ্যে থাকে, তবে বাজি ধারণকারী অর্থাৎ ২য়জন, ১মজনকে বাজির তাস প্রদান করে। না পারলে ১মজনকে ২য় জনের কাছে সমপরিমাণ তাস প্রদান করতে হয়। একসঙ্গে কয়েকজন খেলোয়াড় এই খেলা খেলতে পারে।

৮.বন্দি

বন্দি খেলা সিলেট জেলায় বেশ জনপ্রিয়। তবে তা উপজেলা এমনকি পাড়া ভেদেও কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খেলা হয়। নিম্নে নিয়ম সমূহ উদ্ধৃত করা হলঃ

ক.

খেলোয়াড়ঃ ২টি দল থাকে, প্রত্যেক দলে ৪, ৫ বা ৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে।

খেলার পদ্ধতি

প্রথমে মাটিতে দুটি খুঁটি পোতা হয়। দূরত্ব ৪০-৫০ হাত। সমান দূরত্বের দুটি গাছ নির্বাচন করলেও চলে। টস জয়ী দল একটি খুঁটি বা গাছের নিচে দাঁড়ায়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিয়ে এই গাছ থেকে অন্য গাছে বন্দি পৌছাতে পারলে এক বন্দি বা এক গেম। এক্ষেত্রে জয়ী দলের দলপতি বিপক্ষ দল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দি থাকে। বন্দিদের পক্ষের একজন খেলোয়াড় দম্ নিয়ে এক শ্বাসে *বন্দি যা* বা *বন্দি গেল* বলে অন্য দলের খেলোয়াড়দের স্পর্শ করার চেষ্টা করে। শ্বাস থাকা অবস্থায় যদি সে অন্য দলের খেলোয়াড়কে স্পর্শ করতে পারে, তবে সে ডেড় বা *আউট* বা *শেষ* হবে। এই খেলায় সে আর বন্দিকে আউট করতে পারবেনা। তবে যদি ওই খেলোয়াড়ের শ্বাস শেষ হয়ে যায়, আর ওই সময় যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে সে স্পর্শ করে কিংবা

www.pathagar.com

বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যদি তাকে স্পর্শ করে, তবে উল্টো সে আউট হয়ে যাবে। টস জয়ী দলের খেলোয়াড়রা যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে আউট করে ফেলতে পারে, তবে বন্দি অনায়াসে বিপরীত প্রান্তের গাছ বা খুঁটি ছুঁয়ে জয়ী হয়ে যেতে পারে। অথবা তার দলের খেলোয়াড় যদি শ্বাস রেখে ডাক ছেড়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের বন্দির পাশ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং ওই ফাঁকে যদি বন্দি গাছটি ছুঁয়ে ফেলে তবে এতেও তাদের জয় হবে। আর যেকোনো অবস্থায় যদি বিপক্ষ দল বন্দিকে গাছে স্পর্শ না থাকা অবস্থায় ছুঁয়ে দেয়, তবে গোটা দল ডেড হয়। এমতাবস্থায় তারা গাছের নিচে এসে পূর্বের মতো খেলা শুরু করে। এক্ষেত্রে তাদের দলপতি বন্দি হবে। একইভাবে খেলা চলে।

খ.

টস্ জয়ী দলের দলপতি, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত থাকে বলেই এই খেলার নাম বন্দি।

বন্দি বা দলপতি তার সদস্যদের নিয়ে দাঁড়ানো খুঁটি থেকে বিপরীত দিকে থাকা অন্য খুঁটি স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তার সদস্যরা *বন্দি চল্* বলে এক শ্বাসে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। যদি শ্বাস থাকা অবস্থায় বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়কে সে ছুঁয়ে দিতে সক্ষম হয়, তবে ওই খেলোয়াড় ডেড বা আউট হয়। অর্থাৎ সে দলপতিকে বন্দি অবস্থায় পাহাড়া দেয়ার যোগ্যতা হারায়। এভাবে বিপক্ষ দলের সকল খেলোয়াড়কে ডেড্ বা আউট করতে পারলে দলপতি অনায়াসে বন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য খুঁটিতে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই সময় যদি সে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে কিংবা বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় যদি তাকে স্পর্শ করে তবে উল্টো সে ডেড বা আউট হয়। এভাবে টস জয়ী দলের সকলে আউট হয়ে গেলে বন্দিকে একা খুঁটি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা অনায়াসে তখন তাকে ছুঁয়ে আউট করে ফেলে এবং তখন তারা এক খুঁটি থেকে অন্য খুঁটিতে যাওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ পায়।

টসজয়ী দলের কোনো খেলোয়াড় যদি এক শ্বাসে *বন্দি চল্* বলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে তাড়িয়ে (সবাইকে আউট না করে) ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে পারে এবং সেই ফাঁকে যদি দলপতি (বন্দি) দৌড়ে অন্য খুঁটি স্পর্শ করতে পারে তাহলেও তাদের এক গেম হবে। এভাবে কয়েকবার খেলে যারা বেশি গেম দেবে তারা জয়ী হবে।

গ.

দুটি দলে খেলা হয়। একদল থাকে মাঠের এক প্রান্তে অর্ধবৃত্তাকার দাগের ভেতরে, অন্যদল বাইরে। লটারিতে বিজয়ী দল দাগের ভিতরে অবস্থান করে, তবে তাদের একজনকে বিপক্ষদল বন্দি করে ৩০-৪০ফুট দূরে একটি পূর্ণ বৃত্তে বন্দি করে রাখে। এক্ষেত্রে সঙ্গীদের সঙ্গে তার অবস্থান হয় মুখোমুখী। সঙ্গীদের দায়িত্ব হচ্ছে বন্দিকে উদ্ধার করে আনা। এক শ্বাসে কোনো একটি শব্দ বলতে বলতে একজন খেলোয়াড় সামনের দিকে ছুটে যাবে। ওই সময় সে যদি বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে ডেড অর্থাৎ বন্দিকে অবস্থায় পাহাড়া দেয়ার যোগ্যতা হারায়। এভাবে বিপক্ষ

www.pathagar.com

দলের সকল খেলোয়াড়কে ডেড বা আউট করতে পারলে দলপতি অনায়াসে বন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ঘরে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই সময় যদি সে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে কিংবা বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় যদি তাকে স্পর্শ করে তবে উল্টো সে ডেড বা আউট হয়। এভাবে টসজয়ী দলের সকলে আউট হয়ে গেলে বন্দিকে একা খুঁটি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা অনায়াসে তখন তাকে ছুঁয়ে আউট করে ফেলে এবং তখন তারা খেলা শুরু করে।

টসজয়ী দলের কোনো খেলোয়াড় যদি এক শ্বাসে *বন্দি* বলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে তাড়িয়ে (সবাইকে আউট না করে) ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে পারে এবং সেই ফাঁকে যদি বন্দি দৌড়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে নিজের অর্ধবৃত্তকার ঘরে ফিরে আসতে পারে তাহলেও তাদের এক গেম হবে। এভাবে কয়েকবার খেলে যারা বেশি গেম দিতে পারবে তারা জয়ী হবে। কয় গেম খেলা হবে তা আগেই নির্ধারণ করতে হয়।

৯.লাই-১

(বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ)

খেলোয়াড় : এ খেলায় নির্দিষ্ট করে খেলোয়াড় থাকে না, যত জন ইচ্ছে খেলা যায়।

খেলার পদ্ধতি: সকল খেলোয়াড় ডোবা, পুকুর, নদীতে অবস্থান করে। এ সময় যে কোনো একজন তার হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সবাইকে বলে—

ইকান কিতা ক চাইন দেকি (এটা কী বল দেখি)

তখন অন্যরা বলে– লাই।

তখন সে বলে– আমি লাই লইলাইছি (আমি লাই নিয়ে গেছি)।

তারপর সে পানিতে ডুব দিয়ে বা সাঁতার দিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এই অবস্থায় অন্যরা তাকে ছুঁয়ার চেষ্টা করে। যে তাকে ছুঁতে পারে তখন সে লাই হয়, অন্যরা তখন নতুন লাইকে ছুঁয়ার চেষ্টা করে। এভাবে খেলোয়াড়েরা পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে।

লাই-২

(সদর উপজেলা ও দক্ষিণ সুরমা)

খেলোয়াড়দের দুটি দলে ভাগ করে নিতে হয়। এক দলের সদস্য সংখ্যা ২/৪/৬ বা ততোধিক হতে পারে। তবে প্রতি দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা জোড় হতে হবে।

খেলার নিয়মাবলী : প্রথমে পুকুরের মাঝখানে একটি খুঁটি গেড়ে গুট্টা বাড়ি বানানো হয়। নদী হলে নদীর অপর পারকে গুট্টা বাড়ি ধরা হয়। লটারি (সাধারণত কয়েন দিয়ে) অথবা মনোনয়নের মাধ্যমে একটি দলের যেকোন একজনকে 'লাল' নির্বাচন করা হয়। পরে নদী বা পুকুরের পাড়ে দুটি দল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

তারপর সবাই সমস্বরে লাল পানিতে ঝাঁপ দাও বলবে এবং এর পরপরই বলবে এক দুই তিন। তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে লাল 'লাই লইয়া গেলাম' বলে পানিতে ঝাঁপ দিবে। সাথে সাথে উভয় দলের সবাই তাঁর সাথে পানিতে ঝাঁপ দেবে। বিপক্ষ দল লালকে (যে লাই বলে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে) ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। অপরদিকে পক্ষ দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের বাধা দিবে যাতে বিপক্ষ দল লালকে ছুঁতে না পারে।

এভাবে লাল যদি নির্দিষ্ট খুঁটি বা নদীর অপর পারে বিনা বাধায় পৌঁছতে পারে তাহলে পক্ষ দলের এক গুট্টা হবে। আর যদি ছোঁয়ার আগে লালকে বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় ছুঁয়ে ফেলতে পারে, তাহলে লাল 'পচ্চা' হয়ে যায় (হেরে যাওয়া)। খেলা আবার শুরু করতে হয়। এ পর্যায়ে অপর দলের (প্রথমে যারা বিপক্ষ দলে ছিল) অন্য একজন খেলোয়াড় লাল হবে। এ খেলা যতক্ষণ ইচ্ছে খেলা যায়।

লাই-৩

সচরাচর পুকুর বা দিঘিতে খেলা হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না।

প্রথমে একজন খেলোয়াড় অন্য একজন খেলোয়াড়ের সামনে তার একটি অঙুল ফোটায়। তারপর সকল খেলোয়াড়কে সে তার যে কোনো একটি অঙুল ধরতে বলে। যে ব্যক্তি ফোটানো অঙুল ধরে সে লাই হয়।

লাই পানিতে ডুব দিয়ে বা সাঁতার কেটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এই অবস্থায় অন্যরা তাকে ছুঁয়ার চেষ্টা করে। যে তাকে ছুঁতে পারে, সে লাই হয়, অন্যরা তখন নতুন লাইকে ছুঁয়ার চেষ্টা করে। যে সবচেয়ে বেশি সময় যাবৎ লাই হয়ে থাকতে পারে, সে বিজয়ী হয়। খেলোয়াড়রা মোবাইল দ্বারা সময় পরিমাপ করেন।

১০. ছোট খেলা

খেলোয়াড় : দুইজন

খেলার পদ্ধতি : প্রথমে একটি চার থেকে পাঁচ হাত লম্বা বাঁশ বা লাঠি নিতে হয়। দুইজন খেলোয়াড় লাঠির দু'দিকে ধরে বসে। তারপর একে অপরের পায়ের সাথে পা লাগিয়ে যতটুকু সম্ভব লাঠি ধরে শুয়ে পরে। প্রত্যেকেই একে অপরের পায়ে চাপ দিয়ে ও লাঠি টান দিয়ে অন্যজনকে তুলে ফেলার চেষ্টা করে। এভাবে যে যতবার অপরজনকে তুলতে পারে সে তত পয়েন্ট পায়। খেলার আধঘণ্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পয়েন্ট অনুযায়ী বিজয়ী নির্বাচিত হয়।

১১. চেল খেলা

খেলোয়াড় : তিনজন বা তার অধিক।

খেলার পদ্ধতি : প্রথমে কয়েকটি পলিথিন বা পরিত্যক্ত প্যাকেটে ছালি (রান্নার কয়লা), মুরগির বিষ্টা, গরুর গোবর, ছাগলের বিষ্টা কিংবা যে কোনো ময়লা জিনিস থাকলে তা

www.pathagar.com

ভরে নিতে হয়। তারপর যতটি প্যাকেট হয় তা সবাই মিলে সাজিয়ে রাখে। ময়লার প্যাকেটগুলোর সাথে একটি আলুর প্যাকেটও থাকে। যে কোনো একজন খেলোয়াড় গিয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো প্যাকেট কিছুটা ওলট-পালট করে আবার সাজিয়ে রাখে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে কোনটাতে কী আছে?

সাজানোর পর সবাই একটি গোলাকার বৃত্তে পা রাখে। একজন বৃত্তের মাঝখানে একটি টেনিস বল ছুড়ে দেয়। সে বল যার পায়ে গিয়ে পড়ে তাকে প্রত্যেকটি প্যাকেট খুঁজে আলু নিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে প্যাকেট খোলার সময় প্রথমেই আলু না পেলে বিভিন্ন বিষ্টা তার হাতে লাগে। ফলে তাকে নিয়ে সবাই মজা করে। এক সময় সে আলু নিয়ে আসলে আবার প্যাকেট সাজানো হয়। বৃত্তে সবাই পা রেখে বল ছুঁড়ে তারপর আবার যার পায়ে বল পরে সে আলু আনতে যায়। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

১২.ইরি বিরি

খেলোয়াড় সংখ্যা : ২ বা ৩ বা ৪ কিংবা তার অধিক।

খেলার পদ্ধতি : খেলার মাঠে একত্র হওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন সহ খেলোয়াড়দের আড়াল করে গোপনে মাটিতে সমান্তরালভাবে কয়েকটি দাগ দিবে। তারপর দাগের উপরে ১, ২, ৩ এভাবে যতজন খেলোয়াড় আছে ঠিক ততটি নম্বর বসাবে এবং হাত বা কাঠের টুকরো কিংবা যেকোনো বস্তু দিয়ে তা ঢেকে রাখবে। দাগ কাটার পর প্রত্যেকে এসে একটি করে দাগে (ইচ্ছেমত) আঙুল রাখবে। যে দাগ দেয় সে সবার শেষে আঙুল ধরবে।

ঢাকনা সরিয়ে এরপর দেখতে হবে ১ নম্বর দাগে কে আঙুল রেখেছে। যে ১ নম্বরে আঙুল রেখেছে সে প্রথমে চোর হবে এবং নিম্নোক্ত ছড়া বলবে–

ইরি বিড়ি বিননাথ
তিড়ি বিরি গাছ
বাড়ির পিছনে চব্বিশ গাছ
যারে সেখানে পাইমু
ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইমু
ছাড়লাম ডাক
লুকাইয়া থাক।

এই ছড়া বলার সময় অন্য খেলোয়াড়রা লুকিয়ে যাবে। তারপর চোর যে কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যাকে দেখবে তাকে যদি সে ছুঁতে পারে তবে ওই খেলোয়াড় চোর হবে। এর মাঝে যাকে সে দেখেনি এমন কেউ যদি তাকে ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে পুনরায় তাকে চোর হতে হয় এবং আবার ছড়া আওড়াতে হয়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

১৩. রস-কস

খেলোয়াড় : দুই থেকে সর্বোচ্চ ছয় জন।

www.pathagar.com

খেলার পদ্ধতি : প্রথমে রস, কস, সিঙ্গা, বুলবুল, মালে, মস্তক এই শব্দগুলো থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড় যে কোনো একটি নাম ধারণ করে। এরপর সবাই তার ইচ্ছা অনুযায়ী একটি টেবিলে হাতের কিছু আঙুল বা সবকটি আঙুল রাখে। এরপর রস, কস, সিঙ্গা, বুলবুল, মালে, মস্তক এভাবে ক্রমান্বয়ে আঙুলগুলো গোণা হয়। যার নাম একেবারে শেষে পড়ে, তাকে আর আঙুল রাখতে হয় না। যদি দুইজন খেলোয়াড় হয় তাহলে যার নাম উঠে যায় সে অপরজনকে হাতে আঘাত করে। যদি ৩, ৪, ৫ বা ৬ জন খেলোয়াড় হয় তাহলে ১ জন ছাড়া একে একে সবার নাম উঠে গেলে যার নাম উঠে না তাকে সবাই আঘাত করে।

এক্ষেত্রে যে শেষে থেকে যায় বা যার নাম উঠে না, সে তার একটি হাত টেবিলের উপর রাখে। তারপর সবাই এক এক করে ওই হাতের দু'পাশে তাদের দুই হাত রেখে টেবিলের অপর পাশ থেকে দাঁড়িয়ে আঘাত করে। যদি আঘাত করার সময় যার হাতে আঘাত করে সে হাত তুলে ফেলে এবং হাতে কোন স্পর্শ না হয় তাহলে যে আঘাত করে সে বাদ পড়ে যায়। এভাবে প্রত্যেকে বাদ পড়ার পর আবার পূর্ব পদ্ধতিতে নতুন করে খেলা শুরু হয়।

১৪. কুত্‌কুত

বিভিন্ন ধরনের কুতকুত খেলা প্রচলিত আছে। যেমনঃ ৩ ঘরি, ৫ ঘরি, ৯ ঘরি ইত্যাদি। তবে ৫ ঘরি বেশি প্রচলিত। কোথাও কোথাও এগুলো মটর, রেশমা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

৫ ঘরি

বড় বড় ৫টি ঘর ইট বা চক দিয়ে আঁকতে হয় বলে এর নাম ৫ ঘরি।

ভূমিতে ১০x৬ আকৃতির (কম-বেশি হতে পারে) একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করে তাতে ১.৫x৬ আকৃতির ৪টি ও ৪x৬ ফুট আকৃতির একটি ঘর আঁকতে হয়।

১বা ১.৫ অথবা ২ বর্গইঞ্চি আকৃতি বিশিষ্ট ১টি ইট বা পাথরের গোল বা চতুষ্কোণাকৃতির কিন্তু চ্যাপ্টা চাড়া নিয়ে লটারিতে বিজয়ী খেলোয়াড় প্রথমে ৫টি ঘরের প্রথম অর্থাৎ নিকটের ঘর থেকে খেলা শুরু করে। চাড়া অবশ্য প্রত্যেকেরই একটি করে পৃথক পৃথক থাকতে পারে। খেলোয়াড় প্রথমে চাড়াটি প্রথম ঘরের সুবিধাজনক একটি স্থানে ফেলবে। পরে এক দমে কুত্‌কুত্‌ বলতে বলতে চাড়াসহ একটি একটি করে প্রতিটি ঘর অতিক্রম করে, অথবা পা দ্বারা চাড়াকে অগেই পঞ্চম ঘরে ফেলে ওই ঘরে এসে থামতে হবে। এক পা মাটিতে না রেখে অর্থাৎ এক পায়ের সাহায্যে এবং এক দমে পঞ্চম ঘরে আসতে হয়। চাড়া এবং পায়ের পাতা যে কোনো দাগের বাইরে বা দাগে পড়লে খেলোয়াড়টি ডেড্‌ বা শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম ঘরে খেলোয়াড় দু পা রাখার সুযোগ যেমন পান, তেমনি শ্বাসও ছাড়ার সুযোগ লাভ করেন। এই ঘর থেকে চাড়াটি যে কোনো একটি পা দ্বারা দাগের ভেতর দিয়ে চতুর্থ-তৃতীয়-দ্বিতীয়-প্রথম ঘর হয়ে বাইরে পাঠাতে হয়। তারপর কুত্‌কুত্‌ বলতে বলতে এক শ্বাসে এবং এক পায়ে চতুর্থ-তৃতীয়-দ্বিতীয়-প্রথম ঘর হয়ে বাইরে বেরিয়ে

www.pathagar.com

আসতে হয়। এভাবে খেলার নিয়ম অনুযায়ী খেলোয়াড় নির্বিঘ্নে প্রথম ঘর থেকে যাত্রা শুরু করে আবার ফিরে আসতে পারলে সে দ্বিতীয় ঘর একইভাবে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করে। যদি দ্বিতীয় ঘর অতিক্রম করতে না পারে, তবে পরবর্তীবার পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়না, দ্বিতীয় ঘর থেকে শুরু করতে হয়। এভাবে যে সবার আগে ৫টি ঘর অতিক্রম করে আসতে পারে সে বিজয়ী বা প্রথম হয়। চাড়াটি যদি পঞ্চম ঘর থেকে প্রথম ঘর হয়ে বাইরে না বেরোয়, ৩য় বা ৪র্থ বা ২য় ঘরে আটকে যায়, তবে কুত্‌কুত্‌ বলতে বলতে এক পায়ে চাড়াটিকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

এই খেলাকে অবশ্য আরো দীর্ঘ করা যায়; তখন এর নাম হয় ঘরবান্ধা কুত্‌কুত্‌ ।

ঘরবান্ধা কুত্‌কুত্‌

পূর্বোক্ত নিয়মে ৫টি ঘর অতিক্রম করার পর বিজয়ী খেলোয়াড় ৫ম ঘরের বাইরে থেকে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে একটি অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করা হয়) তার চাড়াটি মাথার উপর দিয়ে পিছন দিক দিয়ে ৫টি ঘরের দিকে ছুঁড়ে মারে। যে ঘরে গিয়ে চাড়াটি পড়ে, সেই ঘর ওই খেলোয়াড়ের নিজের হয়ে যায়। এই ঘরটি সে সংরক্ষণ করে বিধায়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে এই ঘরটি ব্যবহার করতে নাও দিতে পারে। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওই ঘরের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে যেতে হবে। তবে সে নিজে এই ঘরে দুপা রাখার এবং নতুন শ্বাস নেয়ার সুযোগ লাভ করবে। যে ঘর বাঁধতে পারে তার জন্য খেলাটি সহজ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

রেশমা

প্রথমে চক কিংবা ইটের টুকরো দিয়ে গোল করে মধ্যখানে ফাঁক রেখে দুটি ঘর আঁকতে হয়। খেলায় একাধিক খেলোয়াড় থাকতে পারে। তবে প্রথমে দুইজন প্রতিযোগী খেলা শুরু করে। লটারির মাধ্যমে প্রথম কে খেলবে তা নির্ধারণ করা হয়।

নির্ধারিত খেলোয়াড় গুটি (দাক্কি) নিয়ে খেলা শুরু করে।

খেলোয়াড় একটি ঘরে দাঁড়িয়ে অপর ঘরে গুটি ফেলবে। তারপর দম নিয়ে কুতকুত্‌ বলে একপায়ে ভর দিয়ে গুটি নিয়ে আসবে প্রথম ঘরে। দ্বিতীয়বার প্রথম ঘরে গিয়ে আবার গুটি ফেলতে হবে দ্বিতীয় ঘরে। তারপর মটর মটর ডাবলি মটর বলে এক নিঃশ্বাসে একইভাবে একপায়ে ভর দিয়ে গুটি নিয়ে আসতে হবে প্রথম ঘরে। তৃতীয়বার একই পর্যায়ে খেলা চলবে। তবে কথাগুলি বদলে যাবে। যেমন তৃতীয়বার বলতে হবে ডিমভাজি-আলুভাজি- ডিমভাজি- আলুভাজি-----। চতুর্থবার বলতে হয় খোকন শাপলা কী করে---- ঘরে ঘরে কাজ করে। পঞ্চমবার বলতে হয় কাজলা কী করে----- ঘরে ঘরে কাজ করে। ষষ্ঠবার বলতে হয় রেশমা পা পা -----। সবশষে ১---২---৩ বলে নিজের যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে কিনতে হবে। (যেমন যে খেলছে তার সঙ্গীর নাম মিশি তাহলে বলতে হবে, ১--২---৩----মিশিরে কিন্‌।

www.pathagar.com

যেভাবে খেলায় বাদ পড়া হয়:

প্রথম ঘর থেকে দ্বিতীয় ঘরে গুটি ফেলার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় না পড়লে খেলোয়াড় বাদ পড়ে যাবেন।

এছাড়া ১--২---৩---মিশিরে কিন্ বলার সময় যখন গুটি নিয়ে আসা হবে তখন কেউ ছুঁয়ে ফেললেও খেলোয়াড় বাদ পড়ে যাবে।

এ খেলা ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত খেলা যায়।

মটর-মটর

চক্ বা ইটের টুকরা আঁকা পাশাপাশি দুটো ঘর থাকবে। বৃত্তাকার ঘর দুটো খুব বেশি বড় বা ছোট হবেনা, তবে আয়তন বা আকৃতি মোটামুটি সমান হবে। প্রথমে একটি ঘর (অ) থেকে আর একটি ঘরে (আ) যেতে হবে এক পা তুলে, এক নিঃশ্বাসে, নিম্নোক্ত পঙতি বলে।

মটর মটর ডাবলি মটর। মটর মটর ডাবলি মটর.. .. ..

তারপর সেই ঘর থেকে নতুন শ্বাস ও নতুন পঙতি বলে (এক পা তুলে, এক নিঃশ্বাসে) ফিরে আসতে হবে আগের ঘরে। নতুন পঙতি হবে এরকম-

ডিম ভাজা, খেতে মজা/ ডিম ভাজা, খেতে মজা.. .. ..

এবার ঘরে (অ) একটি ইট বা পাথরের ছোট এবং পাতলা চাড়া ফেলে আগের মতো এক পা তুলে, এক নিঃশ্বাসে শাপলা রাণি কী করে, অফিসে কি কাজ করে এই পঙতি বলতে বলতে চাড়াটি পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিয়ে আসতে হবে অপর ঘরে (আ)। এবার একই কায়দায় নতুন পঙতি বলতে বলতে সেই ঘর (আ) থেকে ফিরে আসতে হবে আগের ঘরে (অ)। এবার মেয়েটি বলবে শাপলা কিতা ঘুমায় নি/মাথাত দিতাম নতুন বেনি।

এভাবে আরো দুবার এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া আসা করবে। শেষবার এক নিঃশ্বাসে দুবার অ থেকে আ এবং আ থেকে অ ঘরে যাওয়া আসা করে পূর্বের স্থানে ফিরে আসবে। মেয়েটি ওই সময় বলবে -বাবুর বাড়ি গেছলাম, চা নাস্তা খাইছলাম। প্রত্যেকটি দানের জন্য এক-একটি পঙতি নির্দিষ্ট। ভুল বলা যাবেনা। গুটি বা চারা কখনোই দাগে ফেলা যাবেনা। শ্বাস ছাড়া যাবেনা। এভাবে যে আগে কোর্স পূর্ণ করতে পারবে, সে সমান্তরাল ঘর দুটির বাইরে গিয়ে, পিছন ফিরে মাথার উপর দিয়ে ডান হাত দিয়ে চাড়াটি যে কোনো একটি ঘরে ফেলতে চেষ্টা করবে। যদি কোনো ঘরের ভেতর স্পষ্ট ভাবে চাড়াটি পড়ে, তবে তার জয় হবে। এই বিষয়টিকে ঘর কেনা বা ঘর বাঁধা বলে। ঘর না বাঁধা পর্যন্ত খেলায় জয় পাওয়া যায়না। দেখা গেছে অনেকে খেলার পুরো কোর্স শেষ করে শুধুমাত্র ঘর বাঁধতে না পারার জন্য হেরে যায়। অন্যজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোর্স শেষ করেও (দাগে গুটি ফেলে, বা দম ছেড়ে দিয়ে আউট হয়ে) আগে ঘর বাঁধার কারণে জয়ী হয়ে যেতে পারে।

সুরমা

এই খেলাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে কোথাও ডাবলি মটর এবং কোথাও রেশমা নামে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

পাশাপাশি দুটো বৃত্তাকার ঘর তৈরি করা হয়। তবে ঘর দুটোর মাঝখানে সমপরিমাণ ফাঁক থাকে। খেলার শুরুতে একজন খেলোয়াড় ১.৫ বর্গ ইঞ্চি বিশিষ্ট একটি ইট বা পাথরের চাড়া প্রথম ঘরের ভেতর ফেলে। তারপর কুতকুত শব্দটি এক শ্বাসে বারবার বলতে বলতে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে ইটের চাড়া সহ প্রথম ঘর থেকে দ্বিতীয় ঘরে এবং দ্বিতীয় ঘর থেকে প্রথম ঘরে আসে। পা দাগে না পড়লে, শ্বাস ছেড়ে না দিলে এবং চাড়াটি সুষ্ঠুভাবে প্রথম ঘর থেকে দ্বিতীয় ঘরে এবং দ্বিতীয় ঘর থেকে প্রথম ঘরে নিয়ে আসতে পারলে দ্বিতীয়বার একই ভাবে ঘর গুলো পরিক্রমণ করতে হয়। তবে এসময় বলতে হয়-

আমার চুলের আগা নাই
শ্যাম্পু দিতে মনে নাই।

ঘর পরিক্রমণ পূর্বের মতো নির্বিঘ্নে শেষ হলে তৃতীয়বার একই পদ্ধতিতে পুনরায় পরিক্রমণে যেতে হয়। তবে তখন বলতে হয়-

আনা তেলে কুমড়া ভাজি
হাতে আছে ফুলের সাঝি।

এভাবে বাক্য পরিবর্তন করে পাঁচবার ঘর পরিক্রমণের পর ঝিম্ শব্দটি উচ্চারণ পূর্বক মুখ বন্ধ করে এক শ্বাসে ঘর দুটো চাড়া ব্যতিরেকে একপায়ে তিন বার পরিক্রমণ করতে হয়। এরপর হাপ্ শব্দটি সজোরে উচ্চারণ পূর্বক ঠোট বন্ধ করে ঘরগুলো পরিক্রমণ করার প্রয়োজন পড়ে। এবারও তিনবারই পরিক্রমণ করতে হয়।

সব কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ার পর বৃত্তের অনতি দূরে এঁকে রাখা একটি সরল রেখা থেকে চাড়াটি মাথার উপর দিয়ে সেই খেলোয়াড় পিছন দিকে ছুঁড়ে মারে। বৃত্তাকার যেকোনো ঘরের অভ্যন্তরে দাগ না ছুঁয়ে যদি চাড়াটি সে ফেলতে পারে তবে সে জয়ী হবে (এক গোলা হবে)। আর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার যেকোনো জায়গায় ভুল করলে সে হবে মরা এবং অন্যজন খেলা শুরু করবে। বৃত্তাকার যেকোনো ঘরের অভ্যন্তরে দাগ না ছুঁয়ে নিয়মানুযায়ী চাড়া ফেলতে পারার নাম *ঘর কেনা*। যে ঘর আগে কিনতে পারে তার জয় আগে হয়।

একাধিক খেলোয়াড় একসঙ্গে এই খেলা খেলতে পারে।

১৫. কানামাছি

যে কোনো সমতল স্থানে এবং নাতিদীর্ঘ পরিসরে খেলা যায়।

সচরাচর ৬/৭ জন মিলে এই খেলা খেলে।

প্রথমে যে কোন একজন তার হাতের একটি আঙুল একজনকে সাক্ষী রেখে গোপনে ফোটায়, তারপর সবার সামনে হাত রাখলে প্রত্যেক খেলোয়াড় ১ টি করে আঙুল ধরে। যে ফোটানো আঙুলটি ধরে সে প্রথমে কানামাছি হয়। তার চোখ বাঁধা হয়। চোখ বাঁধার পর সকল খেলোয়াড় বলে–

'কানামাছি বো বো, যারে পাচ্ তারে ছোঁ'।

www.pathagar.com

তখন যে কানা হয় সে অন্য খেলোয়াড়দের ধরতে চেষ্টা করে। যদি কাউকে ধরতে পারে এবং তার নাম বলতে পারে, তবে সে কানার ভূমিকায় নামে। তার চোখ বেঁধে পূর্বোক্ত মতে খেলা শুরু হয়। কিন্তু নাম যদি বলতে না পারে, তবে অন্য কাউকে ধরে তার নাম বলার প্রয়োজন পড়ে। যতক্ষণ কাউকে ধরে তার নাম বলতে না পারবে ততক্ষণ সে কানামাছি হয়ে থাকবে।

১৬. টেকরা টেকরি

প্রতিটি দলে জোড় সংখ্যার খেলোয়াড় থাকবে। একদল মাঠের একপ্রান্তে একটি বৃত্তে দাঁড়ানো থাকে (টস জয়ী)। এখানে থাকা অবস্থায় বিপক্ষ দলের কেউ তাদের আউট করতে পারবেনা। বরং বৃত্তে দাঁড়ানো অবস্থায় টস জয়ী কেউ বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করলে ওই খেলোয়াড় আউট হয়ে যাবে। বৃত্তের ভেতরকার খেলোয়াড়দের মূল লক্ষ্য, মাঠের শেষ প্রান্তে থাকা নির্দিষ্ট একটি দাগ অতিক্রম করা। আর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের লক্ষ্য তাদের সেই কাজ করতে না দেয়া। বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসা খেলোয়াড়কে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ছুঁয়ে দিলে সে আউট হয়ে যাবে। আর তাদের ফাঁকি দিয়ে কোনো খেলোয়াড় দাগ অতিক্রম করলে ১ পয়েন্ট পাবে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ১ পয়েন্ট, আর রাজার জন্য ৫ পয়েন্ট। অর্থাৎ রাজা যদি দাগ অতিক্রম করে তবে দল ৫ পয়েন্ট পাবে। পালা বদল করে দুদল কয়েকবার এই খেলা খেলার পর যার পয়েন্ট বেশি হবে সেই দল জয়ী হবে।

১৭. সেল

৬টি তেতুল বিচি থাকবে, দুজনে খেলবে।

প্রথমে ৬টি বিচি উঠোনে ফেলতে হবে। ইচ্ছে মত দুটি গুটি সে তুলে ফেলবে। অপর পক্ষ যে বিচি তার হাতের বিচি দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে স্পর্শ করতে বলবে, তা স্পর্শ করতে হবে। স্পর্শ করতে না পারলে অপর জন খেলার সুযোগ পাবে। আর পারলে তার এক গেম হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

১৮. কানাকানি

খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনির্দিষ্ট, তবে দল থাকবে দুটি এবং উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় খেলবে। একজন নিরপেক্ষ রেফারি লাগবে।

খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজন করে দুজন রাজা হবে। অন্যরা সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবে। এক দলের রাজা এসে রেফারির কাছে অন্য দলের একজনের নাম বলবে। সে উঠে আসলে *মরা* হবে। পরে অন্যদলের রাজা এসে রেফারির কাছে পূর্বোক্ত দলের একজনের নাম বলবে। সে উঠে আসলে *মরা* হবে। যার নাম বলবে সে উঠে না আসলে ওই দল এক পয়েন্ট পাবে। অনেকটা টাই ব্রেকারের মতো এই খেলা ইচ্ছে অনুযায়ী খেলোয়াড়রা ঘণ্টা -দুই ঘণ্টা খেলে।

www.pathagar.com

১৯. চোর-পুলিশ

সাধারণত চারজন মিলে এই খেলা খেলে।

উপকরণ হিসেবে একটি খাতা, একটি কলম এবং কয়েক টুকরো সাদা কগজের প্রয়োজন হয়। কাগজ গুলোর একটিতে লেখা হয় চোর, পাশে বা নিচে লেখা থাকে ০। অপর একটি কাগজে লেখা হয় পুলিশ, পাশে বা নিচে লেখা থাকে ৫০০। অন্য একটি কাগজে লেখা হয় ডাকাত, পাশে বা নিচে লেখা থাকে ৩০০। দারগা শব্দটি আর একটি কাগজের টুকরোতে লেখা হয় এবং এর পাশে বা নিচে লেখা থাকে ৮০০ বা ১০০০। কাগজের টুকরোগুলো সমান হয় এবং একইভাবে উল্টোদিকে ভাঁজ করে যেকোনো একজন উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে। মাটি বা টেবিলে এগুলো পড়ার পর একজন একজন করে সবাই কাগজগুলো তুলে হাতে নেয় এবং কে কী পেয়েছে তা খুলে পড়ে। যারা দারগা বা পুলিশ হয়, তারা সবার সামনে তা প্রকাশ করে। দারগা তখন পুলিশকে চোর বা ডাকাত যে কোনো একজনকে ধরতে বলে। বলার ভঙ্গি হয় এরকম-*পুলিশ পুলিশ চোরকে পাকড়াও*। চোরকে পাকড়াতে বললে পুলিশকে কেবল চোর, আর ডাকাতকে পাকড়াতে বললে কেবল ডাকাতকেই পাকড়াতে হয়। অর্থাৎ কার হাতে চোর' লেখা কাগজটি পড়েছে, তা পুলিশকে বলতে হয়। পুলিশ যদি সঠিকভাবে চোর ধরতে পারে, তবে সে ৫০০ নম্বর পাবে, চোর পাবে শূন্য। আর বলতে না পারলে, পুলিশ পাবে শূন্য, চোর পাঁচশ। দারগা যদি ডাকাতকে পাকড়াতে বলে, তবে সঠিকভাবে বলার জন্য পুলিশ পাবে ৫০০, আর চোর পাবে ডাকাতের ৩০০ নম্বর। আর যদি বলতে না পারে, তবে পুলিশ পাবে ০, আর চোর পাবে ৫০০। দারগা তার জন্য নির্ধারিত ৮০০ বা ১০০০ নম্বর এমনিতেই পেয়ে যাবে। এভাবে ভাঁজ করা কাগজগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ২০-২৫ বার খেলা হয়। নম্বর গুলো খাতায় লিখে রাখার কারণে খেলার শেষে বোঝা যায় (যোগফল থেকে) কে প্রথম এবং কে ২য় হলো।

২০. দাঁড়াগুটি

একটি লম্বা এবং একটি ছোট রুলার বা গাছের কাণ্ড দ্বারা নির্মিত দণ্ডের সাহায্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে মাটিতে ছোট একটি লম্বাটে গর্ত খুড়ে, আড়াআড়ি ভাবে কাঠ বা গাছের ছোট টুকরাটিকে রাখা হয়। পরে একজন খেলোয়াড় গর্তের ভেতরে বড় দণ্ড ঢুকিয়ে ছোট দণ্ডটিকে দূরে নিক্ষেপ করে। যে স্থানে দণ্ডটি পড়ে, সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় গর্তের দিকে সেটিকে ছুঁড়ে মারে। যদি ছোট দণ্ডটি গর্তে বা গর্তের দুআঙ্গুল পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে পড়ে, তবে বড়দণ্ড ধারণকারী খেলোয়াড় *শেষ* হয়ে যায়। আর যদি তা দূরে পড়ে অথবা দণ্ড ধারণকারী তার হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র দণ্ডটিকে আবারো দূরে নিক্ষেপ করতে পারে, তবে সে পয়েন্ট পাবে। হাতের বড় দণ্ড দ্বারা পয়েন্ট গুনতে দেখা যায়। পতিত স্থান থেকে গর্ত পর্যন্ত গুনা হয়। ছোট দণ্ডটি দূরে নিক্ষেপের সময় যদি বিপক্ষের খেলোয়াড় তা ক্যাচ নেয়, তবে নিক্ষেপকারী আউট হয়ে যাবে।

এভাবে ১০বার খেলার পর যার পয়েন্ট বেশি থাকে, সে জয়ী হয়।

www.pathagar.com

২১. রাজা ও চোর

খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৫জন।

রাজা থাকবে একজন, চোরও একজন, বাকি তিনজনের নাম রাজা ঠিক করবে।

রাজা চোরের চোখ বন্ধ করে রাখবে, আর বাকি তিন জনের একজন এসে তার কপালে আঙুল দিয়ে টোকা দিবে। স্ব স্থানে ফিরে যাওয়ার পর তিনজনই হাত দিয়ে সশব্দে তালি দিতে থাকবে। রাজা চোরের চোখ খুলে দিলে বলতে হবে কে তাকে টোকা দিয়েছিল। ঠিকঠাক্ বলতে পালে টোকা দানকারী চোর হবে, নতুবা চোরকে পুনরায় চোর হতে হবে। এভাবে যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ এই খেলা খেলা যায়। .

২২. মাছের নাম না ফুলের নাম

এই খেলার জন্য ১০ বা ১২জন মানুষের প্রয়োজন। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১২জন হলে ৬জন করে দল হয় দুটি। দুটি দলেই একজন করে রাজা থাকে, এরা খেলাটি নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রথমে রাজা ব্যতীত অন্যান্য ৫ খেলোয়াড় পাশাপাশি সারি বেঁধে বসে। ৮ থেকে ১০ ফুট দূরে, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রাও সারি বেঁধে মুখোমুখি বসে। রাজাগণ এর পূর্বে স্ব স্ব দলের খেলোয়াড়দের নামকরণ করেন। এক্ষেত্রে একদল মাছের নামে অন্যদল ফুলের নামে নামকরণ করে। যেমনঃ পাবদা, বোয়াল, রুই এবং শাপলা, পদ্ম, গোলাপ প্রভৃতি। লটারিতে বিজয়ী দলকে এখানে ক এবং অন্য দলকে খ নামে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ক-দলের রাজা খ-দলের যে কোনো একজনের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে ডাক দেয়- 'আয়রে আমার পাবদা মাছ'। পাবদা নামক খেলোয়াড় তখন তার স্থান থেকে উঠে এসে চোখ ঢাকা খেলোয়াড়ের মাথায় বা কপালে আঙ্গুল দ্বারা টোকা দিয়ে পূর্বস্থানে গিয়ে বসে। ক-দলের রাজা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের চোখ খুলে দেয়ার পর যদি সে কপালে আঘাতকারীকে শনাক্ত করতে পারে, তবে তার দল এক পয়েন্ট লাভ করে। আর যদি না পারে তবে ক-দল এক পয়েন্ট লাভ করবে। পরে খ-দলের রাজাও একই ভাবে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের চোখ ধরে ডাকে- *আয়রে আমার শাপলা ফুল* ।

অনেক সময় এই খেলায় কারচুপি হয়। রাজারা এমন একটি ইঙ্গিত শিখিয়ে দেয়; যাতে কাপালে টোকাদানকারী খেলোয়াড়কে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়। যেমনঃ মাথা চুলকালে শাপলা, কপাল চুলকালে পলাশ প্রভৃতি। দুপক্ষের খেলোয়াদেরই এজন্য খুব সতর্ক থাকতে হয়।

২৩.হাব্বা-ডাব্বা

খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।

উঠোনে একটি গোল দাগ দিয়ে সবাই তার উপর দাঁড়াবে। বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু স্থাপন করে একসঙ্গে বলবে *হাব্বা*।

www.pathagar.com

এরপর হাত উল্টিয়ে পৃষ্ঠদেশ পরস্পরের উপর স্থাপন করে আগের ভঙ্গিতেই বলবে *ডাব্বা*।

বৃদ্ধাঙ্গুল হাতের তালুতে স্থাপন করে এরপর বলবে *কলসি* (অবশ্যই সবাইকে একসঙ্গে বলতে হবে)। অতঃপর কনুই হাতের তালুতে স্থাপন করে বলতে হবে *কনি* এবং সব শেষে মাথার উপর দুহাতের তালু স্থাপন করে বলবে *মাথা*।

যদি কোনো খেলোয়াড় একই সঙ্গে সবার সাথে হাত মেলাতে না পারে, অথবা একই সঙ্গে বা সঠিকভাবে উপর্যুক্ত শব্দ গুলো বলতে না পারে, তবে সে চোর হবে।

চোর গোলাকার বৃত্তে অবস্থান করবে, আর অন্যান্যরা তার বাইরে অবস্থান/দৌড়াদৌড়ি করবে। যদি চোর বৃত্ত থেকে বের হয়ে কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে, তবে সে চোর হবে। আর যদি চোর বৃত্ত থেকে বের হবার সময় বাইরের সবাই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে চোরকে পুনরায় চোর হতে হবে।

এবাবেই হাব্বা-ডাব্বা খেলা চলতে থাকে।

২৪. নুন্‌তা

খেলোয়াড় : তিন বা তার বেশি। তবে অধিক হলে দশজন।

খেলার পদ্ধতি

প্রথমে একজন খেলোয়াড় তার দুই হাতের দশটি আঙ্গুলের মধ্যে লুকিয়ে একটি আঙ্গুল ফোটায়। ফোটানোর পর সবার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে প্রত্যেকে যে কোন একটি করে আঙ্গুল ধরে। যে ফোটানো আঙ্গুল ধরে সে 'কাউ' (অন্যদের থেকে আলাদা) হয়। তারপর সবাই তার চারপাশে দাঁড়ায়। তখন 'কাউ' ও অন্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়–

কাউ বলে– নুন্‌তা এক দুই তিন

সবাই বলে– আমার ঘরে কে রে

কাউ– আমিরে

সবাই– কী খাস্

কাউ– লবণ খাই

সবাই– লবণের সের কত?

এরপর সবাই দৌড়ানো শুরু করে, এ সময় 'কাউ' যে কোন জনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে।

যতক্ষণ কাউকে ছুঁতে বা স্পর্শ করতেনা পারে ততক্ষণ দৌড়ায়। কাউকে স্পর্শ করতে পারলে যাকে স্পর্শ করে সে আবার 'কাউ' হয় এবং পূর্বোক্ত কথোপকথন বলে পুনরায় খেলা শুরু হয়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

২৫. ইটুল বিটুল

খেলোয়াড় : যত খুশি তত জন।

www.pathagar.com

খেলার পদ্ধতি

প্রথমে প্রত্যেক খেলোয়াড় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। তারপর যে কোন একজন সবাইকে লক্ষ্য করে একে একে বলতে থাকে–

ইটুল বিটুল চিটুল ছা
প্রজাপতি উড়ে যা
যার উপরে গিয়া পড়ব
সে হইব কাঁ।

এই শেষ 'কাঁ' শব্দটি যার উপর পড়বে সে 'চোর' হবে। চোর প্রথমে একটি নির্দিষ্ট খুটি বা গাছে ধরে দাঁড়াবে। তারপর সবাই দৌড় শুরু করলে চোর এক নিঃশ্বাসে যতটুকু শ্বাস নেয়া যায় তা নিয়ে খুটি থেকে বেরিয়ে 'ইটুল বিটুল চিটুল ছা' বলে সবাইকে দৌড়াতে থাকবে এবং যে কাউকে ছুঁয়ে দিতে চেষ্টা করবে। যদি কাউকে শ্বাস থাকাকালীন ছুঁতে পারে এবং সময়ের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসতে পারে তাহলে যাকে ছুঁবে সে পরবর্তীতে চোর হবে। কিন্তু ছোঁয়ার পর ঘরে ফিরে আসার সময় শ্বাস ছেড়ে দিলে এবং 'ইটুল বিটুল' বলা বন্ধ করলে এবং ওই সময় অন্য কোনো সহ খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে দিলে সে-ই পুনরায় চোর হবে। সহ খেলোয়াড় ছুঁয়ে দিতে না পারলে অবশ্য তাকে পুনরায় চোর হতে হয়না। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

২৬.আলু আলু

১০-১২জন মিলে এই খেলা খেলে। দুটি দল থাকে, উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। দুদলের জন্য দুটি ঘর থাকে, তবে কাবাডির মতো নয়, মাঝখানে আর একটি ঘরের সমান কিছু স্থান উন্মুক্ত থাকে। একটি দাগ উভয় ঘরের মাঝখানে থাকে এবং সেই দাগের উপর একটি আলু রাখা হয়। টস জয়ী দল দাগ থেকে আলুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। প্রথমে টসজয়ী দলের একজন খেলোয়াড় এক শ্বাসে দাগ থেকে আলু আনতে যায়। মুখে তখন সে বলতে থাকে-

আলু আলু খেলতে গেলে মা করে মানা
হাত পা ভেঙ্গে গেলে যাব ডাক্তার খানা। যাব ডাক্তার খানা... .. ..

প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলোয়াড়রা তখন তাদের ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে তাকে আটকানোর চেষ্টা করে। যদি খেলোয়াড়টিকে টেনে তারা নিজেদের ঘরে নিয়ে আসতে পারে, এবং তার শ্বাস বা ডাক বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে *মরা* হবে। আর যদি ওই খেলোয়াড় ডাক থাকা অবস্থায় আলু নিয়ে তার ঘরে ফিরে আসতে পারে, বা ঘরের দাগ স্পর্শ করতে পারে, তবে তাদের *এক গুলা* হবে। ডাক থাকা অবস্থায় বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় সেই খেলোয়াড়কে স্পর্শ করলে বা সে নিজে কাউকে স্পর্শ করলে সে *মরা* হবে। এভাবে উভয় দলের খেলোয়াড় একজনের পর একজন (টাই ব্রেকার ফুটবল শটের মত) খেলতে থাকে।

www.pathagar.com

২৭. গাইয়া গুটি

প্রয়োজনীয় উপকরণ : দেড় থেকে দুই ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি এবং ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি রুলার আকৃতির কাষ্ঠ দণ্ড (কর্তিত বা গাছের ভাঙা সরু ডাল)।

খেলার নিয়ম

দুই ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি কাষ্ঠদণ্ড প্রথমে মাঠের মধ্যবর্তী একটি স্থানে উইকেটের মতো পোঁতা হয়। তারপর এর সামনে দাঁড়িয়ে টস জয়ী খেলোয়াড় বড় দণ্ডটির একটি প্রান্ত মুষ্ঠির মধ্যে ধরেন। মুষ্ঠির উপরে ছোট দণ্ডটিকে এমনভাবে রাখা হয়, যাতে বড় দণ্ডের কারণে ছোট দণ্ডটি আটকে থাকে। খেলোয়াড়টি অতঃপর ছোট দণ্ডটিকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লম্বা দণ্ড দ্বারা আঘাত করে একে দূরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে। আঘাত প্রাপ্ত ছুটে যাওয়া দণ্ডটিকে যদি ওই সময় বিপক্ষের খেলোয়াড় তালুবন্দি করতে পারে, তবে সে শেষ হয়ে যাবে এবং বিপক্ষের খেলোয়াড় পূর্বের মত খেলা শুরু করবে। আর যদি তা না হয়, তবে পতিত স্থান থেকে গুটি (ছোট দণ্ড) তুলে উইকেটের দিকে ছুঁড়ে মারবে। গুটি উইকেটে বা তার খুব কাছে অর্থাৎ লম্বা দণ্ডের চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে পড়লে, সে শেষ হবে। আর তা না হলে যেখানে গুটি পড়বে সেখান থেকে লম্বা দণ্ড দ্বারা উইকেট পর্যন্ত এভাবে গুনবে-গাইয়া, দুইয়া, তেনা, চাইরা, পাঞ্জা, ছইল, মইল, কদম, গুট। এক, দুই বা তিনগুট সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলে পুনরায় একইভাবে খেলা শুরু হবে। আর যদি এমন হয় একগুট ছইল বা শুধু ছইল, তবে একপায়ের পাতায় গুটি রেখে, ওই পা উপরে তুলে গুটি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লম্বা দণ্ড দ্বারা আঘাত করতে হবে। অর্থৎ শুরু থেকে হলে হাতের মুষ্ঠিতে, নতুবা দুইয়া হলে বৃদ্ধা ও তর্জনী, তেনা হলে বৃদ্ধা, তর্জনী ও অন্য একটি আঙ্গুল, চাইরা, পাঞ্জা, হলে অনুরূপ ৪ ও ৫ আঙ্গুল দ্বারা ধরে এবং *ছইল* হলে উপরে উল্লিখিত নিয়মে খেলতে হবে। মইল ও কদম হলে যথাক্রমে যে কোন কানের উপর এবং মাথার উপর গুটি রেখে খেলতে হয়। শূন্যে ছুঁড়ে মারার সময় যদি বড় দণ্ড দ্বারা গুটিকে দু'বার আঘাত করা যায় (দুই বাড়ি) তবে দূরত্ব গুনতে হবে বড় দণ্ডের পরিবর্তে ছোট দণ্ড বা গুটি দ্বারা। আর যদি তিনবাড়ি দেয়া যায়, তবে গুনতে হবে মুষ্ঠি দ্বারা। চার বা তার বেশি বার আঘাত করতে পারলে দুই আঙ্গুল দ্বারা (এক ইঞ্চি) দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় উইকেটের দিকে গুটি ছুঁড়ে ফেলার সময়, পক্ষের খেলোয়াড় বড় দণ্ড দ্বারা আঘাত করে (ক্রিকেটের মত) একে দূরে নিক্ষেপ করতে পারবে। তখন গুটির পতিত স্থান থেকে উইকেটের দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। যার যত বেশি গুট হবে, সে বিজয়ী হবে।

২৮. মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া 'কাং'

মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় একটি খেলা হচ্ছে 'কাং খেলা'। এ খেলা সাধারণত শজিবু চেরাওবা (মণিপুরিদের নববর্ষ), রথযাত্রা উৎসবে অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে খেলাটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা বছরই মণিপুরি অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কাং খেলা নিয়ে বিভিন্ন লোকগাথা প্রচলিত আছে। মণিপুরিরা বিশ্বাস

www.pathagar.com

করেন— পৃথিবীর সৃষ্টির আনন্দ লগ্নে, চন্দ্র-সূর্য উদয়ের মুহূর্ত উদযাপনের সময় সাতজন লাইনিংথৌ (দেব) এবং সাতজন লৈমারেন (দেবী) এই খেলাটি শুরু করেছিলেন। মণিপুরিদের অতীত ইতিহাসের একমাত্র সঠিক তথ্য সম্বলিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র, যা ৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আছে সেই রাজকীয় ঘটনাপঞ্জি 'চৈথারোল কুম্বাবা'র তথ্যানুসারে কাং খেলা শুরু হয় ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লোয়তোংবার আমলে।

কাং একটি ইনডোর গেম। এ খেলা আয়তকার কোর্টে অনুষ্ঠিত হয় যার দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ সাড়ে ১৬ ফুট। কোর্টে ২টি লাইন থাকে— আউটার লাইন এবং ইনার লাইন। আউটার লাইনকে বলা হয় লামথা কাংখুল। এ লাইনে ৭টি টার্গেট পয়েন্ট থাকে। ইনার লাইনকে বলা হয় চেকফৈ কাংখুল। এ লাইনে টার্গেট পয়েন্ট থাকে ৮টি। কাং এর আকৃতি ডিম্বাকার। যার দৈর্ঘ্য সাধারণত সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি এবং প্রস্থ সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে পৌনে চার ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এর ভর ১৬ তোলা (প্রায় ২০০ গ্রাম)। আগের দিনে কাং তৈরী হতো হাতির দাঁত, মহিষের শিং, কচ্ছপের খোলস দিয়ে। বর্তমানে প্লাস্টিকের তৈরি কাং বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

কাং খেলা দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দলে সাতজন খেলোয়াড় থাকে। এ খেলায় স্কোর হয় ২টি চেকফৈ ও ১টি লামথা দিয়ে। চেকফৈ হলো দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে হাত দিয়ে কাং ছুড়ে টার্গেট পয়েন্টে আঘাত করা। আর লামথা হলো বসে আঙুল দিয়ে কাং ছুঁড়ে দিয়ে টার্গেট পয়েন্টকে আঘাত করা। এভাবে ২টি চেকফৈ লাগানোর পর ১টি লামথা টার্গেট পয়েন্টে আঘাত করতে পারলেই ১ পয়েন্ট। একদল যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি সুচারুভাবে করতে থাকবে অর্থাৎ যতক্ষণ স্কোর করতে থাকবে ততক্ষণ তাদের ইনিংস চলতে থাকবে। প্রত্যেক খেলোয়াড় ১ পয়েন্টের জন্য ১টি মাত্র চেকফৈ, লামথা ছোঁড়ার সুযোগ পায়। অর্থাৎ সাতজন খেলোয়াড় স্কোর করার জন্য সর্বোচ্চ ৭টি করে চেকফৈ ও লামথা ছোড়ার সুযোগ পায়। কোন দল যদি স্কোর করার জন্য প্রয়োজনীয় লামথা বা চেকফৈ অর্জন করতে না পারে তবেই বিপক্ষ দল তাদের ইনিংস শুরু করার সুযোগ পায়। এভাবেই খেলা চলে। এ খেলার নির্ধারিত সময় হচ্ছে ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। দুই অর্ধে খেলাটি সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক অর্ধের সময় ২ঘন্টা ১৫ মিনিট। খেলার মাঝখানে ৫মিনিট বিরতি দেয়া হয়। বিরতির পর দলগুলোর দিক পরিবর্তন করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর যে দল সবচেয়ে বেশি স্কোর করবে সে দলই বিজয়ী হয়। এখানে উল্লেখ্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য মাঠে আলাদা নির্দিষ্ট ট্র্যাক থাকে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে স্ব স্ব ট্র্যাকে অবস্থান করে খেলতে হয়। কর্তৃপক্ষ বা রেফারির অনুমোদন ছাড়া কোন খেলোয়াড় ট্র্যাক বদল করতে পারে না। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাঁর নিজস্ব কাং ব্যবহার করে থাকে। অনুমতি ব্যতিত কোন খেলোয়াড় অন্যজনের কাং ব্যবহার কিংবা একই

www.pathagar.com

কাং একাধিক খেলোয়াড় ব্যবহার করতে পারে না। বিরতির পর অংশগ্রহণকারী দল ২/৩ জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করতে পারে তবে সেটা রেফারিকে অবহিত করে। 'কাং' খেলাটি মণিপুরীদের নিজস্ব খেলা হলেও বর্তমানে এই খেলাটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

তথ্যদাতা

১. মো. শফিক মিয়া, পিতা : মো. আব্দুল খালেক মিয়া, মাতা : মোছা. রেনু বেগম, রেল কলোনী, ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার
২. আহমেদ হুসাইন, পিতাঃ রইছ উদ্দিন, মাতাঃ লিলি বেগম, বয়সঃ ২৮ বৎসর, নারাইনপুর, কানাইঘাট
৩. মো. সিতু মিয়া, পিতা : আমীর আলী, মাতা : আকিমা আক্তার, সাদেকপুর, পূর্ব গৌরীপুর, বালাগঞ্জ
৪. মৃত্তিকা পরমা প্রাচী, পিতাঃ কাজল কান্তি দাস, মাতাঃ রূপালী রাণী দাস, বয়স ১২ বৎসর, গোলাপগঞ্জ
৫. মৃদুলা উপমা শ্রুতি, পিতাঃ কাজল কান্তি দাস, মাতাঃ রূপালী রাণী দাস, বয়সঃ ০৯ বৎসর, গোলাপগঞ্জ।
৬. শৈলেন সরকার, বাবাঃ শশীন্দ্র সরকার, মাঃ কুকি রাণী সরকার, বয়স ৩২ বৎসর, করের পাড়া, সিলেট
৭. অন্তশ্রী দাস, পিতাঃ গোপাল চন্দ্র দাস, মাতাঃ শিপ্রা দাস, বয়সঃ ১৩ বৎসর, হাওয়লদারপাড়া
৮. রাতুল তালুকদার, পিতাঃ মাখন তালুকদার, মাতাঃ মীনু রাণী তালুকদার, বয়সঃ ১৫ বৎসর, মজুমদার পল্লী, সিলেট
৯. অনন্যা ভৌমিক মিতু, সমরেন্দ্র ভৌমিক , গীতা দাস, বয়সঃ ১৬ বৎসর, করের পাড়া
১০. শৈশব সরকার, বাবাঃ শশীন্দ্র সরকার, মাঃ কুকি রাণী সরকার, বয়স ৩০ বৎসর, করের পাড়া, সিলেট
১১. প্রাপ্তি রাণী চক্রবর্ত্তী, বাবাঃ পিন্টু চক্রবর্ত্তী, মাতাঃ বিথী চক্রবর্ত্তী, বয়সঃ ১৩ বৎসর, মজুমদার পল্লী, সিলেট
১২. শ্রাবন্তী চৌধুরী, পিতাঃ নিলেন্দু চৌধুরী, মাতাঃ কুমকুম চৌধুরী, বয়সঃ ১৪ বৎসর, নাছিরাবাদ, বিলপাড়
১৩. শ্রাবন্তী গুণ মান্টি, পিতাঃ হিমাংশু লাল গুন, মাতাঃ শুক্লা গুন, করের পাড়া, সিলেট
১৪. নন্দন দাস, পিতাঃ নবেন্দু দাস, বয়সঃ ১৫ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
১৫. প্রীতম দেব, পিতাঃ নিতাই দেব, বয়সঃ ১৩ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া, সিলেট
১৬. বেলাল আহমদ, পিতাঃ নজরুল ইসলাম, মাতাঃ হাসনা বেগম, বয়স ২৫ বৎসর, নারাইনপুর, কানাইঘাট
১৭. মো. কামাল উদ্দিন, পিতাঃ শামসুল ইসলাম, বয়সঃ ২৭, মহিষখেড়, বড়নগর, গোয়াইন ঘাট
১৮. রাশেদ আহমদ, পিতাঃ শফিকুর রহমান, মাতাঃ আসমা বেগম, বয়সঃ ২৪ বৎসর, গঙ্গাজল, জকিগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

আয়ুর্বেদ ও কবিরাজি চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় লোকবিশ্বাস ও লোকবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে নিম্নোক্ত লোকচিকিৎসার উদ্ভব বলে আমাদের ধারণা।

কাশি

হিংড়ানি পাতার রস : সাধারণত অল্প বা অধিক কাশি হলে এই পাতার রস খাওয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : কয়েকটি হিংড়ানি পাতা ভাল করে ধুয়ে পিষে এর রস খেতে হয়। দিনে ২ থেকে ৩ বার খাওয়া যায়। কাশি কমার আগ পর্যন্ত খাওয়া চলে। যে কোনো বয়সের মানুষ খেতে পারে। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বয়স ২ বছর বা তার অধিক হতে হয়।
উপকারিতা : এতে কাশি কমে যায়।

জ্বর, সর্দি ও কাশি

আদা-তুলসি পাতার মিশ্রণ : অনেক সময় জ্বর, সর্দি-কাশি একসাথে চলতে থাকলে এই চিকিৎসা দেয়া হয়।

চিকিৎসার পদ্ধতি : প্রথমে তুলসী পাতা ভাল করে পিষে রস বের করে এক চা কাপের সমপরিমাণ রস নেয়া হয়। এর পর সেবক বা সেবিকা একটুকরো আদা পিষে তুলসি পাতার রসে মিশিয়ে রোগীকে খাইয়ে দেন। এই রস দিনে ৩ বার সেবন করানো হয়।
উপকারিতা : জ্বর, সর্দি ও দীর্ঘদিনের কাশি কমে।

জ্বর

পান পাতার রস : জ্বর থেকে নিবৃত্তি বা মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে পান পাতার রস ব্যবহার করে থাকেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি: দুটি পান পাতা ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পিষে নিয়ে তার রস রোগীর মাথায় দেয়া হয়। দৈনিক এক থেকে দুই বার দেয়া যায়। এ চিকিৎসায় বয়সের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
উপকারিতা : অনেকে বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চিকিৎসায় জ্বর কমে যায়।

অনিদ্রা

কাসার তেল। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর রাতে ঘুম আসে না, মাথা ঘোরে। এ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

চিকিৎসা পদ্ধতি : একটি কাসার পাত্রে তিন বা চার চা চামচ সমপরিমাণ সরিষার তৈল নিয়ে ধীরে ধীরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট হাত দিয়ে ঘষার প্রয়োজন। তারপর তৈল খানিকটা মৃত্তিকা বর্ণ ধারণ করলে রোগীর মাথায় আলতো করে লাগাতে হয়। রোগীর মাথা এতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে অনেকেই দাবি করেন।

দাঁতের ব্যাথা : ১

কেরোন পাতার রস : সাধারণত দাঁতের মাড়ির ব্যথা এবং মাড়ি ফুলে যাওয়ার চিকিৎসায় এই পাতার রস ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : এক্ষেত্রে কয়েকটি কেরোন পাতা নিয়ে পিষে তার রস খাওয়া যায়। আবার, কয়েকটি কেরোন পাতা মুখে দিয়ে যে মাড়িতে ব্যথা ওই মাড়িতে নিয়ে চিবুলে ব্যথা কমে। দিনে এক থেকে দুইবার বা ব্যথা শুরু হলে চিবানো যায়।

উপকারিতা : এতে সাধারণ দাঁতের ব্যথা কমে যায়। তবে দীর্ঘ দিনের ব্যথা কমে না।

দাঁতের ব্যাথাঃ ২

সফরি (পেয়ারা) পাতার রস : দাঁতের ব্যথার জন্যে পেয়ারা পাতা পিষে রস ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : দাঁতের ব্যথা শুরু হলে কয়েকটি কচি সফরি (পেয়ারা) পাতা নিয়ে চিবানো হয়। দিনে যতবার ইচ্ছে চিবানো যায়।

উপকারিতা : এতে দাঁতের ব্যথা সাময়িক কমে।

দাঁতের ব্যথা-৩

নিমপাতা সেদ্ধ : দাঁতের মাড়ি ফুলে গেলে বা ব্যথা করলে বা উভয়টি হলে এই চিকিৎসা নেয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে কিছু নিমপাতা পানিতে দিয়ে পানিটুকুকে ভাল করে সেদ্ধ করতে হবে। তারপর সেদ্ধ গরম পানি মুখে নিয়ে ভাল করে কুলি করতে হবে ও কিছুক্ষণ মুখে রাখতে হবে যাতে মাড়িতে তা কাজ করতে পারে। প্রত্যেকবার ১লিটার পানি সেদ্ধ করতে হয়। দিনে তিনবার মুখ কুলি করার প্রয়োজন পরে সকাল, দুপুর ও রাত্রে।

চোখ লাল হওয়া-১

ভাতের ছেক/ ভাতের শেক : সাধারণত চোখ উঠলে (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে) কিংবা সামান্য আঘাতে চোখ লাল হয়ে গেলে, অথবা চোখে চুলকানি দেখা দিলে, ভাতের এই ছেক দেয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : একটি শুকনো পরিষ্কার নরম কাপড়ে কিছু (এক/দুই মুষ্টি) গরম ভাত নিয়ে কাপড়টিকে ভালভাবে পেঁচিয়ে দেয়া হয়। কাপড়ে পেঁচানো গরম ভাত কিছুক্ষণ পরপর আঘাত প্রাপ্ত বা অসুস্থ চোখে লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ২ থেকে ৩ বার লাগানো যেতে পারে।

উপকারিতা : লাল হওয়া চোখ পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে বলে তথ্য দাতা দাবি করেন।

www.pathagar.com

চোখ ওঠা ২

লবণের পানি : আঞ্চলিক ভাষায় আমরা যাকে 'চোখ ওঠা' বলি এর চিকিৎসায় সাধারণত এই লবণের পানি ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : একটি পরিষ্কার পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে যেমন— একটি চায়ের কাপের সম পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে চা চামচের তিন চামচ লবণ দিয়ে তা ভালভাবে মেশাতে হবে। এরপর দুই চোখে দুই ফোটা করে চার ফোটা রোগীর চোখে দেওয়া হয়। এভাবে তিন ঘণ্টা পর পর দিতে হবে। চোখ স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত তা ব্যবহার করা যায়। এতে চোখের চোলকানি ও জ্বালাপোড়া কমে। পানি ও লবণের এই দ্রবণ একবার নিলে তা ৬ ঘন্টা পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। তারপর নতুনভাবে তৈরি করতে হয়।

হাত পা মচকানো/ব্যথা

চুল বাঁধা : আঘাতে কারও হাত পা মচকে গেলে বা তীব্র ব্যথা অনুভূত হলে কবিরাজ এ চুল বাধা চিকিৎসা দেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি : এই চিকিৎসা একজন মহিলা কবিরাজ করে থাকেন। তিনি প্রথমে তার মাথা থেকে একটি লম্বা চুল নিয়ে রোগীর আঘাত প্রাপ্ত স্থানে বাঁধেন তারপর নির্দিষ্ট মন্ত্র মনে মনে বলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান মালিশ করে দেন। এভাবে সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার দুই দিন মালিশ করালেই চলে। তাপর চুল খুলে ফেলা হয়।

উপকারিতা : ব্যথা কমে। হাত, পা মচকে গেলে ঠিক হয়ে যায় বলে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী জানান।

বি.দ্র. শনি ও মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহে অন্য কোনো দিন এ চিকিৎসা দেয়া হয় না। একজন মাত্র ব্যক্তিকে এই মন্ত্র শেখানো যায় বলে মহিলা কবিরাজের দাবি।

কেরোসিন তৈল মর্দন

অনেকক্ষেত্রে হাত বা পা মচকে গেলে বা ব্যথা পেলে এ চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি : এই চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। হাতের তালুতে সামান্য পরিমাণ কেরোসিন তেল নিয়ে তাতে এক বা দুই চিমটি লবণ মিশিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ভাল করে মালিশ করতে হবে। ব্যথা কমার আগ পর্যন্ত দিনে ১-২ বার মালিশ করা হয়।

আকন পাতার ছেক

সাধারণত হাত পা বা শরীরের অন্য কোন স্থানে ব্যথা পেলে ব্যথা পাওয়া স্থানে এই পাতার ছেক দেওয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে পাতাটি হালকা আগুনে রাখতে হবে। এতে পাতা খানিকটা গরম হয়ে তা থেকে এক ধরনের রস বের হতে থাকলে তখন পাতাটি ব্যথা পাওয়া স্থানের উপর রেখে হালকাভাবে চাপ দিতে হবে। এভাবে তিন-চারটি পাতার ছেক দিতে হয় একসাথে। ব্যথা কমার আগ পর্যন্ত দিনে ২-৩ বার এই ছেক দেয়া যায়।

www.pathagar.com

পেটের পীড়া -১

পাথরকুচি পাতার রস : পায়খানা নরম হলে বা আমাশয়ের দেখা দিলে রোগীকে পাথরকুচি পাতার রস খাওয়ানো হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে ২/৩ টি পাথরকুচি পাতা পরিষ্কার পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর পাটা-পোতা কিংবা অন্য যে কোনো উপায়ে পিষে তার রস রোগীকে খাওয়াতে হয়। এ পাতা রোগী ইচ্ছে করলে মুখে চিবিয়েও খেতে পারেন। দিনে দু বার (সকাল ও সন্ধ্যায়) রস খেতে হয়।

উপকারিতা : পেটের পীড়া অনেক ক্ষেত্রে ভাল হয়ে যায়।

পেটের চিকিৎসা-২

চুনের জল : পেটের ব্যথায় চুনের জল খাওয়নো হয়। সাধারণত পেট ব্যথা হলে পায়খানা পাতলা হলে চুনের পানি উপকারী।

চিকিৎসা পদ্ধতি : পেটে আংশিক ব্যথায় বা অনেকক্ষেত্রে তীব্র ব্যথায় চুন যে পাত্রে রাখা হয় সেখানটার চুনের উপর জমে থাকা পানি পান করা হয় আবার সাধারণত পানির সাথে চুন মিশিয়েও খাওয়া যায়। সাধারণত এক বা আধ গ্লাস পানি খাওয়া চলে।

অনেকক্ষেত্রে গ্যাসট্রিকের ব্যথায়ও এই পানি কার্যকর হয় বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস।

পেটের পীড়া–৩

পান পাতার ছেক : পেটে সাধারণত ব্যথা করলে এই পান পাতার ছেক দেওয়া হয়।
চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হবে। তারপর বাড়ির কর্ত্রী লণ্ঠনের আগুনে সামান্য গরম করে ১টি পান পাতা রোগীর পেটে ধীরে ধীরে ঘষে মন্ত্র পড়তে থাকেন। মন্ত্র শেষ হলে ঘষানোও শেষ হয়। এভাবে পরপর তিনটি পাতা ঘষে দেয়ার পর পাতাগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। বাড়ীর কর্ত্রীরাই সাধারণত এই মন্ত্র জানেন, তবে তারা না জানলে মহিলা কবিরাজ আনতে হয়। কেউ কেউ একে ডিট পুড়া বলেন।

মন্ত্র বলা ওস্তাদের নিষেধ; তাই কেউ মন্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

উপকারিতা : লোকশ্রুতি রয়েছে এতে পেটের ব্যথা কমে।

পেটের পীড়া–৪

শুকনা মরিচ ঘষানো : সাধারণত পেটে ব্যথা করলে এই শুকনা মরিচ ঘষিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।
চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে ১টি শুকনা মরিচ ভালকরে সরিষার তেলে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর তা রোগীর পেটে নাভীর উপর ঘষে দিতে হয় বা রোগী নিজেও ঘষতে পারেন। প্রায় ৩/৪ মিনিট ঘষার পর মরিচটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যদি

www.pathagar.com

পুড়ার সময় বেশি গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে বোঝতে হয় অন্যের নজরের ফলে পেটে ব্যথা তৈরি হয়েছে। একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটালে ব্যথা কমে যাবে। যদি গন্ধ কম হয় তাহলে অন্যের নজরে নয়, পেটের সমস্যার কারণে ব্যথা হচ্ছে বলে ধরে নেয়া হয়। তখন পূর্ববর্তী পদ্ধতি বা ডাক্তারের সাহায্য নেয়া হয়।

রক্তপাত-১

কলুম গাছের রস শরীরের কোনো অংশ সামান্য কেটে গেলে এই রস দিলে উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে একটি কলুম গাছ নিয়ে তা ছোট ছোট আকারে ভাঙতে হয়। ভাঙলে তা থেকে রস বেরিয়ে আসে। এ রস রক্ত পড়া বা কেটে যাওয়া স্থানে দিলে প্রথমে কিছুটা জ্বালাপোড়া করে। তবে কিছুক্ষণ পরে কমে যায়। রস অল্প আসে বলে বহুবার ভাঙতে হয় ও রস দিতে হয়। এভাবে এক সময় রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

সতর্কতা : এই রস যাতে কোনো অবস্থায় চোখে না পড়ে। অধিক কাটলে এই রস কার্যকর নয়।

রক্তপাত-২

রিফোজি পাতার রস শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে তা থেকে রক্তপাত বন্ধের জন্য রিফোজি পাতার রস ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে কয়েকটি রিফোজি পাতা ভাল করে পাটা-পোতায় বা অন্য কোনোভাবে পিষে তার রস একটি পাত্রে নিতে হবে। তারপর এই রস আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে।

রক্তপাত-৩

চুল ও আইন্দার (ঘরের উপরের কোণায় জমা ময়লা) : লোকশ্রুতি অনুযায়ী শরীরের কোন অংশে অতি সামান্য কেটে গেলে এ মিশ্রণ দিলে উপশম হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে ঘরের আন্দা সংগ্রহ করতে হবে। তারপর যে কোন একটি পাত্রে চুন নিয়ে তার পানিতে চুনের সাথে আন্দা ভাল করে মিশিয়ে তা যথাস্থা লাগাতে হয়।
বি.দ্র. শিং মাছের কাটার আঘাতে শরীরে ক্ষত হলে এই চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়।

রক্তপাত বন্ধকরণ-৪

গাদা ফুল গাছের পাতার রস : শরীরের কোন অংশ সামান্য কেটে গেলে এই পাতা রস কার্যকরী।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে কিছু গাধা ফুল পাতাকে হাতের তালুতে নিয়ে ভাল করে অন্য হাতের সাহায্যে পিষতে হবে। সামান্য পিষলেই তা থেকে রস বের হয়ে আসবে। বেরিয়ে আসা রস কেটে যাওয়া স্থানে লাগাতে হবে। এভাবে রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লাগাতে হয়।

শরীরের কোন স্থানে অধিক কেটে রক্তপাত হলে তা কার্যকর হয়না। তবে সামান্য কেটে গেলে এই পাতার রস দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

রক্তপাত বন্ধকরণ-৫

চুন :

শরীরের কোন অংশ সামান্য কেটে গেলে চুন ঘষে দেয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি :

প্রথমে হাতের আঙুলে সামন্য চুন নিয়ে তা কেটে যাওয়া স্থানে ভাল করে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর তা শুকানো প্রর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। শুকিয়ে গেলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় ও চুন পড়ে যায়।

ঘা

আগুনের ফোটা : শরীরের কোনো অংশ কেটে গিয়ে সেখানে ঘা হয়ে গেলে, বা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ঘা হলে এই চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি : একটি চিকন কাঠিতে কাপড় বাঁধতে হয়। যে অংশে লাঠি বা কাঠি ধরা হবে, তার বিপরীত দিকে অল্প কাপড় বেঁধে তা কেরোসিনে চুবিয়ে আগুনের কাছে নিলে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর ঘা আক্রান্ত স্থানে আগুনের কাঠি নিয়ে উপুর করে ধরলে দু-তিন ফোঁটা কেরোসিন পড়ে। এভাবে চার হতে পাঁচ বার আগুনের ফোঁটা দেয়া হয়।

হাত পা মচকানো-১

মাকড়শার আশ : কোন প্রকার আঘাতে হাত পা মচকে গেলে কবিরাজ এই চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি : এই চিকিৎসায় একজন কবিরাজ প্রথমে কিছু মাকড়শার আশ সংগ্রহ করেন। তারপর তা রোগীর মচকানো স্থানে পেঁচিয়ে নির্দিষ্ট মন্ত্র পড়ে ভালভাবে মালিশ করে দেন। এভাবে সপ্তাহের শনিও মঙ্গলবার দুই দিন মালিশ করলেই চলে।

উপকারিতাঃ এই চিকিৎসায় ব্যথা কমে মচকানো হাত পা ভাল হয়ে যায় বলে স্থানীয়রা দাবি করেন।

বি:দ্রঃ শনি ও মঙ্গলবার ছাড়া এই চিকিৎসা অন্য দিন হয় না। মন্ত্র কবিরাজ কাউকে বলেন না। তবে মৃত্যুর পুর্বে তিনি একজনকে তা শিখিয়ে দিয়ে যান।

হাত পা মচকানো-২

কেরোসিন ও লবনের মালিশ : সাধারণত হাত পা মচকে গেলে বা আগাতে কোন পায় ব্যথা পেলে এই চিকিৎসা দেয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে হাতের তালুতে সামান্য কেরোসিন নিয়ে তাতে কিছু লবণ দিয়ে রোগীর আঘাত প্রাপ্ত মচকানো স্থানে ভাল করে মালিশ করে দিতে হয়। এভাবে পর পর দুইবার প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে মালিশ করতে হবে।

উপকারিতা : এতে ব্যথা কমে যায় বলে দাবি করা হয়।

www.pathagar.com

পা মচকানো-৩
পা মচকালে কবিরাজ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেন এবং তেল দ্বারা মালিশ করেন। কেউ কেউ চ্যাং পিছল গাছের ছাল পিষে গরম করে মচকানো স্থানে লাগান।

মুখের দাগ-১
শসা : সাধারণত মুখের দাগ কিংবা ব্রন এর চিকিৎসায় শসা ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে ১টি শসার বেশ কিছু অংশ গোলাকার করে কেটে নিতে হবে। তারপর এগুলো ভাল করে সমগ্র মুখে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে হয় । প্রত্যেক বার ১টি শসাই যথেষ্ট । এভাবে পনেরো দিন ঘষলে মুখের দাগ অনেকাংশ কমে যায় বলে রোগীদের দাবি।

মুখের দাগ-২
হলুদ : হলুদ ও শসার মতো মুখের দাগ ও ব্রণ এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে কিছু হলুদ পাটা-পোতাল দ্বারা ভাল করে পিষে অনেকটা ভর্তার মতো নরম করে নেয়া হয়। তারপর আয়নার সামনে বসে তা সমগ্র মুখমণ্ডলে লাগিয়ে দিতে হবে। লাগানোর ২০ মিনিট পর মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হয়। এভাবে পনেরো দিন (দিনে ১ বার) লাগালে উপকারিতা পাওয়া যায় বলে অনেকের দাবি।

মুখের দাগ-৩
দুধের সর (গরম দুধ ঠাণ্ডা হওয়ার পর এর উপরে যে স্তর জমে তাই সর) : সাধারণত মুখের দাগ, ব্রণ কিংবা মেছতার চিকিৎসায় দুধের সর অত্যন্ত উপযোগী।

চিকিৎসা পদ্ধতি : সাধারণত দুধ গরম করার ১০ থেকে ১৫ মিনেট পর এই সর নেয়া যায়। সমগ্র মুখমণ্ডলে সর মেখে আধঘন্টা অপেক্ষার পর মুখ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। দিনে ১ থেকে ২ বার (সকাল-সন্ধ্যায়) ব্যবহার করা যায়।

উপকারিতা : চার সপ্তাহ নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দাগ, ব্রণ, মেছতা দূর হয় বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস।

বাতের ব্যথা
কদম পাতার ছেক/শেক
বৃদ্ধ লোকদের হাতে বা পায়ে বাতের ব্যথা সৃষ্টি হলে এই ছেক দেওয়া হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে ২ বা ৩টি কদম পাতা লণ্ঠনের আলোয় ভালভাবে গরম করে নিতে হয়। তারপর তা রোগীর ব্যথার স্থানে চেপে ধরতে হবে। এভাবে ৭-৮ বার ছেক দিতে হয় এবং প্রত্যেকবার পাতা পরিবর্তন বাধ্যতামূলক। দিনে দুই বার সকালও সন্ধ্যায় শেক দেয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কুকুরের কামড়

থাল পড়া : সাধারণত কুকুরে কামড়ালে এই থালপড়া দেয়া হয়। এলাকার কোনো কবিরাজ বা অধিক পুরনো লোক এই থালপড়া চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি : কুকুরে কামড়ানোর এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে কবিরাজ এই থালপড়া লাগান। কবিরাজ নির্দিষ্ট মন্ত্র মনে মনে পড়ে এই থাল ককুরে কামড়ানো রোগীর পিঠে লাগিয়ে দেন। অনেকটা অলৌকিক মনে হলেও এই থালটি কোনো কিছু ছাড়াই পিঠের সাথে লেগে থাকে বলে তথ্যদাতার দাবি। বিষ ধীরে ধীরে যখন শরীর থেকে নিঃশেষ হতে থাকে তখন থালটিও ঢিলে হতে থাকে। বিষ শেষ হলে থালটি আপনা থেকে পড়ে যায়।

মাথা ব্যথা

পেঁয়াজের রস : পেঁয়াজের রস ব্যবহারে মাথা ব্যথা কমে।

চিকিৎসা পদ্ধতি :

স্বাভাবিক বা অনেক ক্ষেত্রে তীব্র মাথা ব্যথায় এই পেঁয়াজের রস হয় ব্যবহৃত। একজনের মাথা ব্যথায় সাধারণত ২টি পেঁয়াজ ভাল করে পিষে তার রস ধীরে ধীরে রোগীর মাথায় লাগিয়ে দিতে হবে। মাথায় রস লাগানোর এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর মাথা ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

অন্যান্য-

কাশি

তুলসি পাতা, বাসক পাতা ও আদা একসাথে মিশিয়ে রস করে খাওয়ানো হয়।

এলার্জি

আক্রান্ত স্থানে পানের পিক লাগোনো হয়।

মাথা ধরা

মাথা ঘুরালে, বমি বমি ভাব করলে, হিন্দু নাগ সম্প্রদায়ভুক্ত বাড়ির কালো গরুর দড়ির আঘাত খেতে হয়।

কুকুরের কামড়

কুকুর কামড়ালে মাইলং এর পাতা খাওয়ানো হয়। অথবা,
ছনের চালার ভিতরে, পোকার লালা কলার ভিতর ঢুকিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়।

মাছের কাটা গলায় আটকানো

মাছের কাটা গলায় আটকালে কলাপড়া দেয়া হয়। একটি কলাকে মন্ত্র পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানোকে কলাপড়া বলে। কবিরাজ মন্ত্রটি সাধারণ কাউকে বলেন না, তবে মৃত্যুর পূর্বে তার নিকট আত্মীয়ের দুজনকে বলেন।

www.pathagar.com

চুলকানি

চুলকানি হলে নিমপাতা পিষে শরীরে লাগানো হয়।

আমাশয়

থানকুনি ও বামট পাতার রস আমাশয় রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ডায়রিয়া

লেবুর রস ও চিনি-লবণ মিশিয়ে শরবৎ তৈরি করে রোগীকে খাওয়ানো হয়। লুজন্ট পাতা ও থানকুনি পাতার রসের সাথে ছোট মাছ রান্না করে রোগীকে খাওয়ানো হয়।

কোষ্টকাঠিন্য

এই রোগে চিরতা ভেজানো জল রোগীকে খাওয়ানো হয়। আগের দিন রাতে চিরতাকে ভিজিয়ে রাখতে হয়, পর দিন সকালে খালি পেটে রস খেতে হয়। একমাস এই চিকিৎসা চলে।

সর্দি-কাশি

বামট পাতার রস আদা দিয়ে খাওয়ানো হয়।

তুলসি পাতা অথবা তুলসি ও আদার রস একসাথে মিশিয়েও কেউ কেউ সেবন করেন।

ফোঁড়া

লাল জবা ফুল পিষে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেঁটে যায়। প্রভৃতি।

খ. তন্ত্র-মন্ত্র

চোখের চিকিৎসায়

আলা সাত্তি মহামুতি
বাত্তি চোখে যত বাদাখাদা
আমার হাতে আয়।

সর্বরোগে

করাতো করাতো মহা করাতো
আমার করাতো আইতে কাটে
যাইতে কাটে
তরঙ্গিয়া পান কাটা, পাথর ছেদা
আড় ভাঙ্গা, চন্দ্রবান, সূর্যবান
করিল পানি।

www.pathagar.com

অমুকের (রোগীর নাম)
অসুখ ভাটি ছাড়ি না ধরিছ উজানি
ভাটি ছাড়ি উজান বাইবে
ঈশ্বর মহাদ্দেবের দোহাই পড়িবে
কার আজ্ঞা মহাদেবের আজ্ঞা
কার আজ্ঞা কামাখ্যার আজ্ঞা ॥

পাতলা পায়খানা
কালা লবন ধলা লবন ডিটমিট
পেট বিষ গাটছা গাছ
খাইয়া যায় নাই
নাই নাই নাই।

হাত পা কসকে (মচকে) গেলে
১.
কসকা আইল মসকা লইয়া
দেবী আইল তেল লইয়া
হইরর তেল মূলার তেল
মাইনজা দিলে কসকা গেল
এই সত্য লড়িবে
শিব দুর্গার দোহাই পড়িবে
এই সত্য লড়িবে
মহাদ্দেবের দোহাই পড়িবে
এই সত্য বৃথা গেলে
শিবে পার্বতীর বুনি খাবে।
২.
আত লড়ে আত বন
পাও লড়ে পাও বন
বন্দুকেরই গোলা বন্
কাল স্বর্প মারিয়া
কেশ বান্ধে ঝাড়িয়া
বৈরী ভাবে যে চায়
জিব্বা কাটি তালুত যায়।
এই সত্য লড়িবে
শিব-দুর্গার দোহাই পড়িবে
এই সত্য লড়িবে
তেত্রিশ কোটি দেবতার
দোহাই পড়িবে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

১. আগা (অগ্রভাগ) লক লক, গুড়ি (গোড়া) মৌ
খাইতায় নি গো (খোবে কি-না)
বাগনা (ভাগ্না) বউ।
—আখ)।

২. এক গাছা লতা (একটি)
গেল কলিকাতা।
—রাস্তা।

৩. ছয় চরণ কৃষ্ণ বরণ
কেশব বনে থাকে
দশ জনে দৌড়াইয়া
দুই জনে ধরে।
—উকুইন/ উকুন।

৪. হুফুর (ফুফু) বাড়িত গেছলাম
রক্ত দি ভাত খাইছলাম (খেয়েছিলাম)।
—লালশাক।

৫. আড়াত থাকি আয় কুদাইয়া (ধমক দিয়ে)
পাতো (পাতে) দেয় মুতিয়া (প্রসাব করে)।
—লেবু।

৬. চাইরোবায় (চারদিকে) কাঁটার বেড়া
মাজখানো (মধ্যখানে) লালবেটা।
—আনারস।

৭. ছোট থাকতে ঘোমটা
বড় হইলে লেমটা।
—বাঁশ।

৮. কান্দার উফরে (উপরে) কান্দা
লাল কাপড় দি বান্দা।
—থুর/ কলার থুর।

৯. এমন বেটির (মহিলার) হিয়া
মাটির নিচে পুত (পুত্র) থইয়া (রেখে)
গাছো উটে গিয়া।
—উল আলুর গাছ।

www.pathagar.com

১০. উনি গো উনি
হুনছ্ নানি (শুনিশ না?)
তোর করেদি (পিছনে)
দুই বুনি।
—কুলা।

১১. দশে শির (মাথা), নহে রাবণ
গোটা ধরে আষাঢ় শ্রাবণ
আগে ধরে গোটা,পাছে (পিছনে) কুল
কুন্ (কোন) মুর্খয় কইতো (বলতে) পারে
পণ্ডিত বেভুল।
—ঝিঙ্গা।

১২. য়িলঙ্গ (এখানে) লুটে (চলে), বিলঙ্গ (ওখানে) লুটে
লেজঅ (লেজে) মারলে, ফালদি উটে (ওঠে)।
—ঢেঁকি।

১৩. বীজ (লেখা) কালা, ভুই (কাগজ) ধলা
মাতেনা বেটির জবান বালা (ভাল)
যায় নিজপুর
থাকে বাদশার জোর।
—পত্র/চিঠি।

১৪. টিল্লার উফরে (উপরে) টিল্লা
তার উফ্রে মজম টিল্লা
তার উফ্রে রান্নার পাত্র
মজম টিল্লায় পাঁক দিল
সোনা পাখিয়ে ডাক দিল
খাইতে দিলাম দুইটা খসি (খাসি)
যেমনের (যেমন) খসি এমনে (এমনি) রইল
বইষট সভা কেমনে গেল।
—পাক করা (রান্না করা)।

১৫. উড়িল পক্ষী জুড়িল বিল
সোনার কাটরা রূপার খিল।
—উড়াল জাল।

১৬. তিন কোনা, মইধ্যে (মাঝে) গাতা (গর্ত)
কমর (কোমর) তুলাদি (তুলে), মারে যাতা (চাপ)।
—আন্তা মাছ ধরার যন্ত্র।

১৭. ইকোমতি তলে তলে, বিকোমতি ছানি
কোন্ মুলুকে (কোথায়) দেকিয়া (দেখে) আইছ

www.pathagar.com

গাছর আগাত্ পানি। (অগ্রভাগে)
—ডাব।

১৮. আছাড় মারলে ভাঙ্গে না
হকল (সব) দেফ্তার (দেবতার)
কাম-অ (কাজে) লাগে না।
—নারিকেল।

১৯. দুই ট্যাং (পা) ছড়াইয়া (ছড়িয়ে)
মাঝখানেদি (মধ্যখানে) হারাইয়া (ঢুকিয়ে)
দিলাম যাতা (চাঁপ)
বাইর হয় দুই মাতা (মাথা)।
—ছরতা (সুপারি কাটার যন্ত্র)।

২০. মহা এক বইন্য (বন্য) জন্তু
বনে তার বাস
বনত্ (বনে) বিশ্রাম করে
খায় বনর (বনের) ঘাস
দুই শিং তার মস্তকের উফ্রে (উপরে)
দুইখান (দুইটি) পাখা আছে
উড়ি (উড়ে) যাইত (যেতে) পারে
শ্বেতবর্ণ অঙ্গ তার, রক্ত বর্ণ আঁখি
বল দেখি জন্তুটা কি?
—ফড়িং।

২১. অ-পারো (এই পারে) একান (একটি) তক্তা
হ-পারো (সেই পারে) আরকান (আর একটি) তক্তা
মাজখানোরগুয়ে (মধ্যেরটি) কুলকুলি করে
উদ্দেশ্য দেবতা ।
—জোকার প্রদানরত জ্বিহবা।

২২. মৃত্রার তলে বুবি গাছ অলঅলি (লক্লক্) করে
একটা বুবি খাইয়া দেখ
শইলে কিতা করে (শরীরে কী করে)।
—গাঞ্জা

২৩. কালা কৃষ্ণর ধলা ফুল
সার ফালাইয়া বাকল তুল ।
-মুর্তা গাছ।

২৪. মামার বাড়ি গেছলাম
হেঙ্গস দি (সর্দি দ্বারা) ভাত খাইছলাম ।
—বেণ্ডি (ঢেঁরশ)।

www.pathagar.com

২৫. ঘরো একটা মেনি গাই
ম্যানম্যানাইয়া চায়
টিপর লগে (টিপ দেয়ার সাথে সাথে) হকল খবর
লন্ডন আমেরিকা যায়।
—মোবাইল।

২৬. চিৎ করি ফালাইয়া, মুট করি ধরিয়া
কতক্ষণ করিয়া, দিলাম ছাড়িয়া।
—পাটা-পোতাইল (পোতা)।

২৭. যাইতে গেলাম দৌড়াইয়া
আইতে আইলাম আইট্যা (হেঁটে)
মাঝখানো থইয়া আইলাম
থু কি ঘিন্না।
—মল ও পায়খানা।

২৮. এক গেলাসো দুই জাতর পানি
তারে আমি উস্তাদ মানি।
—ডিম।

২৯. আমার একটা লুআর (লোহার) গাই
যত খিরাই তত পাই।
—টিপকল।

৩০. পানির তলে নাগা গাছ
আত (হাত) দিলে সর্বনাশ।
—হিংগি মাছ (শিং মাছ)।

৩১. তুমি থাকো ডালো
আমি থাকি জলো
একলগে (এক সাথে) দেখা অইব
মরণর কালো।
—মাছ ও মরিচ

৩২. ও ঘরর বুড়ি হ ঘরো যায় (এই ঘরের/ ওই ঘরে)
খটখটাইয়া গুয়া খায়।
—যাঁতি (ছড়তা)

৩৩. বন থাকি বারইলো বট্
পুটকিত লাঠি মাথায় জট।
—আনারস

৩৪. চাইরোবায় লোয়ার কাটা (চাইরোবায়-চারদিকে, লোয়ার- লোহার, বইল-বসল)
মাঝে বইল লাল ব্যাটা।
—আনারস

www.pathagar.com

৩৫. ঘরর উপরে ঘর
আত বাড়াইয়া ধর।
—মশারি

৩৬. পাতে মুতে থাকে বনে
উত্তর পারবায় কোন জনে।
—লেবু

৩৭. আমার একটা লোয়ার গাই
যত খিরাই তত পাই।
—কল

৩৮. ঠেলার ঠেলা
হাঁটুর উর ভর
পেট ভরি আইলে
গলা চাপি ধর।
—পানির কলসি।

৩৯. এক হাতি গাছটা
ফুল ধরে পাঁচটা।
—হাত।

৪০. ইরি ইরি বিন্না
তিরি তিরি গাছ
বাড়ির বিন্না
চব্বিশ হাত।
—সুপারি গাছ।

৪১. গাং পারো বুলবুল নাচে
একশ পুটকি কার আছে ?
—চালই

৪২. পাইলে নেয় না
আরাইলে তুকায়। (হারিয়ে ফেললে খুঁজে)
—পথ

৪৩. এমন এক খবর লইয়া
আইল আমার নন্দে
কয় নবীন চান্দে
ষোল জন মরা লইয়া
চাইর জনে কান্দে।
—লুডু

www.pathagar.com

৪৪. ওপার থাকি মারলাম তীর
হপারো গিয়া বির বির।
—পোনা মাছ

৪৫. ওপার থাকি মারলাম ইটা
হপারো গিয়া কোলা পিঠা।
—গোবর

৪৬. মুখে দিয়া বমি করে
বমি তার কালা
তোমার আমার সবার মাঝে
জিনিসটা খুব ভালা।
—কলম

৪৭. আকাশ থাকি মারলাম তীর
কাপড় অইল চির চির
ধোপায় না ধইতে পারে
খলিফায় না সিলাই করে।
—কলাপাতা

৪৮. গাং পারো ডুবিগাছ
ওলওলি করে
টেংরা মাছে ঠুকর মারলে
ঝরাত্তি পড়ে। (ঝর ঝর করে)
—কুয়াশা/শিশির

৪৯. তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে
মাজর অক্ষর ছাড়ি দিলে
আকাশেতে উড়ে।
—চিতল

৫০. থাপ্পড়ে তুপ্পড়ে
মর্জনে লাশ
কি যেন অইছেরে বইন
তোর জামাইর আশ।
—মশা মারা

৫১. চারিপাশে তেতের বেড়া
মাঝ-খানে সাহেবের বেটা।
—আনারস

৫২. পাগা আটে
বলদ লেটে।
—সবরি লাউ

www.pathagar.com

৫৩. চলরে ভাই
পাড়ো যাই
পাড়ো গিয়া ঘর বানাই
ঘর বানাইলাম কেটা কোটা
বেত লাগলো আশি মুড়া
দেখরে লাখাল ভাই
একছা বেতর বান নাই।
—বলার চাক

৫৪. হাঞ্জা রাইতে থইলাম গাই (সন্ধ্যা বেলা)
পতা রাইতে নাই (ভোর বেলা)
এমন চোরায় চুরি করল
লেদা ফেদা নাই।
—চাঁদ

৫৫. গাংগর পারো ভুবি গাছ
ঝুমিয়া ভুবি ধরে
একটা ভুবি খাইয়া দেখ
শইল্যে কিতা করে।
—গাঁজা

৫৬. চার অক্ষরের নাম তার খাওয়ার জিনিস অয় (হয়)।
শেষ দুই অক্ষর ছাড়ি দিলে লেখার জিনিস অয়
—চকলেট।

৫৭. বিধির সৃজন ঘর, নাহিক দুয়ার
যোগেন্দ্র পুরুষ তাতে করেন বিহার।
যখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ হয়, হয় বলবান
ভাঙিয়া বিধির ঘর করে খান খান।
—ডিম।

৫৮. ইরি বিরি বিন্‌না
তিরি তিরি গাছ
বাড়ির বিন্‌না
চব্বিশ হাত।
—সুপারি গাছ।

৫৯. তিন অক্ষরে নাম তার সবার বাড়িত আছে
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে
আরাম করি বসে।
—পিঁপড়া

www.pathagar.com

৬০. লটকন ঝুলে পটকন খায়
কাটিয়া দিলে হাটিয়া যায়।
—আমের পোঁকা।

৬১. রাজার বাড়ির গুড়ি
এক বিয়ানে বুড়ি।
—কলাগাছ।

৬২. রাজার বাড়ির মেনা গাই
মেন্‌মেনাইয়া চলে
হাজার টেকার মরিচ খাইয়া
আরো খাইতো বলে।
—শিলপাটা।

৬৩. জানোনি কথার ম্যাও
স্বর্গে গিয়া পুটকি দেয়
আগে কোন দ্যাও (দৈত্য)।
—লেটা (কেচো)।

৬৪. বাইর (বাহির) কালা, ভিতর দলা (ধলা)
তার মাজে (মধ্যে) গুলি ভরা।
—কয়ফল (পেঁপে)

৬৫. উন্দুরর গাতো বান্দর নাচে
নাচিছনা কইলে বেশি নাচে।
—জিহ্বা

৬৬. লাগ্ কইলে লাগেনা, বেলাগ্ কইলে লাগে
কলা টলা লাগেনা, লেম্বু টেম্বু লাগে।
—ঠোঁট

৬৭. শরমর দুই বাটি, কালা কালা ডেটি।
—স্তন

৬৮. কোন জিনিস টান দিলে বাট্টি অয় (খাটো হয়)?
—সিগারেট

৬৯. আজব দেশ তাকি আইছইন উনি,
লগে আছে তিন বুনি।
—চুলা

৭০. আলার বড় কুদরত্,
লাটির ভিত্‌রে শরবত্।
—আখ (কুশ্যাইর)।

৭১. রাজার বাড়ির বিছানা,
ধইলেওতো (ধোয়ার পরও) ভিজেনা।
—কচু পাতা।

www.pathagar.com

৭২. আজান দিলে নামাজ নাই
নামাজ পড়লে সেজদা নাই।
—জন্ম ও জানাজা।

৭৩. লাম্বা হাফিজ
গলা ভরা তাবিজ।
—সুপারি গাছ।

৭৪. অতগুনি ছুবুরি
ভাত রান্দে গুবুরি
দশে বিশে খাইয়া যায়
তবু ভাত রইয়া যায়।
—চুন।

৭৫. লটকন ঝুলে পটকন খায়
কাটিয়া দিলে হাটিয়া যায়।
—আমের পোঁকা।

৭৬. রাজার বাড়ির মেনা গাই
মেন্‌মেনাইয়া চলে
হাজার টেকার মরিচ খাইয়া
আরো খাইতে বলে।
—শিলপাটা।

৭৭. করচুন গছা গছা
ভিতরে ইটা ইটা
খাইতে মিঠা মিঠা।
—কাঁঠাল।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

১. হকল কুড়িয়ার সেল (অলসের দল), বুড়া বেটিরে কয় আগুন ঠেল?
(সবাই অলস, তন্মধ্যে বৃদ্ধাকে বলা হচ্ছে আগুন ঠেলে দেয়ার জন্য)।

২. কতায় কতা বাড়ে, মাতনে ঘি। (কথা)
(কথা বললে কথা বাড়ে, মাতনে ঘি বাড়ে)।

৩. আগে আছলায় কুমারর ঝি, অখন কও সরারে ঘি।
(হঠাৎ উন্নতিতে অহং বোধ জাগা)।

৪. অমানুষ মানুষ হইলা
তেলি হইলা পাল,
নাপিত বৈরাগী হইলা
কে ফালাইতা বাল?
(আকস্মিক অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য)।

৫. যু ক্ষণে দাদা মরলা
তিন ধূতি আমার অইলা।
(অন্যের ক্ষতিতে নিজের লাভ)।

৬. হউল (শোল) মাছর ল্যাঙ্গুর কালা,
কোন মুলুকর হরি (শাশুড়ি) বালা?
(সকল শাশুড়িই মন্দ)।

৭. হাওরের মাঝে হাকালুকি; আর যত কুয়া,
দেশের মাঝে মামুন মনসুর; আর যত পুয়া।
(হাকালুকি হাওরের তুলনায় অন্যান্য হাওর যেমন কুয়ো সদৃশ,
(স্বাস্থ্যবান মামুন মনসুরের তুলনায় অন্যরা তেমনি বালক)।

৮. মানুষ চিনা যায় ফুর্তিত
গরু চিনা যায় খুটিত।
(খুঁটিতে বেঁধে রাখলে গরুকে, আর সুখের সময় মানুষকে চেনা যায়)।

৯. অন্তর-অ অনিষ্ট চিন্তা
মুখ-অ আত্মীয়তা
তার তনে বেশি বালা (ভাল)
প্রকাশ্য শত্রুতা।
(প্রকাশ্যে আদর আর গোপনে অমঙ্গল করার চেয়ে প্রকাশ্য শত্রুতা উত্তম)।

১০. বাঁশ তনে (থেকে) ছিংলা (বেত) বড়।
(মূলব্যক্তির চেয়ে সহযোগীর দাবি বা অহংবোধ বেশি হওয়া।)

www.pathagar.com

১১. পানি আনা বড় সুখ
দেখিয়া (দেখে)আইবা দশের মুখ।
রান্নার কাম বড় কাম
হাড়ে হাড়ে হামায় ঘাম।
(নিজ কর্মের চেয়ে অন্যের কর্মকে সহজ করে দেখা।)

১২. ভাগ নাই কপালো
মেকুর আয় পাকালো (চুলায়)।
(ভাগ্য দোষে নিজের ধন অন্যের হাতে চলে যাওয়া।)

১৩. বাপে আর পুতে (ছেলে)
চুঙ্গা ভরি মুতে (প্রসাব করে)।
(যেমন বাপ তেমন ছেলে।)

১৪. কালা ধানে ধলা (সাদা) পিটা (পিঠা)
মার তাকি (মায়ের থেকে) মাসি মিটা (মিষ্টি)।
(ঘরের মানুষ ছেড়ে অন্য মানুষের সাথে সখ্য গড়ে তোলা।)

১৫) মাতে না কন্যায় ধতে (কথা বলে)
গয়না পিন্দে আনা নতে।
(এমন কিছু মেয়ে আছে যারা সহজে কথা বলতে চায় না; কিন্তু গোপনে মন্দ কর্ম করে বেড়ায়।)

১৬) যদি অয় সুজন
তেঁতুল পাতায় ন'জন।
(বন্ধুত্ব গভীর হলে অর্থ কম হলেও কষ্ট ততটা অনুভূত হয় না।)

১৭) হারাদিন থাকে বেটি উলে আর মেলে
হাই বাড়িত আইলে দেখি শত বারা মেলে
(স্ত্রী সারা দিন ঘুরে বেড়ায়, স্বামী এলে কাজ দেখায়)

১৮) আদিলকার ঘরো অইছন পুয়া নাম রাখছইন আছাবুয়া। (পুত্র)
(যেমন বাপ তেমন ছেলে, কেউ কাজের নয়)

১৯) আগরা বেটির লাজ নাই, দেখল বেটির লাজ। (যে মল ত্যাগ করছে)
(যে মন্দ কাজ করে তার লজ্জা নেই, অথচ যে দেখে তার লজ্জা লাগে)

২০) আনে কয় আন কথা, শয়তানে কয় তার গার বেথা।
(চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি)

২১) আজুলির আদি, হাইরে ডাকইন দাদি।
(বোকাদের কাজই হচ্ছে বোকামি করা।)

২২) না খাইয়া, না ছইয়া, লাখ মাইল ছলা বইলা।
(দোষ না করেও দোষের বোঝা বয়ে চলা)

২৩) কুপিত নাই তেল, বেয়ারিঙো তেল মাখাও।
(প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার টাকা নেই, বাজে কাজে ব্যয় করে)

www.pathagar.com

২৪) হাছির গলাত কাছি।
(খাটো লোকের সাথে লম্বা মেয়ের বিয়ে হলে এ কথাটি বলা হয়)

২৫) আগা নাই পুট্‌কির ডাক মোটা। (মল)
(ক্ষমতাহীন ব্যক্তির বড় গলা)

২৬) অমৃতর মার মুখকান মিঠা।
হারাদিনোর কাম খাইয়া
আধাখান পিঠা।
(মিষ্টি কথায় অল্প ব্যয়ে কার্যসিদ্ধি)

২৭) আমার নাতনির বড় গুণ,
আনা তেলে ভাজে বেগুন।
(বিনা ব্যয়ে কার্য সিদ্ধি)

২৮) কিবা ভাগর কাঠাম,
তার উপরে রাংচার কাম।
(আসলের খবর নেই, নকল নিয়ে টানাটানি)

২৯) আউয়া চাড়াল বখার ডিম,
সারারাইতে ঝিম ঝিম।
(বোকা লোকের পন্ডশ্রমই সার)

৩০) দেখি, হুনি মাতি না,
কোন আপদে পায়না।
(প্রতিবাদ না করে নিরব থাকলে কোন বিপদে পায়না।)

৩১) চিমটির হাত ক্ষির, খাওরে পাঁচ ফির।
(কৃপণের হাতে পড়লে পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।)

৩২) ওদায়রি সুদামর মা,
কিছু জানইন কিছু জানইননা।
(কোন বিষয় পুরো জেনেও অর্ধেক বলা অর্ধেক চেপে যাওয়া)

৩৩) বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।
(ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়)

৩৪) পাইয়া পরার ধন,
বাপে পুতে কীর্তন।
(অন্যের টাকা পেয়ে বেহিসাবি ব্যয়)

৩৫) চুরের মাউগর বড় গলা, (চোর)
আবার খুঁজে দুধ কলা।
(ক্ষতি করে, বড় গলায় কথা বলে, আবার লাভও খুঁজে।)

৩৬) চুরেচুরে ঢলাঢলি
একচুরে বিয়া করে

www.pathagar.com

আরক চুরর হালি।   (আর এক)
(একই মন মানসিকতার মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা)

৩৭) নিমরা বিলাই হর খাইবার যম।
(দেখতে বোকার মতো, আসলে ধূর্ত)

৩৮) নাই চাউল, নাই পাত, বয়াই দেও বিরইন ভাত।
(কাজ সম্পাদনের মূল উপাদানই নেই, অথচ কাজের আয়োজন)

৩৯. ঘরর লগে লগ নাই, পুবে দিয়া দরজা।
(পূর্বের কাজ শেষ হওয়ার আগেই পরের কাজ নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা)

৪০. অইব পুতে ডাকবো বাপ
তবে যাইব মনের তাপ।
(মিথ্যে সান্ত্বনা)

৪১. কইন্যার মায়ে কান্দে, আবার গাট্টি বুচকা বান্দে।
(কন্যা বিদায় জনিত দুঃখের মধ্যেও তাকে কিছু দান করার চেষ্টা)

৪২. পুরইতে (পুরহিতে) মন্ত্র কয়, পাঠার পেলেও (লিঙ্গ) শুনেনা।
(যার উদ্দেশে কর্ম, তার অচৈতন্য থাকা)

৪৩. কালরে কাল বর্ষা কাল, ছাগলে চাটে বাগর (বাঘের) গাল।
(বিপদে পড়লে অতি সাধারণ লোকও তামাশা করে)

৪৪. চুরর (চোরের) ঘুড়াও (ঘোড়া) বুড়া (বৃদ্ধ) অয় (হয়)।
(একসময় সকলেরই বার্ধক্য আসে, সামর্থ্য কমে)

৪৫. ইন্দুর মাজে সাউ   (হিন্দুদের মধ্যে সাহা)
আনাজের মাজে লাউ।
(সম্ভবত উপকারী অর্থে। উল্লেখ্য, একসময় সিলেটের সাহা সম্প্রদায় খুব বিত্তবান ছিলেন এবং তারা দুহাতে টাকা ব্যয় করতেন)

৪৬. এক খুড়ে মাথা কামাইল।
-সবাই একই স্বভাবের।

৪৭. মানুষ নষ্ট অই যায়, যুদি অয় কানা
পুক্কুণ্ডির পানি নষ্ট, লাগে যুদি পেনা।
(ব্যক্তির নষ্টচোখের সঙ্গে পেনাযুক্ত পুকুরের তুলনা)

৪৮. হাদা জিনিসে আদা লাভ।
(যে বস্তু কেউ সেধে বিক্রি করে, এতে লাভ কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে)

৪৯. চখুর তলে আছে ঠোট মাঝখানো আছে নাক
এরে অউ দেখে না চউখে আলার কেমোন পাক্ ॥
(অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও যা অদৃশ্য)

৫০. কৈ অর তেলো কৈ ভাজা
(বিনা ব্যয়ে কার্য সিদ্ধি)

www.pathagar.com

৫১. আগে গেলে বাঘে খায়
পরে গেলে সোনা পায়।
-হুড়োহুড়ি করলে বিপরীত ফল হয়।

৫২. চুররে কয় চুরি কর, গৃহস্থরে কয় হজাগ থাক।
(সমাজে কিছু দুষ্ট লোক আছে যারা ফ্যাসাদ লাগানোর জন্য বিবাদমান দুটি পক্ষকেই মদদ দেয়)

৫৩. হমানে হমানে দুস্তি ঠিকে ঠাকে অয়
হমানে হমানে কুস্তিয়ে শইলে শইলে লয়।
-সমমন ও সমযোগ্যতার মানুষের সঙ্গেই আত্মীয়তা করতে হয়।

৫৪. জোহরে সোনা চিনে
উলসে চিনে কাথা।
-জ্ঞান অনুযায়ী রুচি।

৫৫. পুরি নষ্ট হাটো
বউ নষ্ট ঘাটো
সিয়ান পুয়া নষ্ট হয়
লাগা বাড়ির খাটো।
-অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা ক্ষতির কারণ হয়।

৫৬. বাপ দাদার নাম নাই
চান মোড়লের বিয়াই।
খ্যাতিমান ব্যক্তিকে নিজের আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দেয়ার প্রবণতা।

৫৭. যার বিয়া তার খবর নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।
-আদিখ্যেতা দেখানো।

৫৮. গাইতে গাইতে গায়েন
বাজাতে বাজাতে বায়েন।
-অনুশীলন করতে করতেই দক্ষ হওয়া যায়।

৫৯. আছমানে চান্দ সুন্দর, ফুল সুন্দর গাছে।
- যে স্থানে যা মানায়।

৬০. আগা ভাংগিলে নষ্ট বাশোর করুল
সদায় কেরেংকালে নষ্ট, পরিবারের মূল।
-অতিরিক্ত ঝগড়া-বিবাদ পরিবারে অশান্তি বয়ে আনে।

৬১. মাছ ধরা যেমন তেমন
খলই ধরা শক্ত।
-উপার্জন করা সহজ, ব্যয় করা কঠিন।

৬২. হঁয়া নায় ঝেংগা লয় ইনো কিওর উগী
লোটা গামছা চুটকী ছাড়া কিওর বৈরাগী।
-কথার সঙ্গে কর্মের বৈসাদৃশ্য।

www.pathagar.com

৬৩. পুরান কালি কথা আছে বুড়া আড়ায় কয়
যিনো বাঘোর ভয় অনৌ রাইত অয় ॥
-যেখানে বিপদের আশংকা, সেখানেই বিলম্ব হয়ে যায়।

৬৪. যাচলে জামাই খাইন না
বুথা দেখি লক্‌লকাইন।
-যখন অনুরোধ করা হয়, তখন মূল্যবান বস্তু নিতেও অনাগ্রহ দেখায়, অথচ অন্যসময় মূল্যহীন বস্তুর জন্যও প্রাণ কাঁদে।

৬৫. নিজে ঘুমানির জায়গা নাই, শঙ্করারে ডাকো।
-নিজেরই নেই, অন্যকে আবার সাহায্যের চিন্তা।

৬৬. সারাদিন যে কাম করলো, সে অইল অরি
সন্ধ্যার সময় জোকার দিয়া, তাইন অইলা হুয়াগি।
-সমস্ত কর্ম যে সম্পাদন করলো তার মূল্যায়ন হলোনা, শেষ বেলা এসে যে সাহায্য করলো, তার হয়ে গেল সুনাম।

৬৭. অইব পুতে ডাকবো বাপ
তবে যাইব মনের তাপ।
-অনিশ্চিৎ প্রত্যাশা।

৬৮. কোন আশিকে ছাড়ে, পাইলে মাশুক
দুষমন কাবুত্ পাইলে, কে না মিটায় দুঃখ্।
-সুযোগ পেলে সকলেই তার সদ্ব্যবহার করতে চায় ॥

৬৯. যেমন কাম, তেমন ফল।
-কর্ম ভাল হলে, ফল ভাল হবে।

৭০. ঠাটা পড়িয়া বগি মরছে।
- প্রকৃতি সম্পাদিত কর্মকে নিজের কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করার চেষ্টা।

৭১. রহমান একটা মানুষ, লেংটি একটা কাপড়, আর <u>তেলচুরা</u> এটা পাখি। তেলাপোকা
-বৈশিষ্ট্য একরকম হলেই গুণ এক হয়না।

৭২. ঝি নষ্ট করলো মায়
পুয়া নষ্ট ইয়াবার নেশায়।
-মায়ের অন্যায় প্রশ্রয়ে কন্যা, আর মাদকের মরণ নেশায় নষ্ট হয় পুত্র ।

৭৩. রতনে রতন চিনে
উলসে চিনে কাথা।
- রুচি তৈরি হয় জ্ঞান অনুযায়ী।

www.pathagar.com

এছাড়াও এতদঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রবাদ-প্রবচন কমবেশি প্রচলিত

১. গরুর একায় গরু মরে, মানুষর একায় মানুষ মরে।
২. নাই মামু তাকি কানা মামু বালা।
৩. মাথাত্ তইলে উকুনে খাইন, মাটিত তইলে পিপঁড়ায় খাইন ।
৪. বেয়াকলর সালাম তিন বার ।
৫. সবুরর ভাত গাছর আগাত ।
৬. ফরা গরু থাকি মরা গরু ভালা।
৭. চেমাইবান্দা তাকি বেঈমান বালা ।
৮. উলসে চিনে ছিড়া কাথা, উকুনে চিনে বাদামুড়ি মাথা।
৯. তোর নাই হুশ, আমার কি দোষ ।
১০. মুখ দোষে মাড় গলে, গামছা বাইয়া ফ্যানা ফড়ে।
১১. ক্ষণে মন যায় ছটাকে জাত যায়।
১২. লাথ মারি সালাম দেওয়া।
১৩. কিবা ভাগর নালি শাক, তার উপরে ঘিয়র ভাগ।
১৪. গাছ গুয়া গলাত গাইট।
১৫. চুরের মনে ক্ষিরা ক্ষেত, আতাইয়া দেখে ইটার বেট।
১৬. না অইল আলর, না অইল বীজর।
১৭. ঘর নাই এখান, দুয়ার পাঁচখান।
১৮. দিত দিত কয় বন্ধে, কিন্তু সে দেয় না,
    এখান কথার গুণ আছে ভাই, না করতো পারে না।
১৯. কম্বলো গু থাকলে জিলাপির প্যাঁচ দিয়া আগা যায়। (পাছায় মল)
২০. এক ভাত টিপা দিলে ডেগর খবর কওয়া যায়। প্রভৃতি।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সিলেটে লোকপেশা এবং লোক-পেশাজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। উপজেলা তো বটেই, গ্রাম পর্যায়েও যেহেতু অনেকে প্রবাসীর অবস্থান; তাই এরা মোটামুটি সৌখিন, আর এ কারণে বিদেশি জিনিস পত্রাদিতে তাদের সংসার পরিপূর্ণ। লোকপেশার সাথে যারা সক্রিয় ছিলেন; বাধ্য হয়েই তারা অন্য পেশা গ্রহণপূর্বক ভিন্ন দিকে তাদের কর্মকাণ্ড ব্যাপ্ত করেছেন। ফলে বংশানুক্রমিক ভাবে একই পেশায় নিয়োজিত থাকা পেশাজীবীদের সংখ্যা সিলেটে অতি দ্রুত গতিতে নিশেষ হয়ে আসছে।

অদ্যাবধি যারা বংশানুক্রমিক পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন; তাদের মধ্যে নরসুন্দর, চর্মকার, বাদ্যযন্ত্র-প্রস্তুতকারক, কাঠ ও বেতশিল্পি অন্যতম। তবে স্বর্ণ এবং লৌহ শিল্পেও অনেকে বংশগতভাবে কাজ করছেন। নতুন করে চুল কর্তন বা স্বর্ণালংকার তৈরির কাজে যারা যুক্ত হয়েছেন, তাদের সংখ্যাও অবশ্য একেবারে কম নয়। নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হল:

১. লৌহশিল্পি কর্মকার সম্প্রদায় (কামার)

সিলেট জেলায় একসময় প্রচুর লোক লৌহ-শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এরা দা, কুড়াল, খুন্তি, সেনি, কোদাল প্রভৃতি নির্মাণ করতেন। বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে। তৎস্থলে জানালার গ্রিল বা পাত/শিটের দরজা প্রস্তুতকারকের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যারা দা, কুড়াল, খুন্তি, সেনি, কোদাল প্রভৃতি তৈরি করতেন, তাদেরে কর্মকার বলা হতো। এদের বংশানুক্রমিক পদবিও ছিল কর্মকার। এখন কর্মকারদের অনেকেই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নন। অল্প যে কজন পারিবারিক ভাবে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে সুনন্দ কর্মকার, অঞ্জন দেব, প্রমুখ অন্যতম। এরা মূলত বিভিন্ন ধরনের দা, কোদাল, খুন্তি প্রভৃতি নির্মাণ করেন। সুনন্দ কর্মকার ৩২ বৎসর সিলেটের আম্বরখানায় লৌহসামগ্রী তৈরি করেছেন। বর্তমানে ২ বৎসর যাবৎ ৮নং ওয়ার্ডের নোয়াবাজার এলাকায় ছোট একটি দোকান নিয়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে অর্থাৎ হস্ত চালিত পাম্পারের সাহায্যে আগুন তৈরি করে লৌহসামগ্রি অর্থাৎ দা, কুড়াল, খুন্তি, সেনি, কোদাল প্রভৃতি তৈরি করছেন। তার বয়স ৬৮ বৎসর। স্থায়ী নিবাস ছিল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায়। ৪০ বৎসর যাবৎ তিনি সিলেটে অবস্থান করছেন। তার একপুত্র দুবাইয়ে চাকরি করেন। একটি পরিবারে দা, কোদাল প্রভৃতি খুর বেশি প্রয়োজন হয়না বিধায় ব্যবসা খুব একটা চলেনা বলেই তিনি আমাদের জানান। তবে এতদঞ্চলে প্রচুর নতুন নতুন বাড়ি নির্মিত হওয়ার কারণে; মাটি টানা ও ফেলার জন্য বেলচা ও কোদালের প্রয়োজন পড়ে, সিমেন্টের কাজের জন্য প্রয়োজন পড়ে কন্নি এবং বৈধ-অবৈধ বিভিন্ন উপায়ে টিলা কাটার জন্য ব্যবহৃত হয় খুন্তি। এসব সামগ্রীর জন্য

www.pathagar.com

এখনো সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকারগণ তাদের জাত ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারছেন বলে আমাদের ধারণা।

অঞ্জন দেব সিলেট শহরের হাওলাদার পাড়ায় বসবাস করেন, আর কারখানা পরিচালনা করেন কুমারগাঁও এলাকায়। দেব উপাধিধারী হলেও কয়েক পুরুষ যাবৎ তারা এই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আমাদের জানিয়েছেন।

মুরগি ও মাংস কাটার জন্য উপজেলা পর্যায়ে চাপাতি তৈরি হয় তুলনামূলক ভাবে বেশি। তবে সেখানে লাঙ্গলের চাহিদাও একেবারে কম নয়। বর্তমানে এধরনের পেশায় সিলেট শহরে নিয়োজিত আছেন প্রায় শ-খানেক লোক।

জানালার গ্রিল বা বারান্দার গ্রিল, লোহা/পাতের দরজা-জানালা প্রভৃতি তৈরিতে ৫ শতাধিকেরও বেশি লোক সিলেট শহওে কর্মরত আছেন। এদের অধিকাংশই মুসলিম, তবে হিন্দুদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। গ্রামে এধরনের পেশাজীবীদের খুব একটা দেখা না গেলেও উপজেলা পর্যায়ে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

এই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপার্জন ভালই হয়। সিলেট শহরের হাওয়লদার পাড়া নিবাসী সেলিম মাত্র ১০/১২ বৎসর যাবৎ এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত থেকে অভূতপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রাইভেট কারের মালিক। সেলিম শহরের মদিনা মার্কেট এলাকায় কর্মরত অছেন।

২. নরসুন্দর

অপ্রয়োজনীয় চুল, গোঁফ ছেটে যারা মানুষকে আকর্ষণীয় করে তুলেন, তারাই নরসুন্দর। আগে যারা উক্ত পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের পারিবারিক পদবি ছিল শীল বা চন্দ। এখনো অনেক শীল ও চন্দ উক্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন। তবে ব্যবসার ধরন এখন বদলে গেছে। পূর্বে একটি কাঠের বাক্সে চুল, গোফ কাটার যন্ত্রপাতি নিয়ে নরসুন্দরগণ ফেরিয়ালাদের মতো বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করতেন। কারো প্রয়োজন হলে এদের ডাক দিতেন। ২০/২২ বৎসর পূর্বেও সিলেটে এ দৃশ্য ছিল খুব শোভন। এখন এরা সেলুন খুলে বসেন, আর যাদের প্রয়োজন, তারা আসেন এখানে চুল বা দাড়ি কাটতে। কেউ কেউ একটি গাছের পাশে বড় একটি আয়না নিয়ে বসেন, পথচারিরা এখানে এসে নিজেদেরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন।

বীরেন শীল করের পাড়ার একটি সেলুনে কাজ করেন। তার পিতা রসময় শীলও একই পেশায় যুক্ত ছিলেন। তার মায়ের নাম লীলা শীল। মামারাও চুল কর্তন পেশার সঙ্গে যুক্ত। তার বয়স ৪৫ বৎসর।

কুটু চন্দ ১৯৫৪ সালে কানাইঘাটের নারাইনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৪০ বছর যাবৎ সেলুনের কাজ করছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি পিতা শশী চন্দের কাছ থেকে এ কাজ শিখেন। তাঁর পিতা শিখেছেন উনার বাবার কাছ থেকে। তাদের এটি বংশগত পেশা। প্রায় ৮০/৯০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে তারা এ পেশায় যুক্ত। কুটু চন্দ যে কোন প্রকার ডিজাইনের চুল কাটতে পারেন। অতীত ও আধুনিক সকল কাজই তার আয়ত্তে আছে। তিনি এ পর্যন্ত প্রায় ২০-২২ জনকে এ কাজ শিখিয়েছেন ও বর্তমানেও শেখাচ্ছেন।

www.pathagar.com

লিটন চন্দ প্রায় ২০ বছর যাবৎ নরসুন্দরের পেশায় যুক্ত। তিনি তার বাবা সুরেশ চন্দ এর কাছ থেকে এ কাজ শিখেছেন। এটি তাদের বংশগত পেশা। তিনি এ কাজে খুবই সিদ্ধহস্ত। যেকোন ধরনের ফ্যাশনেবল কাজই তিনি করতে পারেন। এ পর্যন্ত ১০ জনকে শিখিয়েছেন। তার দুই ছেলেও এ কাজে সম্পৃক্ত আছে। তার বয়স আনুমানিক ৪৫/৪৬ বছর এবং তিনি কানাইঘাট উপজেলার দর্জিমাটি গ্রামে বসবাস করেন। লিটন চন্দের মাতার নাম শিখা চন্দ।

এনায়েত হোসেন ৪-৫ বছর যাবৎ এ কাজ করছেন। দুই বছর হলো তিনি নিজে দোকান দিয়েছেন। তার ওস্তাদ হচ্ছেন মো. রশিদ মিয়া। তার কাছ থেকে এনায়েত হোসেন প্রায় ৭ বছর কাজ শিখেছেন ও মজুরি খেটেছেন। এখন তিনি এ পেশায় অত্যন্ত দক্ষ। তার বাবার নাম শিহাব মিয়া এবং মায়ের নাম লাকী বেগম। বয়স আনুমানিক ২৮/২৯ বৎসর।

শীল, চন্দ উপাধিধারীদের অনেকেই এখন ভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যারা পড়াশুনার ক্ষেত্রে এগিয়েছেন অথবা যারা বিদেশে কয়েক বৎসর কাজ করেছেন, তারাই ভিন্ন পেশায় নিজেদেরে নিয়োজিত করেছেন। ডলিয়ার অমল চন্দ বংশানুক্রমিক ভাবে চুল কর্তন পেশায় যুক্ত থাকলেও তার কনিষ্ট ভ্রাতা বিমল চন্দ পড়াশুনা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পর চাকরি করছেন। বিমল অবশ্য ছাত্র থাকাবস্থায় এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। অমল চন্দের সন্তানরা পড়াশুনা করছে এবং তিনি এদেরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রাখতে আগ্রহী নন। বিমল চন্দের অনেক আত্মীয় বিদেশ অবস্থান করার কারণে নিজেদের এবং সন্তানদের পেশায় পরিবর্তন এসেছে। অবশ্য কেউ কেউ ব্যবসায়িক সুবিধা না পাওয়ার কারণেও উক্ত পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেছেন। উল্টোটাও অবশ্য ঘটে। অর্থাৎ, পূর্বে অন্য পেশায় ছিলেন, পাবিারিক পদবিও ভিন্ন, কিন্তু বাধ্য হয়ে চুল-দাড়ি কর্তন পেশায় যুক্ত হয়েছেন, মহানগরে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিধান সরকার, যার পিতার নাম মনোরঞ্জন সরকার, তিনিও এমন একজন শ্রমিক। গ্রামের পাবিারিক কৃষিকাজের পেশায় সংসার চলেনা বলেই, তিনি জনৈক অজিত চক্রবর্ত্তীর সহায়তায় বাল্যকালে সিলেট শহরে আসেন এবং একটি সেলুনে কাজ নেন। বর্তমানে তিনি নিজেই একটি সেলুন চালাচ্ছেন। স্বপন কর, যার বাবার নাম ননী কর, তিনিও পারিবারিক কৃষি পেশা পরিত্যাগ করে শহরের হাওয়ালদার পাড়া সংলগ্ন কালীবাড়ি এলাকার একটি সেলুনে কাজ করছেন।

এই পেশার কদর অবশ্য শহরে এখন ব্যাপক। মুসলিমরাতো বটেই, ভিন্ন পদবিধারী হিন্দুরাও ব্যয়বহুল কক্ষ নির্মাণ বা ভাড়া গ্রহণ পূর্বক উক্ত পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

৩. কাঠ মিস্ত্রি (সূত্রধর)

সিলেট শহরে কাঠের তৈরি আসবাব পত্রের ব্যাপক চাহিদা থাকায়; প্রধান প্রধান সড়কের পাশে তো বটেই, বিভিন্ন অলি-গলিতেও ফার্নিচারের দোকান দেখা যায়। প্রধানত সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি এসব ফার্নিচার যথা: খাট, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, সোফাসেট, আলমারি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি দামেও

www.pathagar.com

ভারী। তবে গ্রামে এসবের চাহিদা খুব একটা না থাকায়; মিস্ত্রিগণ শহরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে বা ভাড়া থেকে কাজ করেন। এসব আসবাবপত্র বহু মূল্যবান হলেও শ্রমিকগণ খুব একটা আয় করতে পারেন না। তাদের বেতন বা মজুরি পর্যাপ্ত নয় বলে করের পাড়ার অজিত দাস, হাওয়লদার পাড়ার ফনিন্দ্র নাথ প্রমুখ মিস্ত্রিগণ আমাদেরে জানিয়েছেন।

জাহাজের মাল নামে পরিচিত কিছু আসবাব পত্র, যা দেখতে বেশ ভাল, এগুলো অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় গ্রামে এসব আসবাবপত্রের বেশ চাহিদা। আর একারণে সেখানে কাঠের তৈরি ফার্নিচারের পরিবর্তে ওইসব ব্যবহৃত হয় বেশি। তবে নিজের গাছ কেটে অনেকে কাঠের তৈরি ফার্নিচারও তৈরি করেন। বিশেষত বিয়ে-শাদিতে যেসব ফার্নিচারের প্রয়োজন পড়ে, সেগুলো কাঠ দ্বারাই তৈরি হয়ে থাকে।

সিলেট শহরের শেখঘাট অঞ্চলে এবং মদিনা মার্কেটের রাস্তায় সন্ধ্যার সময় সস্তা দরের আলনা, খাট, টেবিল প্রভৃতি বিক্রি হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা ম্যাচে ভাড়া থাকে এরা এবং স্বল্প আয়ের মানুষ এই সব দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। এসব বিক্রি করে কোনো কোনো মিস্ত্রি বেশ ভাল আয় করেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আগে যারা কঠের কাজ করতেন এদেরে সূত্রধর বলা হতো। এদের পারিবারিক পদবিও ছিল সূত্রধর। এখনো সূত্রধর পদবিধারীগণ সিলেটে আছেন, কিন্তু এদের কাউকেই কাঠের কাজ করতে দেখা যায় না। ব্যাংকের কর্মকর্তা, কলেজের অধ্যাপক সহ ভিন্ন ধরনের পেশায় এদের অনেকেই কর্মরত আছেন। অন্য পদবিধারীগণই বরং কাঠের কাজে নিয়োজিত আছেন।

অজিত দাস এবং ফনিন্দ্র নাথ পৈতৃক পেশা হিসেবে কাঠের কাজ করছেন। রিক্সার উপরের অংশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার এরা তৈরি করতে পারেন। বার্নিশও করতে পারেন দক্ষতার সঙ্গে।

কামাল আহমদ একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি। পিতার নাম মো. আব্দুস সালাম সমাই এবং মাতার নাম জোবেদা খাতুন মৃত। শহরের ৮নং ওয়ার্ডের কালীবাড়ি রোডে তার স্থায়ী নিবাস। পিতা ২৫ বৎসর পূর্বে একজন কাঠমিস্ত্রিকে দোকান ঘর ভাড়া দেন। সেখানে নির্মিত কাষ্ঠ সামগ্রির নির্মাণ কৌশল প্রত্যক্ষ করে তিনি তা রপ্ত করেন। এখন তিনি নিজেই কাঠ শিল্পি। বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, টেবিল, ফার্নিচার নির্মাণ করতে পারেন। ৩৪ বছর বয়স্ক এই কাঠশিল্পি ২০ বৎসর যাবৎ উক্ত পেশায় নিয়োজিত আছেন।

ফেঞ্চুগঞ্জের কাঠশিল্পিদের মধ্যে দক্ষদের একজন হলেন মোঃ বেলাল আহমদ। ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার নুরপুর গ্রামের অধিবাসী বেলাল আহমদ ১৯৭৯ সাল থেকে এই পেশার সাথে যুক্ত। তার বাবা মো. মোছাদ্দর আলীও ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। বাবার কাছ থেকেই তিনি শিখেছেন। তাদের এই পেশা বংশানুক্রমিক। ৪৮ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন ড্রিল ম্যাশিন কিংবা ডিজাইন ম্যাশিন দিয়ে কাঠে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করলেও পূর্বে হাতে হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে ডিজাইন করতেন। তিনি পূর্বের রাজসিংহাসনের আদলে চেয়ার তৈরি করা, পালং (খাট) বানানো ও তার মাথায় শাপলা ফুল ও বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রকার ডিজাইন তৈরি, দরজায় বিভিন্ন নকশা ও চেয়ারের পিছনে বিভিন্ন নকশা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত।

ফেঞ্চুগঞ্জের তরুণ ও জনপ্রিয় কাঠশিল্পিদের একজন হলেন ফারুক মিয়া। তার স্থায়ী নিবাস মাইজগাঁও। ১৩ বছর বয়স থেকেই তিনি কাঠে বিভিন্ন কারুকাজ শেখার জন্য কাঠমিস্ত্রির দোকানে মজুর হিসেবে যোগদান করেন। প্রথম দিকে যোগালির কাজ করতেন। ৪-৫ বছর পরই তিনি এ কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ফারুক মিয়া হিন্দুদের পূজার বিগ্রহ বসানোর সিংহাসন বা কুর্সি, পালং (খাট), ওয়ার্ডড্রপ, সোকেজ প্রভৃতিতে অনিন্দ্যসুন্দর কারুকাজ করে থাকেন। ৩৪ বছর বয়সী এই কাঠশিল্পি প্রায় ১৪ বছর যাবৎ পেশা হিসেবে এই কাজ করে যাচ্ছেন।

৪. স্বর্ণকার

সিলেট শহরের স্বর্ণ ব্যবসা মাত্র ১৫ বৎসর আগেও মূলত হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এসব ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে সিলেটের অধিবাসী ছিলেন না। সিলেটে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্য জন্মসূত্রেই সিলেটবাসী হয়েছেন। এদের পূর্বপুরুষের কেউ কেউ প্রথমে কাঁসার ব্যবসা করতেন, নতুন প্রজন্ম শুরু করে স্বণের্র ব্যবসা। স্বর্ণের দোকানে কারিগর হিসেবে কাজ শিখে; পরে নিজেরাই স্বর্ণের দোকান চালু করেন।

সিলেট শহরেরের দাড়িয়া পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন রতন বণিক। তাঁর আদি নিবাস ধামরাইয়ে। পিতা সন্তোষ বণিক কাঁসার ব্যবসা করতেন। সিলেটে এই জন্যই তিনি আগমন করেছিলেন। কিন্তু সহজ-সরল সন্তোষ বণিক দুর্জন কর্তৃক প্রতারিত হয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রতন বণিক তখন জনৈক আত্মীয়ের স্বর্ণের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই স্বর্ণের কাজ জানতেন বিধায় খুব সহজেই তিনি এ কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং দ্বিতীয় ভাই লিবিয়ায় কাজ করতে যাওয়ার পর সংসারের আয় বৃদ্ধি পেলে নিজেই স্বর্ণের দোকান খুলেন। বণিক জুয়েলার্স নামক এই জুয়েলার্স কয়েক দশক যাবৎ সুনামের সঙ্গে সিলেটে ব্যবসা করে আসছে। তার অনুজ বরুণ বণিক আর একটি জুয়েলারি দোকান চালাচ্ছেন, এর নাম পরমা জুয়েলার্স। কনিষ্ট ভ্রাতা দেবদুলাল বণিক দেবু অবশ্য কাপড়ের ব্যবসা করছেন। উল্লেখ্য, এদের মামার বাড়ি টাঙ্গাইল।

পীযুশ কপালী শহরের একজন নবীন স্বর্ণকার। তার পিতার নাম প্রবীর কপালী এবং মাতার নাম নিভা রাণী কপালী। বয়স ২০ বৎসর। পিতা ভূষিমালের ব্যবসা করতেন। তিনি জয়গুরু স্বর্ণ শিল্পালয় নামক স্বর্ণের দোকানে কারিগর হিসেবে কাজ করছেন।

চন্দন দে জয়গুরু স্বর্ণ শিল্পালয় নামক স্বর্ণের দোকানের অপর এক কারিগর। তার বাবা নৃপেন্দ্র দে, মা উমা দে। বয়স ১৭ বৎসর। ৬ বৎসর যাবৎ এই পেশায় জড়িত। স্থায়ী নিবাস সুনামগঞ্জের মধ্যনগরে। পিতা লৌহ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

গণেশ দেব কাজ করছেন ৮/৯ বৎসর যাবৎ। তার পিতা হেমন্ত দেব, মাতা হাসি রাণী দেব। হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙ্গের বিথঙ্গলে স্থায়ী নিবাস। হবিগঞ্জের আজমিরিতে সহকারী কারিগর হিসেবে কাজ করতে করতে শেখা। বর্তমানে কাজ করছেন ৮নং ওয়ার্ডের কালীবাড়ি এলাকার জয়গুরু স্বর্ণ শিল্পালয় নামক স্বর্ণের দোকানে। এই দোকানের স্বত্ত্বাধিকারী গৌরদাস বণিক। তার পিতার নাম গোপীদাস বণিক এবং মায়ের নাম জ্যোৎস্না বণিক। স্থায়ী নিবাস কিশোরগঞ্জে, তবে সিলেটের বটেশ্বরে বসবাস করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর। তিনি বংশগত ভাবে এই পেশার সঙ্গে জড়িত। উপর্যুক্ত পীযুশ কপালী, চন্দন দে, গণেশ দেব, প্রমুখ আত্মীয়তা সূত্রে তার শিল্পালয়ে কাজ করছেন।

সিলেটে ভৌমিক সম্প্রদায়ের কিছু লোক বংশানুক্রমিকভাবে স্বর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত। মুসলিম সম্প্রদায় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই ব্যবসায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছেন।

৫. চর্মকার

চামড়ার কাজ করেন যারা তাদের চর্মকার বলা হয়। চামড়া দিয়ে জুতো, স্যান্ডেল, ব্যাগ প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র এরা নির্মাণ করেন। হিন্দুদের একাংশ এদের ঋষি সম্প্রদায়ও বলেন। উল্লেখ্য, চামড়ার কারিগরদের পারিবারিক পদবি ঋষি। চৌহাট্টার ঋষি সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্র তৈরির ইতিহাসও দীর্ঘদিনের। সম্ভবত এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মাধবপুর থেকে এখানে আগমন করে থাকবেন। হবিগঞ্জের মাধবপুরই তাদের আদি নিবাস বলে আমাদের জানিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় ঋষি। এরা কয়েক পুরুষ যাবৎ এখানে চামড়া দ্বারা তৈরি হয় এমন বাদ্যযন্ত্র যেমন: তবলা, নাল, ঢোল, খোল, ডপকি প্রভৃতি এবং জুতো তৈরি করেন। মেরামতের কাজও তাদেরই করতে হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ পেশাদার তবলা বা নাল বাদক। কেউ কেউ অবশ্য পড়াশুনা শিখে অন্য কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বাবুল শীল একজন চর্মকার। তার পিতা সম্ভু শীল। পিতা ও পূর্ব পুরুষেরা চুল কাটতেন, খোল, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করতেন। বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের চাহিদা কমে যাওয়ায় তিনি জুতো তৈরি ও মেরামতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্থায়ী নিবাস ময়মনসিংহে। তবে বেশ কিছুদিন যাবৎ সিলেট শহরের মদিনামার্কেট এলাকায় বসবাস করছেন। তার সঙ্গে সঞ্জীবন শীলও কাজ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ রবি দাসও একজন চর্মকার। বয়স ৪৫ বছর। তাঁর পিতার নাম শ্রীসন্ধ্যাসী রবি দাস এবং মাতার নাম জয়ন্তী বালা দাস। কানাইঘাট উপজেলার গোয়াইলজুর গ্রামে তিনি বাস করেন। পিতা শ্রীসন্ধ্যাসী রবি দাসও চামড়া শিল্পি ছিলেন। মূলত এ পেশা তাদের বংশগত; পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণ তার পিতার কাছ থেকে এ কাজ শিখেছেন। স্বল্পশিক্ষিত এই ব্যক্তি ৮-৯ বছর বয়সেই কাজ শিখা শুরু করেন এবং আজ প্রায় ৩৩ বছর যাবৎ এই কাজ করছেন। তিনি মূলত জুতা সেলাই করেন। তার মাসিক আয় ৫-৬ হাজার টাকা। তবে তিনি তার ছেলে-মেয়েদের এ পেশায় না এনে অন্য পেশায় নিযুক্ত করবেন বলে আমাদেরে জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

বাবুল রবিদাস অন্য একজন চর্মকার। প্রায় ৪০ বছর যাবৎ তিনি এই কাজ করছেন। মূলত জুতা সেলাই করেন। এই কাজ বাবুল দাস তার পিতা মনিয়া দাসের কাছ থেকে শিখেছেন। এটি তাদের বংশগত পেশা। তিনি ১৫-১৬ বছর বয়সে জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখে ছোট্ট এক খুপড়িতে নিজে সেলাই করা শুরু করেন এবং এখনও করছেন। তার মাসিক আয় ৫-৬ হাজার টাকা। বাবুল দাসের ভাই রঞ্জু দাস, মঞ্জু দাস ও ছেলেরাও এই পেশার সাথে যুক্ত। কানাইঘাট উপজেলার কাহারদি গ্রামে তাদের বাস।

কানাইঘাট উপজেলার বনিগ্রামে বসবাস করেন রিপন মিয়া। তার বয়স ২৪ বছর। তিনি ৫ বছর যাবৎ জুতা সেলাইয়ের কাজ করছেন। তার পরিবারের কেউ এই পেশার সাথে যুক্ত নয়। তিনি জীবিকার তাগিদে এই কাজ শিখেছেন। তার পিতার নাম এমরান মিয়া, মাতার নাম আলেয়া বেগম এবং মাসিক আয় ৩-৪ হাজার টাকা।

এছাড়া কমল মিয়া, এনায়েত হোসেন, রঞ্জু কর, জীবন ছত্রীসহ আরো প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন চামড়া শিল্পি কানাইঘাটে কাজ করছেন। এদের অনেকে মুচি বলে আখ্যায়িত করেন।

৬. শব্দকর

মৌলভী বাজারের বাঁশ বা কাঠ দ্বারা যেসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়, সেগুলোর নির্মাতা ও বাদকদের বলা হয় শব্দকর বা বাদ্যকর। এরা চামড়া নির্মিত বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করেন। বিভিন্ন প্রকার বাঁশি, হারমোনিয়ম, জিপসি এবং বিয়ের বাদ্যযন্ত্র বা ব্যান্ড এরা তৈরি করেন। বর্তমানে এসব বাদ্যকর উপাধিধারিরা কর উপাধির মধ্যে হারিয়ে গেছেন এবং এদের পেশারও ঘটেছে পরিবর্তন। শব্দকর সম্প্রদায়ের চেয়ে অন্য সম্প্রদায় এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ও এই ব্যবসায় এখন অনেক এগিয়ে।

সুরশ্রীর স্বত্বাধিকারি মিন্টু কাসার বৈদ্য জানান, শব্দকর সম্প্রদায়ের বাইরে তিনিই প্রথম এ ব্যবসায় আসেন। বর্তমানে এ পেশায় কম হলেও ২০ টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তিনি জানান, প্রায় ৪০ বছর আগে অর্থৎ স্বাধীনতার পরপরই এ ব্যবসা শুরু করেন। তখন তাঁর ভাই কামিনী বৈদ্য ও তিনি দোকানে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁর ভাই নিজস্ব দোকান দিয়েছেন। তিনি (মিন্টু বৈদ্য) তাঁর দুই ছেলে রিংকু বৈদ্যও পিংকু বৈদ্যকে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ মুহূর্তে তাঁর দোকানে ১০ জন কর্মচারী এবং তিনি ও তাঁর দুই ছেলে কাজ করেন।

৭. ব্যান্ড বাদক

সিলেটে বেশ কয়েকটি দক্ষ ব্যান্ড বাদক দল আছে, যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের উৎসবে বাজনা বাজিয়ে থাকেন। যদিও এই পেশাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য স্পষ্ট, তথাপি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও ভালই কাজ করছেন। মুসলিম বাদক দলের মধ্যে লামাবাজারের *জালালাবাদ ব্যান্ড* দলই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এরা সানাই, ক্লারিওনেট, জিপসি, পিতল ও বাঁশের বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও ভীষণ দক্ষ।

www.pathagar.com

৮. ঠেলা শ্রমিক

সিলেট থেকে বের হতে হলে একসময় ক্বীন ব্রিজ পার হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু নিচ দিয়ে স্টিমার চলাচল করতো বিধায়, এই ব্রিজটি খুবই উঁচু করে বানানো হয়েছিল। রিক্সা চড়ে এই ব্রিজ পার হতে হলে পেছন দিক থেকে তাই ঠেলা দেয়ার প্রয়োজন পড়তো। সুনামগঞ্জ ছাড়া সিলেটের বাইরে যে কোনো স্থানে যাতায়াতের জন্য যেহেতু বিকল্প কোনো রাস্তা বা ব্রিজ তখন ছিলনা, তাই এখানে ঠেলা শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। কয়েকশ ঠেলা শ্রমিক দিন রাত এখানে অনবরত কাজ করতেন। বর্তমানে আরো কয়েকটি ব্রিজ হওয়ায়, আগের মতো ভীর এখানে হয় না। তবু ঠেলা শ্রমিকরা এখনো এখানে আছেন এবং এই পেশা বেশ ভাল ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯. খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কারক

চটপটি, ফুচকা, আচার, চানাচুর প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারকের সংখ্যা কেবল সিলেট শহরেই সহস্রাধিক হবে। উপজেলা শহরগুলোতেও এই সংখ্যা খুব কম নয়। তৈরি দ্রব্য সুস্বাদু হওয়ায় চাহিদাও প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ সমূহের ক্যাম্পাসের ভেতরেও এরা ব্যবসা করেন। স্কুল, কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেটের সামনে বেশ কিছু ভ্রাম্যমাণ স্টল; প্রতিষ্ঠান খোলা থাকাকালীন দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া জিন্দাবাজার, আম্বরখানা, মদিনা মার্কেট, তালতলা, চৌহাট্টা, নয়াসড়ক, জেল রোড, সুপানি ঘাট, শিশুপার্ক মোড়, কোর্টপয়েন্ট প্রভৃতি এলাকায় এরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবসা করেন।

মো. হেলাল একজন ভ্রাম্যমাণ চটপটি প্রস্তুতকারক। একসময় তিনি একজন ভ্রাম্যমাণ চটপটি প্রস্তুতকারক এর গাড়ি চালক ছিলেন। পরবর্তীতে প্রস্তুতকারকের প্রস্তুত কৌশল প্রত্যক্ষ করে তিনি নিজে এই কাজ শেখেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এই পেশায় আছেন বলে জানিয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ হলেও তার গাড়িটি বর্তমানে সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন মদিনামার্কেট এলাকায় থাকে। শাহজালাল জামেয়া মাদ্রাসা এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই মূলত তার তৈরি খাবার খেয়ে থাকে। তার দোকানের নাম মা চটপটি।

মো. বাবুলও একজন ভ্রাম্যমাণ চটপটি প্রস্তুতকারক। মূল বাড়ি নেত্রকোনায়। আগে মদিনা মার্কেটের একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন। সেখান থেকেই চটপটি বানানো শেখেন। পরবর্তীতে একটি চার চাকার ছোট ভ্যান বানিয়ে, তার উপর চটপটির সরঞ্জাম রেখে, বিভিন্নস্থানে চটপটি বিক্রি করতে থাকেন। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মদিনা মার্কেটেই ব্যবসা করেন। তার সহযোগী হিসেবে আছে ছোট ভাই মনির। এছাড়া প্লেট ধোয়ার জন্য আছে পিচ্চি একটা ছেলে, যার বয়স ৮/৯ এর বেশি নয়। তার নাম মুর্শেদ, বাড়ি গাইবান্ধা। তবে জন্মের পর থেকেই সিলেট শহরের মদিনা মার্কেটে অবস্থান করছে। তার বাবার নাম সুরুজ জামাল। তিনি রিক্সা চালানোর জন্য সিলেট আসেন। পরে এখানে রিক্সা মেরামতের কাজ শেখেন এবং বর্তমানে সেই কাজই করছেন। বাবুলের চটপটির দোকানে কাজ করে মুর্শেদ দৈনিক ৩০ টাকা আয়

www.pathagar.com

করে। দুপুর ২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এখানে সে প্লেট ধোয়ার কাজ করে। তবে সে চটপটিও তৈরি করতে পারে। এখন এই কাজটিও সে ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে।

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারকদের মধ্যে সিঙারা ও জিলাপি নির্মাতারা উল্লেখযোগ্য। এরা বিভিন্ন চৌরাস্তার মোড়ে দোকান বা স্টল বানিয়ে চায়ের সঙ্গে এসব খাদ্য সামগ্রি তৈরি ও বিক্রি করেন।

সোহেল আহমদ একজন দক্ষ শিঙারা প্রস্তুতকারক। মূল বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ থানার নোয়াখালি গ্রামে। বয়স ৪২ বৎসর। পিতার নাম নাসিম মিয়া, মাতার নাম চন্দ্রবান বানু। মদিনা মার্কেটস্থ *আনন্দ* রেস্তোরায় কাজ করেন। ছোলা, পরটা, শিঙারা, সমোচা, মোগলাই, পিয়াজু প্রভৃতি তৈরি করতে পারেন। তার শিক্ষকের নাম বরীন্দ্র বাবু। বরীন্দ্র বাবু সুনামগঞ্জে থাকেন।

মো. শিপন অন্যতম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক। বয়স ৩২। স্থায়ী নিবাস সিলেটের কুমারগাও। পিতার নাম শাবু মিয়া, মাতার নাম ফিরোজা বেগম। ১২/১৩ বৎসর যাবৎ মদিনা মার্কেটে ব্যবসা করছেন। তিনি *আনন্দ* রেস্তোরা-র মালিক। পূর্বে কুমারগাও বাসস্টান্ডের একটি হোটেলে চাকরি করেছেন। ছোলা, পরটা, শিঙারা, সমোচা, মোগলাই, পিয়াজু প্রভৃতি তৈরি করতে পারেন। তার চার ভাইয়ের সবাই এই কাজ জানেন। এক ভাই ঢাকার একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করেন।

১০. ঠাকুর/বাবুর্চি

হিন্দু সম্প্রদায়ের রান্নার কাজ যারা করেন, তাদের রন্ধন ঠাকুর বা রান্নার ঠাকুর বলা হয়। এরা বিশেষ এক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। অনেকে পূজার অনুষ্ঠানে এই ব্রাহ্মণদেরকে দিয়ে রান্না করে খাওয়ান। এসময় এই রান্নার ঠাকুরের প্রয়োজন পড়ে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে এদের প্রয়োজন অসামান্য। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই এদের দিয়ে উৎসবে রান্না করিয়ে থাকেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় অনুষ্ঠানে মুসলিম বাবুর্চির খুবই প্রয়োজন। এদের কেউ কেউ তাই বিজ্ঞাপনও দিয়ে থাকেন।

১১. মুড়ি প্রস্তুতকারক •

সিলেট শহরসহ উপজেলা শহরগুলোর দোকানে পেকেট বন্দি ভাল মুড়ি পাওয়া গেলেও এগুলো বিশুদ্ধ নয় বলে অনেকের অভিযোগ। আর তাই সচেতন জনগণ, বাড়িতে নিয়ে আসা বিক্রেতার কাছ থেকে মুড়ি ক্রয় করেন। এই মুড়ি গ্রামের মানুষ কর্তৃক তৈরি হয়। অগের মতো চাহিদা না থাকায়, বিশেষত পেকেট বন্দি মুড়ি দেখতে উজ্জ্বল বা সুন্দর হওয়ায় অধিকাংশ লোক সেই মুড়ি ক্রয় করেন। আর একারণে তাদেরও ব্যবসা খুব সফল এ কথা বলা যায় না।

মনোরঞ্জন দাস একজন মুড়ি প্রস্তুতকারক। তিনি বিগত ২০ বৎসর যাবৎ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেই মুড়ি ও চিড়া প্রস্তুত করেছেন। বর্তমানে বয়সের কারণে নিজে তৈরি করেন না। তবে পরিবারের অল্পকয়েকজন সীমিতভাবে তা প্রস্তুত করে এবং তিনি পলিথিনের বস্তায় ভর্তি করে মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করেন।

www.pathagar.com

তাঁর বাবার নাম স্বর্গীয় মথুর দাস এবং মায়ের নাম অন্নদা রাণী দাস। এই বিক্রেতার বয়স আনুমানিক ৬৫ বৎসর।

১২. গৃহনির্মাণ শিল্পী

ছন বা মাটির ঘর যারা নির্মাণ করেন, তাদের সকলেই মূলত নিজেদের ঘর নিজেরা তৈরি করেন। এদের মধ্যে কেউ বিশেষ পারদর্শী হলে একবেলা খাইয়ে অন্য কেউ তার বিশেষ সহযোগিতা গ্রহণ করেন। কিন্তু পাকা দালান কোঠা তৈরিতে সম্পূর্ণই পেশাদারিত্ব মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকৌশলীরা উচ্চ শিক্ষিত হলেও মিস্ত্রি হিসেবে যারা কাজ করেন, তাদের প্রায় সকলেই হয় নিরক্ষর, নতুবা স্বল্প শিক্ষিত। কিন্তু এদের দ্বারা তৈরি অট্টালিকা বা দালান কোঠা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টি নন্দন এসব দালানের রংয়ের কাজও দর্শনীয়। সিলেট শহরে এধরনের মিস্ত্রি বা কারিগরের সংখ্যা অসংখ্য। প্রায় প্রতিটি এলাকায় নিত্য নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে, আর এতে কাজ করে যাচ্ছেন এসব সুদক্ষ শ্রমিকগণ। উপজেলা এমনকি গ্রামেও এরা কাজ করেন। প্রবাসীরা তাদের গ্রামে দৃষ্টি নন্দন অট্টালিকা বা বাংলো তৈরি করেন বিধায়, সেখানে এসব মিস্ত্রিগণ কাজ করেন। সিলেটে কাজের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় সিলেটের বাইরের শ্রমিকগণও এখানে এসে কাজ করেন।

মঈন, শৈলেন সরকার, দ্বিজন দেবনাথ, মো. আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখরা এধরনের রাজমিস্ত্রি। এরা ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের পাকা দালান তৈরি করেন।

শৈলেন সরকারের মায়ের নাম কুকি রাণী সরকার, বাবার নাম শশীন্দ্র সরকার। বয়স ৩২ বৎসর। মূল বাড়ি নেত্রোকোনার আদাউরা গ্রামে। ২০/২১ বৎসর যাবৎ সিলেট শহরে রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন। প্রথমে জোগালির কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু। ছোট ভাই শৈশব সরকারও রাজ মিস্ত্রির কাজ করেন। সিলেট শহরের করের পাড়ায় এরা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেন।

মো. আব্দুল কাইয়ুম-এর বয়স ৩৩ বৎসর। পিতার নাম মো. মন্টু মিয়া, মাতার নাম সাফিয়া আক্তার। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাঃ রসুল বাগ, ব্রাহ্মণশাসন, সিলেট। ছোট বেলা থেকে জোগালির কাজ করতে করতে রাজমিস্ত্রি হন।

মঈনের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালিতে। তবে শৈশব থেকে সিলেটে পাকা দালান তৈরির কাজ করছেন। প্রথমে তিনিও জোগালির কাজ করতেন। পরে রাজমিস্ত্রির কজে আত্মনিয়োগ করেন। বৃহৎ ও মনোরম অট্টালিকা নির্মাণে তিনি পারদর্শী। যখন যে বিল্ডিং তৈরি করেন; তখন সেখানেই অবস্থান করেন। দক্ষ শিল্পি হওয়ায় একটার পর একটা কাজ তিনি করেই যাচ্ছেন।

দ্বিজন দেবনাথ একই সঙ্গে কাঠ, রং এবং রাজমিস্ত্রি। স্থায়ী নিবাস জাউয়া বাজার, সুনামগঞ্জ। জন্ম থেকেই অবস্থান করছেন সিলেট শহরের হাওয়লদার পাড়ায়। বয়স ৩১ বৎসর। পিতা ও কাকারা কাঠমিস্ত্রি। ফলে কাঠের কাজ তার পৈতৃক বা বংশগত পেশা। শৈশবে রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করতে করতে দালান তৈরির কাজ শেখা। বেশ কয়েকটি পাকা দালান তিনি তৈরি করেছেন। বাড়ি বানানোর পর রং মিস্ত্রির জোগালির কাজ করতে গিয়ে দক্ষ রং মিস্ত্রিও হয়ে ওঠেন। তার পিতার নাম বজেন্দ্র

www.pathagar.com

দেবনাথ বজি, মাতার নাম দ্রৌপদী দেবনাথ। করের পাড়ার অজিত এবং ফুলকুমারও বার্নিশ এবং দালান কোঠার রংয়ের কাজে দক্ষতার পরিচয় রাখছেন।

১৩. ধুনকর সম্প্রদায়

লেপ তোষক তৈরির জন্য সিলেটে একসময় তেমন কোনো দোকান ছিলনা। ভ্রাম্যমাণ প্রস্তুতকারকই এগুলো তৈরি করতেন। এখন যদিও বেশ কিছু দোকান চোখে পড়ে, তবু শীতকাল শুরুর সময় লেপ তোষক প্রস্তুতকারকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে লেপ তোষক তৈরি করবে কিনা এমন হাঁক দিতে দেখা যায়। যেহেতু এরা চোখের সামনে কাজ করেন; তাই পছন্দমতো তুলা ও কাপড় ব্যবহার করা যায়। কাজের মূল্যায়নও করা যায় ভাল করে। গৃহস্থ তাই এদের উপরই ভরসা করেন বেশি। যদিও প্রস্তুতকারকদের অবস্থান মূলত সিলেট শহরে, তবু এরা গ্রামেও মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। এই পেশায় জড়িত লোকদেরে ধুনকর বলা হয়ে থাকে।

সিলেট শহরে কয়েক শতাধিক ধুনকরের বাস। তন্মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ধুনকরের সংখ্যা বেশি। দোকান ভাড়া নিয়ে যারা এই পেশায় অর্থাৎ লেপ, তোষক, বালিশ নির্মাণ পেশায় কাজ করছেন; তাদের অধিকাংশই সিলেট জেলার স্থায়ী অধিবাসী। তবে ভ্রাম্যমাণ ধুনকরের মধ্যে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ থেকে আগতদের সংখ্যা অধিক।

নূর বক্স কানাইঘাটের ধূনকরদের মধ্যে অন্যতম। তার পিতার নাম তৈয়ব আলী, মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। তিনি ১৯৫৫ সালে সর্দার মাঠ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ তিনি এ পেশার সাথে যুক্ত। তিনি তার ভগ্নিপিত মুহিবুল ইসলামের কাছ থেকে এ কাজ শিখেছেন। নূর বক্স লেপ, তোশক, বালিশ, জাজিম প্রভৃতি বানাতে সিদ্ধহস্ত। প্রথমে কাজ শিখে ১০ বছর ভগ্নিপতির সাথে কাজ করেছেন। ২০ বছর যাবৎ নিজে দোকান দিয়ে একাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার ছেলেদেরও এ পেশায় নিযুক্ত করেছেন।

নিজাম উদ্দিন, পিতা: হাফিজ উল্লাহ, মাতা: তরিকা বিবি, কানাইঘাটের গাছবাড়ী বাজারে দীর্ঘদীন যাবৎ ধুনকর হিসেবে কাজ করে আসছেন। তিনি ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে স্থানীয় ধুনকর বশির আহমদের কাছে এ কাজ শিখতে শুরু করে প্রায় ৩-৪ বছরে কাজ রপ্ত করে ফেলেন। এরপর গাছবাড়ী বাজারে নিজে দোকান দিয়ে ২২-২৩ বছর যাবৎ এই পেশায় কাজ করছেন। তিনি এই কাজে প্রায় সকল প্রকার জিনিস তৈরিতেই পারদর্শী। এ থেকে মাসে তার ৮-১০ হাজার টাকা আয় হয়। নিজামউদ্দিন এই ধুনের কাজ ৪-৫ জনকে শিখিয়েছেন। তার ছেলেদেরও তিনি এই কাজে পারদর্শী করে তুলতে চান।

সিলেটের প্রত্যেকটি উপজেলাতেই ৫০/৬০ জন করে ধুনকর বসবাস করেন।

১৪. রিক্সা-চালক

সিলেট শহরে ঢাকা, কিংবা চট্টগ্রামের মতো টাউন বা সিটি বাস নেই, কেবল বন্দরবাজার থেকে কুমারগাঁও রুটে কয়েকটি ছোট বাস চলে। এই অভাব টেম্পু এবং লেগুনা দ্বারা অনেকটা দূর হয় বটে, তবে রিক্সার অভাব অনুভূত হয় সর্ব ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রিক্সার ড্রাইভারদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পরে যায়—কে কাকে ভাড়ায় নিয়ে যাবে। অথচ সিলেট এমনকি উপজেলা শহরেও রিক্সা পাওয়া শক্ত। তাই বলে এমন নয় যে, এখানে রিক্সা খুব অল্প চলে। সিলেট শহরে জ্যাম যদি হয়ে থাকে তো তা রিক্সার জ্যামই বেশি হয়। কিন্তু যাত্রীরা ৩০/৪০ মিনিট অপেক্ষা করেও অনেক সময় খালি রিক্সা পান না। যদিও পাওয়া যায়, ড্রাইভারগণ তাদের সুবিধামতো জায়গা ছাড়া যেতে চান না। এ কারণে শহরের প্রত্যেক বাসায় একাধিক মটর সাইকেল প্রত্যক্ষ হয়। পুরুষগণ এই যানের উপর দারুণ নির্ভরশীল। মহিলাদেরেও অনেক সময় মটর সাইকেলে করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া হয়। কিন্তু সিলেট শহরে রিক্সার সংখ্যা অগণিত। এর মধ্যে বৈধ-অবৈধ সবই আছে। একসময় (১৯৮৮-৯২) রিক্সাচালকদের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিশেষত কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনার অধিবাসী বেশি ছিল। ১৯৯৩-৯৪ থেকে এই পেশায় উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে মোট রিক্সাচালকের ৯০ শতাংশ উত্তরবঙ্গের। তন্মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা ও বগুড়ার রিক্সা ড্রাইভার বেশি। লালমনির হাট, শরিয়তপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রিক্সা ড্রাইভারও এখানে দেখা যায়। এদের অনেকে রিক্সা মেরামতের কাজেও সম্পৃক্ত। সিলেটে একমাত্র এই পেশার লোকজনই একসঙ্গে কোথাও বসবাস করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত এই পেশাজীবী মানুষ প্রধানত রিক্সার মালিকের গ্যারেজের পাশে কলোনির মতো বসবাস করেন। পরিবারসহ বসবাসের সংখ্যাও এক্ষেত্রে কম নয়। এদের আয় ভালই হয়, তবে মালিককে দৈনিক ৪০০-৬০০ টাকা দিতে হয় বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৫. পাথর ও বালু ব্যবসায়ী

গোয়াইন ঘাট উপজেলার জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য স্থান। দূর দূরান্ত থেকে এখানে মানুষ আসে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন করতে। ফলে এখানে নানা ধরনের পেশাজীবী মানুষের সমাবেশ ও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তবে ব্যবসায়ীদের জন্য এই এলাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলত পাথরের কারণে। ভারত থেকে বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের পাথর প্রতিদিনই জলের সাথে এই অঞ্চলে আসে। এই পাথর উত্তোলন, সংগ্রহ ও বিক্রির কাজে নিয়োজিত আছেন কয়েক সহস্রাধিক মানুষ। বলা হয়ে থাকে যে, এখানকার পাথর দিয়েই সমগ্র দেশের রাস্তা-ঘাট তৈরি ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়। এই পাথর উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হয় নৌকা, পর্যটকদের ভ্রমণের জন্যও নৌকার প্রয়োজন পড়ে। শত শত নৌকা তাই এখানে দেখা যায়। পাথর উত্তোলন, ভাঙা, চালনি প্রভৃতি কাজের জন্য স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি অনেক অস্থানীয় লোক কাজ করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত এসব শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের অনেকে এখানে স্থায়ী নিবাসও তৈরি করেছেন। এসব কাজের জন্য আবার তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টুকরি, চালনি প্রভৃতি। বাঁশের তৈরি এসব দ্রব্যের চাহিদা বেশি হওয়ায় এগুলোর দাম অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অনেক বেশি।

পাথর অবশ্য কেবল জাফলংয়েই নয়, ভোলাগঞ্জেও পাওয়া যায়। আর তাই সিলেট শহরে বসবাস করলেও এদের অনেকেই ব্যবসা করেন ভোলাগঞ্জে। জাফলংয়ের নিকটবর্তী স্থানে সারিনদী তথা সারিঘাট এর অবস্থান। গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়

www.pathagar.com

এমন বালি পাওয়া যায় সেখানে। এখানেও তাই বালি ব্যবসায়ী এবং তৎ সংশিৱষ্ট কাজের জন্য গড়ে ওঠেছে নানা পেশার শ্রমজীবী।

১৬. চিত্রশিল্পী

সিলেট শহরে তো বটেই, উপজেলা শহরগুলোতেও চিত্রশিল্প বেশ খানিকটা স্থান দখল করে নিয়েছে। নানা ধরনের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য যেসব ব্যানার তৈরি হয়, এই শিল্পিগণ সেই কাজই সম্পাদন করে থাকেন। কাপড়ের ব্যানারের পাশাপাশি এরা অবশ্য দেয়াল লিখনও ভাল করে থাকেন।

অবিনাশ সরকার দক্ষ চিত্রশিল্পি। তার পিতার নাম নিবারণ সরকার, মাতার নাম শৈলবালা সরকার। কেই জীবিত নেই। সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় স্থায়ী নিবাস। তবে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ তিনি সিলেট শহরের করের পাড়ায় অবস্থান করছেন। তাঁর জন্ম ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। শহরের মদিনা মার্কেট এলাকায় তার একটি ছোট দোকান রয়েছে, এর নাম বর্ণালী এ্যাড। বিভিন্ন ধরনের ব্যানার, সাইন বোর্ড এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিও তিনি অঙ্কন করেন। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন আব্দার মেটাতে বিনা মূল্যে এসব আঁকতেন। পরে পেশা হিসেবেই একে বেছে নেন।

চিত্রাঙ্কন শেখার ব্যাপারে তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, শিক্ষকও নেই। নিকট আত্মীয়ের চিত্রাঙ্কন কৌশল প্রত্যক্ষ করেই তিনি এই কাজে উৎসাহী হন এবং নিজে নিজেই অনুশীলন করতে থাকেন।

মো. রাশেদের বয়স ২০ বৎসর। পিতা: আব্দুল মজিদ সিদ্দিক, মাতা: রহমতুন বেগম। স্থায়ী ও বর্তমান নিবাস: নালিয়া, ৩ নং খাদিম নগর ইউনিয়ন। কাজ করেন মদিনা মার্কেটের বৈচিত্র্য আর্টে। বিভিন্ন ধরনের ব্যানার ছাড়াও ফুল, নকশা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি আঁকতে পারেন। কাজ শিখেছেন খালাত ভাইয়ের কাছে। এই ভাইয়ের নাম এম. এ জব্বার।

এম. এ জব্বার একজন অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পি। বয়স ৩৫ বৎসর। পিতা: মৃত ওয়াজিদ মিয়া, মাতা: আছিরুল বেগম, স্থায়ী ও বর্তমান নিবাস: উপর পাড়া, টুকরবাজার ইউনিয়ন। মদিনা মার্কেটস্থ বৈচিত্র্য আর্টের তিনি স্বত্ত্বাধিকারী। ৮ বৎসর যাবৎ এখানে তিনি কাজ করছেন। বংশগত পেশা কৃষিকাজ। তবে বাবা রাজমিস্ত্রি ছিলেন। প্রথমে যোগালির কাজ করতেন। পরে কাজ করতে করতে রাজমিস্ত্রি হন। তার ভাইয়েরাও রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। জব্বার পার্শ্ববর্তী একজনের আর্টের কাজ দেখে এইকাজ শেখেন এবং পরে তার কাজ দেখে খালাত ভাই রাশেদ এইকাজে আসেন। রাশেদ এখন জব্বারের কাজে সহায়তা করেন।

সেলিম আর্টের স্বত্ত্বাধিকারীর নাম মোঃ সেলিম। তিনি মদিনা মার্কেট এলাকার প্রবীণ চিত্রশিল্পি। সিলেটেই তার স্থায়ী নিবাস। পূর্বে উল্লিখিত জনপ্রিয় চিত্রশিল্পি জব্বারকে তিনিই আর্ট শিখিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তবে কিছুদিন বিদেশে থাকার কারণে এখানে তার ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে বলে তার অভিমত।

www.pathagar.com

মদিনা মার্কেট ছাড়া সিলেটের সুরমা মার্কেট এলাকায় অনেক চিত্রশিল্পি রয়েছেন। ওই এলাকায় ক্রেস্ট, রাবার স্ট্যাম্প প্রভৃতি তৈরির কাজে যুক্ত আছেন শ-দুয়েক শ্রমজীবী।

১৭. বস্ত্র প্রস্তুতকারক

বর্তমানে বালাদেশে সস্তা দরে জামা-কাপড় পাওয়া যায় বিধায়, স্থানীয়ভাবে তেমন কোনো উৎপাদন চোখে পড়েনা। সস্তা দরে মেশিনে তৈরি গরম কাপড় পাওয়া যাওয়ার কারণে উল নির্মিত হস্ত শিল্পও বিলুপ্তির পথে। তবে মণিপুরি ও খাসিয়া নির্মিত কিছু বস্ত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে এখনো টিকে আছে। বিশেষত মণিপুরিদের তৈরি চাদর, শাড়ি, ফতোয়া প্রভৃতি বেশ ভাল ভাবেই এখানে ব্যবসা করছে। তবে বর্তমানে বাঙালিদের মধ্যে সেলাই শিল্পের অভূতপূর্ণ উন্নতি ঘটেছে। শহরের প্রায় প্রতিটি পাড়াতেই একাধিক টেইলার্স এখন প্রত্যক্ষ হয়। তন্মধ্যে মহিলা টেইলার্সের সংখ্যা অধিক। মেয়েদের বিভিন্ন জামা-সেলোয়ার তৈরি করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পর্দা এরা তৈরি করেন। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসা শুরু করেন। সচরাচর অবিবাহিত মেয়েরা নিজেদের নামে এবং বিবাহিত মহিলারা সন্তানের নামে তাদের প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন। স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাগণও নিজেদের নামেই টেইলার্স গড়ে তুলেছেন। যেমনঃ নিলু লেডিস টেইলার্স, সাথী টেইলার্স, বৃষ্টি টেইলার্স, পপি লেডিস টেইলার্স, সুষমা লেডিস টেইলার্স প্রভৃতি। নিজেরা কাপড় কিনে যেমন তারা জামা তৈরি করেন, তেমনি অন্যের ক্রয় করা কাপড় দিয়েও জামা তৈরি করেন। অধিক দোকান থাকার কারণে উপার্জন কিছুটা কম হয়, তবে সংসারের ব্যয় নির্বাহে এইটুকুও তাদের যথেষ্ট সহায়তা করে।

সিলেট সদর উপজেলার ৩নং খাদিমনগর ইউনিয়নের চাঁনপুর গ্রামের উমেদ আলীর মেয়ে আমিনা বেগম এমনি একজন সেলাই শিল্পি। ২০০৫ সালে স্থানীয় চাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন। অভাবের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারেননি। এদিকে পরিবারে আরো অস্বচ্ছলতা দেখা দিলে তিনি স্থানীয় সাহেব বাজারে গিয়ে এক টেইলারিং দোকানে কাজে যোগ দেন। সেখানে বিনা বেতনে তিন মাস কাজ করেন। পরে প্রথম অবস্থায় মাসিক পাঁচশত টাকা ও পরে এক হাজার টাকা বেতনে কাজ করতে থাকেন। এসময় তিনি মেয়েদের কামিজ, সেলোয়ার, ছেলেদের শার্ট, পেন্ট, ছোটদের পোশাক বানানো শেখেন। বর্তমানে দুইবছর ধরে নিজ বাড়িতে বসে সেলাইর কাজ করে মাসে দুই হাজার টাকা করে আয় করছেন।

নিলু রানী দাস পড়াশুনা করেছেন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। তার বাবার নাম দুখাই রঞ্জন দাস, মায়ের নাম ননী রানী দাস। স্থায়ী নিবাস সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জে। বর্তমানে ৫ বৎসর যাবৎ সিলেট শহরের হাওয়লদার পাড়ায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে মেয়েদের বিভিন্ন পোশাক তৈরি করছেন। তার বোন লাকি দাস তাকে এই কাজে সহায়তা করেন। বোনের পড়ার খরচ সহ বৃদ্ধ বাবা মায়ের ভরণ-পোষণ এ থেকেই চলছে। তিনি পূর্বে অন্য একটি লেডিস টেইলার্সে কাজ শেখেন।

www.pathagar.com

সিলেটে অরো বহু লোক; নানা লোক-পেশার সাথে যুক্ত আছেন। বাড়ি বাড়ি ফেরি করে মাছ, সব্জি প্রভৃতি বিক্রি করা মানুষ এদের অন্যতম। তবে শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনেকে চুরি, খেলনা, শাড়ি, বেড-কাভার প্রভৃতিও বিক্রি করেন।

তথ্যদাতা

১. ইস্রাক আলী, পিতা : ফাতির আলী, মাতা : জরিনা বিবি, বয়সঃ ৭৬, গাছবাড়ী, কানাইঘাট
২. বিজয় দে, পিতা : শৈলেন দে, মাতাঃ শান্তি রাণী দে, বয়স-৬০বৎসর, গাজীপুর, ঘিলাছড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
৩. সজল দে, পিতা : কিপেশ দে, মাতা : সুচিত্রা দে, বয়সঃ ৩৬ বৎসর, গাজীপুর, ঘিলাছড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ
৪. বেলাল আহমদ, পিতা : নজরুল ইসলাম, মাতা : হাসনা বেগম, বয়স ২৫ বৎসর, নারাইনপুর, কানাইঘাট
৫. আমিনা বেগম, পিতা : উমেদ আলী, চাঁনপুর, ৩নং খাদিমনগর ইউনিয়ন
৬. নিলু রানী দাস, পিতা : দুখাই রঞ্জন দাস, মাতা : ননী রানী দাস, বয়স : ২৫ বৎসর, হাওয়লদারপাড়া, সিলেট
৭. এম. এ জব্বার, বয়স ৩৫ বৎসর। পিতা : মৃত ওয়াজিদ মিয়া, মাতা : আছিরুল বেগম, উপর পাড়া, টুকরবাজার ইউনিয়ন
৮. অবিনাশ সরকার, পিতা : নিবারণ সরকার, মাতা : শৈলবালা সরকার, বয়স : ৩৭ বৎসর, ব্রাহ্মণ শাসন, সিলেট
৯. নিজাম উদ্দিন, পিতা : হাফিজ উল্লাহ, মাতা : তরিকা বিবি, বয়স : ৫৮ বৎসর, গাছবাড়ী, কানাইঘাট
১০. মো. আব্দুল কাইয়ুম, বয়স : ৩৩ বৎসর। পিতা : মোঃ মন্টু মিয়া, মাতা : মৃতাঃ সাফিয়া আক্তার, রসুল বাগ, ব্রাহ্মণশাসন
১১. অঞ্জন দেব, পিতা : হরিভূষণ দেব, মাতা : উমা দেব, বয়স : ৩৮ বৎসর, টুকর বাজার, সিলেট।
১২. রিংকু বৈদ্য, পিতা : মিন্টু কাসার বৈদ্য, বয়স : ২৫ বৎসর, পুরানলেইন, বন্দরবাজার, সিলেট।
১৩. শ্রীকৃষ্ণ রবি দাস, পিতা : শ্রীসন্ধ্যাসী রবি দাস, মাতা : নাম জয়ন্তী বালা দাস, বয়স ৪৫ বছর, গোয়াইলজুর, কানাইঘাট
১৪. দেবদুলাল বণিক, পিতা : সন্তোষ বণিক, বয়সঃ ৪৩ বৎসর, দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।
১৫. দ্বিজন দেবনাথ, পিতা : বজি দেবনাথ, মাতাঃ দ্রৌপদী দেবনাথ, বয়স ৩১ বৎসর, হাওয়লদার পাড়া।
১৬. বিধান সরকার, পিতা : মনোরঞ্জন সরকার, মাতাঃ কমলা রাণী, বয়স : ২৯ বৎসর, কালীবাড়ি রোড, সিলেট
১৭. স্বপন কর, পিতা : ননী কর, মাতাঃ রাণী কর, বয়সঃ ২৯ বৎসর, কালীবাড়ি রোড, সিলেট।
১৮. গোলাম রব্বানি, পিতা : আব্দুল হাসিব নুমানি, মাতাঃ আনহার বেগম, বয়স ২৪ বৎসর, গঙ্গাজল, জকিগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

প্রকৃতি থেকে বিদ্যাপ্রাপ্ত যেসব মানুষ নিজস্ব প্রযুক্তিতে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরা বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে আসছে, সেগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক. বাঁশজাত লোকপ্রযুক্তি

১. পলো

এটি একটি ক্ষুদ্র আলমারি বা গোলাকার পিরামিড আকৃতির মাছ ধরার যন্ত্র। এ দ্বারা সাধারণত কৈ, মাগুর, শিঙি, পুটি প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। যন্ত্রটি তৈরি হয় বাঁশের শলাকা দ্বারা। নির্মাতা প্রথমে বাঁশ কেটে ২ থেকে ২.৫ ফুট আকৃতি বিশিষ্ট কয়েকটি ছোট ছোট শলাকা তৈরি করেন। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে খাপ। ধারালো দা দ্বারা এরপর এগুলোকে মসৃণ করা হয়। আলমারি আকৃতির গুলো চতুষ্কোণ এবং অন্যগুলো ত্রিভুজাকৃতি হয়ে থাকে। উপরের দিক খানিকটা সরু ও নিচের দিক প্রশস্ত রেখে মাঝে মাঝে আড়াআড়িভাবে খুব সতর্কভাবে বাইন করতে হয় । ফাঁকগুলো এমনভাবে থাকে যাতে এর ভেতর দিয়ে মাছ বেরুতে না পারে। বাইনের পর নির্মাতা পলোর নিচের দিকে দুটো ক্ষুদ্র প্রকোষ্ট তৈরি করেন, যার বাইরের দিকের মুখ থাকে বড় এবং ভেতরের দিক ছোট। জলাশয়ে বিশেষত হালকা স্রেতের দিকে পলোটি রাখলে বাইরের দুটো মুখ দিয়ে মাছ ভেতরে প্রবেশ করে, কিন্তু পরে আর বাইরে বের হতে পারেনা।

সচরাচর ছোট ছোট খাল, ড্রেন, ডোবা, ধানক্ষেতের নিচু এলাকা অথবা বর্ষার উপচে পড়া জলে এই পলো রেখে মাছ শিকার করা হয়। শলাকার দৈর্ঘ্য ২ থেকে ২.৫ফুট হলেও কলসির আকৃতিতে তৈরি করায় পলোর উচ্চতা ১.৫ থেকে ২ফুটের বেশি হয়না।

২. খলই

মাছ ধরে যে পাত্রে রাখা হয় তার নাম খলই। এটিও বাঁশ দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্র। পূর্ববৎ শলাকা তৈরি করে আরো পাতলা ও মসৃণ করা হয় এগুলোকে। নির্মাতা এরপর কতগুলো লম্বা শলাকার ভেতর দিয়ে অধিকতর পাতলা লম্বা শলাকা (ছিপ) উপর নিচ দিয়ে বাইন করে গোলাকৃতির (ছোট বালতির মতো) খলই তৈরি করেন। খলই এর নিচের অংশ অপেক্ষাকৃত শক্ত বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়। শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ যাতে লাফ দিয়ে চলে যেতে না পারে এজন্য কোনো কোনো খলই বেশ উঁচু অথবা ঢাকনা যুক্ত থাকে। খলই-এ ছিদ্র থাকা বা না থাকা অত্যাবশ্যক নয়।

৩. হাতজাল

নির্মাতা প্রথমে ৩ থেকে ৪ফুট আকৃতির ৩টি বাঁশের কঞ্চি নিয়ে, এর মুখগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে ত্রিভুজ নির্মাণ করেন। এরপর ত্রিভুজের সব বাহুতে ছেঁড়া

www.pathagar.com

মশারির নেট বা বড় জালের ছেঁড়া অংশ লাগিয়ে, নিচের দিক একত্র শেলাই করে বা দড়ি দিয়ে বেঁধে বন্ধ করে দেন। এভাবে নিচের দিক বন্ধ ও উপর উন্মুক্ত হাত জাল তৈরি হয়। ক্ষুদ্রাকৃতির এই জাল দিয়ে পুকুর, নদী, দিঘি বা ছোট জলাশয়ে একা একা মাছ ধরা যায়। কেউ কেউ যেকোনো দুটি কঞ্চির যেকোনো সংযোগ স্থলে একটি বাঁশের টুকরো যুক্ত করে হাতল তৈরি করেন। ওখানে ধরে জালটিকে তারা জলের নিচে ধরেন। ছিদ্র ছোট থাকলে ছোট মাছও এই জাল দ্বারা ধরা যায়।

৪. টুকরি

সাধারণত জমি থেকে ঘাস আনয়ন করতে এবং ঘাস রাখার জন্য টুকরি ব্যবহৃত হয়। প্রথমে বৌড়া (বড়ুয়া) নামক একপ্রকার অতি মজবুত ও চিকন বাঁশ সংগ্রহ করা হয়। পরে এটিকে কেটে এক সপ্তাহ পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়ে। বাঁশকে কেটে এরপর খাপ (চিকন ও চিড়ের মতো পাতলা করে কাটা) বানানো হয়। খাপগুলো দা দিয়ে ভাল করে মসৃণ করে নিতে হবে যাতে তা শরীরের কোনো অংশে লাগলে কেটে না যায়। মূলত খাপগুলো এমনভাবেই কাটা হবে যাতে কাঁচা বাঁশের খাপগুলো ইচ্ছেমত বাঁকানো সম্ভব। এরপর কিছু খাপ আড়াআড়ি করে বসানো হয় এবং কিছু খাপকে সোজা বসানো হবে। সোজা খাপগুলো আড়াআড়ি খাপের উপর ঠিক এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে সোজা খাপগুলো আড়াআড়ি খাপগুলোর একটির নিচ দিয়ে এবং অপরটির উপর দিয়ে যায়। এভাবে খাপ বুননের পর মধ্যবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত মোটা খাপ দ্বারা বুনতে হয়, যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। এরপর মাথাগুলোকে U বা গামলা আকৃতিতে বাঁকিয়ে একজায়গায় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার বা বেত দ্বারা বাঁধলে টুকরি নির্মিত হবে।

৫. চালুনি

সাধারণত খই থেকে ধান বা পিঠা তৈরির সময় চাউলের গুড়া ঝাড়ার জন্য চালুনি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অন্যান্য কাজেও চালুনি ব্যবহৃত হতে পারে।

টুকরির মতো চালুনি তৈরিতেও প্রথমে ১ সপ্তাহ ভেজানো বাঁশের অতি চিকন খাপ নিতে হবে। চালুনির আকৃতি অনুযায়ী খাপ কাটতে হবে। এরপর কিছু খাপ আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার উপর সোজা খাপগুলো এমনভাবে বসাতে হবে যাতে সোজা খাপটি আড়াআড়ি খাপের একটির উপর ও অপরটির নিচ দিয়ে যায়। এক্ষেত্রে চালুনির ফাঁক বুঝে খাপ বসানো হয়। চালুনির ফাঁক বড় হলে সকল বস্তু পড়ে যেতে পারে। তাই খাপগুলো মোটামুটি কাছাকাছি বসবে। খাপ সোজা ও আড়াআড়ি বসানো হয়ে গেলে দুটি মোটা খাপ চিকন খাপগুলোর মাথায় বসিয়ে চিকন খাপগুলো পা দিয়ে কিছুটা চাপ দিয়ে মোটা খাপকে চিকন খাপের সাথে বেঁধে ফেলতে হয়। এরপর মোটা খাপের দুই মাথা বেত বা তার দিয়ে শক্তকরে বেধে ফেললেই চালুনি তৈরি হয়ে যায়।

৬. হেইত

হেইত দিয়ে সাধারণত ছোট ডোবা, নালা বা অনেক সময় ছোট খালের পানি ফেলা হয়। মূলত মাছ ধরার জন্য যখন ছোট চোচার পানি ফেলা হয় তখন তা হেইতের মাধ্যমে ফেলতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

প্রথমে পানিতে ভেজানো বাঁশের খাপ তৈরির পর চালুনির মতোই আড়াআড়ি খাপের উপর সোজা খাপকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে সোজা খাপটি আড়াআড়ি খাপের একটির নিচ ও অপরটির উপর দিয়ে যায়। এক্ষেত্রে খাপ কাঁটার সময় খেয়াল রাখতে হয় খাপের মাপের উপর। সাধারণত হেইত তৈরির জন্য সোজা ও আড়াআড়ি খাপের দৈর্ঘ্য এক থেকে দেড় হাত লম্বা হয়। সোজা ও আড়াআড়ি খাপকে অতি কম দূরত্বে এমনভাবে পাশাপাশি স্থাপন করা হয় যাতে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁক না থাকে। ফাঁক থাকলে পানি বের হয়ে যাবে। এরপর খাপগুলোর চার মাথা U আকৃতিতে বাঁকিয়ে বাঁশের চিকন কিন্তু শক্ত কঞ্চি দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে ফেলতে হয়। বলাবাহুল্য এভাবেই তৈরি হয়ে যায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র সদৃশ হেইত।

৭. ঢুলা

ঢুলা মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। ঢুলা তৈরির জন্য প্রথমে বাঁশ কেটে তিন থেকে সাড়ে তিন হাত লম্বা খাপ তৈরি করা হয়। তারপর খাপগুলো আড়াআড়ি ও সোজাভাবে বসিয়ে নিতে হবে এমনভাবে, যাতে সোজা খাপগুলো আড়াআড়ি খাপের উপর নিচে স্থাপিত হয় এবং এতে ফাঁক থাকবে সামান্য যাতে ফাঁক দিয়ে মাছ বেরিয়ে না যায়। এরপর আড়াআড়ি ও সোজা খাপকে গোলাকৃতির করে এক অংশের সাথে অন্য অংশ তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে হবে। গোলাকৃতি ধারণের পর এর উপরের অংশ বাঁকিয়ে এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে তা কলসের মুখের মতো হয়ে যায়। নিচে যে প্রশস্ত গোলাকার অংশ থাকে তা মোটা ও শক্ত বাঁশের খাপের সাহায্যে তার দিয়ে ভাল করে বাঁধতে হবে যাতে তা না ছুটে ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। এই ঢুলার মাথায় ধরে মাছের উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে মাছ বেরিয়ে না যায়। ঢুলায় মাছ ঢুকে গেলে তা অতিসহজে উপরের চিকন অংশের উপর হাত ঢুকিয়ে নিয়ে আসা যায়। যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ভাঙ্গা কলসির মতো।

৮. কাফা

কাফা সাধারণত গরুর মুখে বেঁধে দেয়া হয়, যাতে সে কোনো কিছু খেতে না পারে। প্রথমে মোটা বাঁশ কেটে খাপ তৈরি করতে হবে। এই খাপগুলো প্রায় এক হাত পরিমাণ হয়। এরপর খাপগুলো সোজা ও আড়াআড়ি ভাবে একটির উপর অন্যটি স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সোজা খাপগুলি আড়াআড়ি খাপের উপর ও নিচ দিয়ে যাবে। খাপগুলোর ফাঁক হবে এক থেকে দেড় ইঞ্চি। এর আকৃতি অনেকটা বাটির মতো। এটি গরুর মুখে লাগিয়ে দড়ির সাহায্যে গলায় বেঁধে দেয়া হয়।

খ. লৌহনির্মিত লোকপ্রযুক্তি

১. শর্তা

শর্তা, সুপারি কাটার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার যন্ত্র। প্রথমে দুটি লোহার দণ্ড নিয়ে একটির অগ্রভাগ চ্যাপ্টা ও ধনুকের মতো বাঁকানো হয়। নিম্নাংশ ও অপর দণ্ডটি সরু

www.pathagar.com

থাকে। এটি সরল অথবা ঈশৎ বাঁকানো হতে পারে। চ্যাপ্টা অংশকে ধার দিয়ে একটি ছোট খিলের সাহায্যে এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে উভয় অংশকে নাড়ানো যায়। সরু লৌহ দণ্ডের উপরিভাগে সুপারি বা ওই জাতীয় কোনো দ্রব্য রেখে চ্যাপ্টা অংশের সঙ্গে যুক্ত লৌহদণ্ড ও সুপারি রাখা দণ্ডের নিচের অংশ পরস্পরের দিকে চাপ দিলে সুপারি বা দ্রব্যটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

২. বেড়ি

সাধারণত ১.৫ থেকে ৩ ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হলেও বেড়ি বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। দুটো লৌহ দণ্ড দ্বারা বেড়ি তৈরি করা হয়। দণ্ড দুটির সম্মুখ অংশ L বা U আকৃতিতে ছোট্ট করে বাঁকানো থাকে। ৬ থেকে ১০ ইঞ্চি (বা আরো বড়) দূরত্বে, দুটি L বা U কে মুখোমুখি রেখে একটি লোহার দণ্ডের উপর আর একটি লোহার দণ্ড ছোট্ট খিল দ্বারা আঁটকিয়ে দেয়া হয়। অনেকটা X আকৃতির এই যন্ত্রের নিচের অংশ দুটি; ব্যবহারকারীগণ হাতল হিসেবে ব্যবহার করেন। নিচের লৌহদণ্ড দুটি পরস্পরের বিপরীত দিকে টেনে প্রসারিত করলে উপরের অংশ মুখোমুখী (সংকুচিত) হয়ে বড় কোনো বস্তুকে আকড়ে ধরতে পারে। আর এ কারণেই এই যন্ত্রের সাহায্যে চুলা থেকে বড় ডেগ নামানো যায়। বেড়ি অবশ্য নানা ধরনের ভারী বস্তু স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩. কোদাল

কোদাল সাধারণত মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে তাকে। কোদাল তৈরির জন্য প্রথমে লোহা সংগ্রহ করতে হয়। তারপর লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কিছুটা চ্যাপ্টা ও প্রসারিত করতে হবে। কিছুটা প্রসারিত লোহা আগুনের মধ্যে রেখে বা আগুনে হিট দিয়ে প্রচণ্ড গরম করে তারপর হাতুড়ি দিয়ে পেটালে এর প্রসারতা বাড়ে। প্রসারিত লোহাকে এরপর গরম করে কোদালের সাজে বসিয়ে দেয়া হয়। ইট তৈরির মতো কোদাল তৈরিরও সাজ থাকে। কোদালের পেছনের অংশে যে ফাঁক থাকে, তার ভেতর দিয়ে শক্ত লাঠি প্রবেশ করিয়ে কোদাল প্রস্তুত হয়। গরম প্রসারিত লোহা সাজে বসিয়ে কোদালের আকৃতি ধারনের পর তা বের করে কিছুটা সময় আগুনে রেখে মজবুত করার পর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখলেই কোদাল তৈরি হয়ে যায়। কেউ কেউ কোদালে বিভিন্ন ধরনের রং ব্যবহার করেন।

৪. হাতুড়ি

হাতুড়ি তৈরির জন্য প্রথমে খানিকটা মোটা লোহাকে পরিমাণমত কেটে নেয়া হয়। পূর্বে লোহা গরম করে তা বারবার সোনা ও উল্টো দিকে ঘুরিয়ে কাটা হত, বর্তমানে রেতের সাহায্যে লোহা কাটতে দেখা যায়। লোহার খণ্ডটিকে কাটার পর কয়লা বা আংরার উপর রেখে আগুন ধরিয়ে গরম করতে হবে। এক্ষেত্রে লোহার যন্ত্র তৈরির দোকানে

www.pathagar.com

এক প্রকার কাপড়ের তৈরি থলে থাকে (পাম্প বক্স) যার মাথায় থাকে একটি দড়ি। দড়িতে ধরে টানলে বাতাস বেরিয়ে এসে আগুন ধরে রাখতে সাহায্য করে। লোহার খণ্ড আগুনে রেখে প্রচণ্ড গরম হলে ধীরে ধীরে তার মাঝখানে আরেকটি লোহার দন্ড ঢুকিয়ে দেয়া হয়। গরম হলে লোহা অনেকটা নরম হয়ে গেলে দণ্ড তাড়াতাড়ি ঢুকে যায়। লোহার খন্ডে ছিদ্র হওয়ার পর দণ্ড বের করে নিয়ে এসে লোহার খণ্ডটিকে পানিতে চুবিয়ে রেখে ঠান্ডা করলেই হাতুড়ির প্রথম অংশ তৈরি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বড় কিংবা ছোট হাতুড়ির জন্য লোহার খণ্ড ও লোহার ভেতর ঢুকানো দণ্ডটি ছোট বড় হবে। তারপর লোহার খণ্ডের ফাঁক বুঝে তাতে শক্ত কাঠ মজবুতভাবে বসালে হাতুড়ি তৈরি হয়ে যায়।

৫. বটি দা

বটি দা তৈরির জন্য প্রথমে পরিমাণমত একটি লোহার দণ্ড নিয়ে তা গরম করে নিতে হয়। তারপর গরম লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খানিকটা প্রসারিত ও মজবুত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে দা এর সাইজ বুঝে লোহা নিতে হবে সাধারণ এক হাত সাইজ পরিমাণ দিয়ে মাঝারি আকৃতির দা তৈরি করা যায়। তারপর আরেকটি লোহার খণ্ড নিয়ে তা গরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এমন ভাবে বাঁকা করতে হবে যাতে তা দেখতে চাঁদের মতো হয়। এরপর পূর্বের প্রসারিত করা লোহাকে গরম করে (পাম্প বক্স এর সাহায্যে) বাঁকা লোহাটি প্রসারিত লোহার মাথার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। বাঁকা লোহার দু পাশে প্রসারিত লোহার যে বাড়তি দুটি অংশ থাকে তা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে নিয়ে জোড়া লাগানো অংশটিকে আগুনে গরম করে ঝালাই করতে হবে। এরপর পানিতে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা করে দা-র পেছনের দিকে বাঁকানো দুটি অংশের মাথা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে প্রসারিত করতে হয় যাতে দা মাটিতে বসানো যায়। এরপর তাতে মেশিনের সাহায্যে ধার দিলেই দা তৈরি হয়ে যাবে।

৬. ছেদ দা/ কুব দা

এই দা দিয়ে সাধারণত গাছের ডালপালা কিংবা শক্ত কিছু কাটা হয়ে থাকে। মাঝারি আকৃতির একটি দা তৈরির জন্য প্রথমে একটি এক হাত পরিমাণ লোহার দণ্ডকে গরম করে দণ্ডের পেছনের খানিকটা অংশ পিটিয়ে অনেকটা গোলাকৃতি করা হয় যাতে তা হাত দিয়ে সুবিধামত ধরা যায়। সামনের অংশ পিটিয়ে বটি দা-র মতো কিছুটা চন্দ্রাকৃতি করে তা আগুনে দিয়ে ভাল করে গরম করে নিতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা করে তা মেশিনে ধার দিলেই ছেদ দা তৈরি হয়ে যায়।

৭. রাম দা

রাম দা-র প্রস্তুত প্রণালী কুব দার মতোই। শুধুমাত্র রাম দা বড় হয় বিধায় লোহা বড় আকৃতির নিতে হয়।

www.pathagar.com

৮. কাঁচি

কাঁচি দিয়ে সাধারণত ঘাস বা ধান কাটা হয়। প্রস্তুতকারক প্রথমে একটি পাতলা লোহাকে গরম করেন। পরবর্তীতে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাকে বাঁকানো হয়। এরপর একে ঠাণ্ডা করে এক পাশ ধারালো করে নিলেই কাঁচি হয়ে যায়। প্রস্তুতকারক কাঁচিকে এরপর একটি শক্ত গোলাকার কাঠের ভিতরে মজবুত রূপে স্থাপন করেন।

৯. নিড়ি কাঁচি

নিড়ি কাঁচি মাটি নিড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ছোট ছোট ঘাস তোলার জন্যও এই কাঁচি ব্যবহৃত হতে পারে। এই কাঁচি তৈরিতে প্রথমে আধ হাত পরিমাণ একটি লোহার চিকন দণ্ডকে আগুনে গরম করে নিতে হয়। তারপর দণ্ডের সামনের খানিকটা অংশ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে অনেকটা প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু পেছনের অংশ পূর্বের মতো চিকন থাকবে। অধিক মজবুতের জন্য পুনরায় তা গরম করে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। এরপর পেছনের চিকন সরু অংশকে একটি গোলাকৃতি কাঠের মধ্যে শক্তভাবে প্রবেশ করিয়ে প্রসারিত অংশের সামনের দিক পদ চালিত ঘুরন্ত মেশিন দিয়ে ধার দিলেই এই কাঁচি প্রস্তুত হয়ে যায়।

১০. ঘুটনি

সাধারণ ডাল সিদ্ধ করার জন্য বা ভালভাবে ডাল ও পানির মিশ্রণের কাজে ঘুটনি ব্যবহৃত হয়। ডালের পাত্রের মাঝে ঘুটনি রেখে ঘুটনির হাতলকে দুহাতের মাঝখানে ধরে পাত্রের চারপাশে ঘুরালে পানির সাথে ডাল ভালভাবে মিশে যায়।

প্রথমে লোহার তিনটি ছোট খণ্ডকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এর মাঝের অংশ প্রসারিত করা হয়। তারপর তিনটি অংশের মাঝে হাতুড়ি চালিয়ে দুই দিক উপরের দিকে তুলে প্রত্যেকটিকে U আকৃতি করা হয়। তারপর তিনটি খন্ডকে একটির উপর একটি ফাঁক করে বসিয়ে তার উপর একটি লোহার রড বসিয়ে খাড়াভাবে ঝালাই দিয়ে জোড়া লাগালেই ঘুটনি তৈরি হয়ে যায়।

গ. কাঠজাত লোকপ্রযুক্তি

অনেকে কাঠের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য তৈরির পর এর মাঝে বিভিন্ন ধরনের নকশা অঙ্কন করেন। প্রথমে নকশা তৈরির কাঠটিকে উত্তমরূপে বার্নিশ করা হয়। এরপর নির্মাতা একটি শাপলা ফুলের ছবির সাহায্য নিয়ে হাতুড়ি বাটালের সাহায্যে তদ্রুপ ফুল তৈরি করেন। বাটালটিকে কখনো উঁচুতে কখনোবা নিঁচুতে অনেক সময় আড়াআড়িভাবে চালানো হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ফুল তৈরি হলে শুধুমাত্র ফুলের অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশের কাঠ কেটে ফেলতে হবে। এরপর বাটাল দিয়ে ফুলটিকে ঠিকঠাক করার পর শিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়। ফুল তৈরি হয়ে গেলে তা চেয়ার, টেবিল বা খাটে পেরেকের সাহায্যে উত্তমরূপে স্থাপন করা যায়।

www.pathagar.com

ঘ. লেপ-তোষক তৈরির লোকপ্রযুক্তি

লেপ, তোষক, বালিশ প্রভৃতি তুলা-নির্মিত বস্তুসমূহ বিশেষ এক ধরনের যন্ত্র দ্বারা তৈরি হয়। এই যন্ত্রের নাম ধুনুরি। যে/যারা এগুলো তৈরি করে তাদের বলে ধুনকর।

যন্ত্র

ধুনুরি, ধনুকের মতো একপ্রকার যন্ত্র যা ৫ থেকে ৮হাত লম্বা হয়। তবে ধনুকের মতো যন্ত্রটি বাঁকা নয়। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ সরু লাঠির মতো, কিন্তু নিচের দিক চ্যাপ্টা। আসলে লাঠির শেষ অংশে চ্যাপ্টা অংশটুকু কৌশলে লাগানো হয়। চামড়ার একটি শক্ত দড়ি অগ্রভাগের সঙ্গে শেষাংশকে একতারা বা সেতারের মতো যুক্ত করে। এই দড়ি দ্বারাই তুলোকে ধুনা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে লেপ, তোষক বা বালিশ বানানোর উপযোগী কিছু তুলা পরিমাণ মতো সংগ্রহ করে একটি মাদুরে রাখা হয়। পরে ধুনরির যে অংশটি লাঠির মতো সেখানে ধুনকর হাত দিয়ে ধরে। যে অংশে দড়ি থাকে সে অংশ তুলার উপর রেখে তুলাকে পেছন দিকে ঠেলে আর একটি শক্ত লাঠির সাহায্যে বাড়ি (পিটুনি) দেয়। লাটিটি সরু এবং ৫/৭ হাত লম্বা হয়। ধুনকর বাঁহাতে যন্ত্রটি ধরে আর ডান হাতে লাঠি। এই কাজকে তুলো ধুনো বলে। তুলো ধুনো হয়ে গেলে ধুনকর একটি বিশেষ কৌশলে সরু ছিদ্র দ্বারা তুলা লেপ বা তোষকের ভেতরে প্রবেশ করান। পরে চতুর্দিক ও মাঝে বিভিন্নভাবে শেলাই করে একে ব্যবহার উপযোগী করেন। বালিশ হলে মাঝে সেলাই করার প্রয়োজন পড়েনা।

ঙ. ধান সেদ্ধ করার লোকপ্রযুক্তি

সেদ্ধ চাল দুই প্রকার। একটি এক সেদ্ধ, অন্যটি দুই সেদ্ধ বা দ্বি-সেদ্ধ।

প্রথমে ধান সংগ্রহ করে শুকাতে হয়। পরে প্রস্তুতকারক শুকনো ধান রাতের বেলা ভিজিয়ে রেখে পরের দিন তপ্ত জলে ফেলে সম্পূর্ণরূপে সেদ্ধ করেন। এটিই এক সেদ্ধ বা সিদ্ধচাল।

দ্বি-সেদ্ধ চাল প্রস্তুত করার জন্যও ধানকে আগের রাতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। প্রস্তুতকারক পরের দিন সেই ধান সামান্য ভাপিয়ে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখেন। সেই ধান পুনরায় ভাপিয়ে শুকিয়ে নিলে দ্বি-সেদ্ধ বা দুই সেদ্ধ চাল পাওয়া যায়।

তথ্যপঞ্জি

১. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ;১৯৯৮-ভূমিকা অংশ
২. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; বাঙালির নৃতত্ত্ব ও হিন্দুসভ্যতা, রোদেলা প্রকাশনী-২০১২; পৃঃ ৩২
৩. পাত্র সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রাহক উত্তম কুমার দেবনাথ ও সহপাঠী কয়েস মাহমুদ কর্তৃক সংগৃহীত

www.pathagar.com

৪. চা-শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তথ্য ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; পূর্বোক্ত থেকে সংগৃহীত
৫. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪
৬. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪৪
৭. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৬

সহায়ক গ্রন্থ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,
অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত,
সিলেট গাইড,
সিলেট পরিক্রমা,
সিলেট বিভাগের ইতিহাস।

www.pathagar.com

লোকভাষা

সিলেটের ভাষা, সিলেটি ভাষা, কিংবা সিলেটবাসীর কথ্যভাষা নামে পরিচিত সিলেটের মৌখিক ভাষা, বাংলার এক প্রান্তিক ভূখণ্ডের অধিবাসীর লোকভাষা। নবদ্বীপ থেকে বাংলার কোনো স্থানের দূরত্ব যত বেশি, সেই স্থানের ভাষাও মূল বা মান বাংলা ভাষা থেকে তত ব্যতিক্রমধর্মী। শব্দ, ক্রিয়া, বাক্যের গঠন, উচ্চারণ এবং সুর বা একসেন্টে এই পার্থক্য বা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, রাজশাহীর ভাষা থেকে তাই নোয়াখালি, চট্টগ্রামের ভাষা অনেক বেশি স্বতন্ত্র। সিলেট এবং সিলেটের যে অংশ ভারতের আসামের সঙ্গে যুক্ত, সেখানকার ভাষাও তাই যথেষ্ট পৃথক। বলাবাহুল্য এই ভাষা অন্য কোনো ভাষা নয়, এটিই সুরমা-বরাক উপত্যকার ভাষা, এটিই সিলেটের আঞ্চলিক বা লোকভাষা। নিম্নে এই ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :[১]

ধ্বনি ও রূপতত্ত্ব

১. শব্দের আদি 'স' বা 'শ' প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ শিয়াল > হিয়াল, সকল > হকল, শালি > হালি, শুকনা > হুক্না, সাঁতার > হাতার, শিং > হিং, সিনান (স্নান) > হিনান, শ্বশুর > হউর, শাশুড়ি > হড়ি/হরি, শাল > হাল, শালা > হালা, শুনা > হুনা, শিখা > হিখা (তেমনি সরা > হরা) প্রভৃতি। তবে—

২.ক) শব্দের আদি এবং মধ্যে হ উচ্চারিত হয় অ-রূপে। যেমনঃ আদি-হলুদ > অলুদ/অলদি, হরিণ > অরিন, হ্বজ > অঅ-জ। মধ্য-সাহস >সাঅস/সাওস, সহজ > সঅজ > স'জ, শহর > শঅর > শ'র প্রভৃতি।

২.খ) অনুরূপ আদি হা, 'আ' রূপে- যেমন : হাকিম > আকিম, হাতি > আতি/আত্তি, হাটু > আটু, হাওর > আওর, হাত > আত, হাঁস > আস, হাসা-হাসি > আসা-আসি, হায়দার > আয়দার প্রভৃতি।

২.গ) আদি হি, 'ই' রূপে যেমন : হিংসা > ইংসা, হিন্দু > ইন্দু, হিসাব > ইসাব, হিল > ইল, হিজরি > ইজরি প্রভৃতি।

৩. বেশ কিছু ক্ষেত্রে শব্দ মধ্যস্থ 'হ' লোপ পায়। যেমনঃ শহর > শ'র, পাহারা > পারা, প্রহর > প'র, গহরপুর > গ'রপুর, মহাজন > মাজন, সাহেব > সা'ব, জাহাজ > জা-জ প্রভৃতি।

৪. শব্দ মধ্যস্থ 'আ'-কার এর বিলুপ্তি ঘটে। যেমনঃ সাবান > সাবন, মাস্টার > মাস্টর, ডাক্তার > ডাক্তর, খাসি > খসি, মশারি > মশরি, কাঁঠাল > কাটল, বিছানা > বিচ্না ইত্যাদি।

৫. বিভক্তি এ স্থলে অ এবং তে স্থলে ত্ ব্যবহৃত হয়। যেমন : বনে বাঘ থাকে। > বন্অ (বনো) বাঘ থাকে। গাছে পাতা নেই > গাছ্অ গাছে) পাতা নাই। বাড়িতে

www.pathagar.com

মানুষ নেই > বাড়িত্ মানুষ নাই। হাড়িতে ভাত আছে > হাড়িত্ ভাত নাই প্রভৃতি।

৬. শব্দের অন্তস্থিত ও-কার এর স্থলে আ-কার হয়। যেমন : ভালো > ব্বালা, কালো > শালা, ফুলো > ফুলা, ধুলো > ধুলা (ধুইল) (সিলেটের ক এবং প এর উচ্চারণ বাংলা ক এবং প এর মতো নয়।) ইত্যাদি।

৭. কখনো কখনো এ-কার (ে) এর পরিবর্তে আ-কার (া) হয় : যেমন : নিয়ে > নিয়া, দিয়ে > দিয়া, বাইরে > বারা -ইত্যাদি।

৮. কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদি ও-কার এর স্থলে ঔ-কার হয়। যেমন : পোদ্দার > চৌদ্দার, শোল > শৌল।

৯. কোনা কোনো ক্ষেত্রে আদি উ-কারের স্থলেও ঔ-কার হয়। যেমন : রুই > রৌ।

১০. আবার ঔ-কারের স্থলে কখনো কখনো উ-কার হয়। যেমনঃ চৌহাট্টা > চুয়াট্টা।

১১. অ-এর উচ্চারণও কখনো কখনো উ-কার হয়। যেমনঃ সরু > হুরু। স > হ > হু।

১২. অনেক সময় অন্ত এ-কারের উচ্চারণ হয় আ-কার। যেমনঃ বাইরেও (বারে) > বারা > বাইরা

১৩. শব্দের অনাদি ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : পাথর > পাত্তর, বেতমিজ > বেত্তমিজ, টিলা > টিল্লা , ছাতি > ছাত্তি , হাতি> আত্তি, চাকু > চাক্কু , ষোল > শুল্ল, গুলি > গুল্লি ইত্যাদি।

১৪. 'য'-ফলা যুক্ত শব্দ উচ্চারণে 'ই' আগম। যেমনঃ কাব্য > কাইব্য, গদ্য > গইদ্য, খাদ্য > খাইদ্য, অদ্য > অইদ্য, সাম্য > শাইম্য ইত্যাদি।

১৫. অপিনিহিতির প্রভাব ব্যাপক। যেমন : ধামালি > ধামাইল, সারি > সাইর, আলি > আইল প্রভৃতি।

১৬. পদ মধ্যে উ-আগম। চাল > চাউল, নখ > নউখ, দাদ > দাউদ, হাক > হাউক প্রভৃতি।

১৭. পদ মধ্যে ই আগম। যেমন : কাল > কাইল, আজ > আইজ, চার > চাইর, মার > মাইর, পিঁয়াজ > পিয়াইজ, পাড় > পাইড়, ডাল > ডাইল, সাতাশ > শাতাইশ, আটাশ > আটাইশ, ডাকাত > ডাকাইত, বোন > বইন প্রভৃতি।

১৮. শব্দের আদি ও-এর উচ্চারণ উ হয়। যেমন : ওজন > উজন, ওকালতি > উকালতি, ওস্তাদ > উস্তাদ।

১৯. চন্দ্রবিন্দু যুক্তশব্দ অর্ধ অনুনাষিক উচ্চারিত হয়। যেমন : চাঁদ > চান্দ, ফাঁদ > ফান্দ, ইঁদুর > ইন্দুর, > উন্দুর, বাঁদী > বান্দী, বাঁদর > বান্দর, কাঁদে > কান্দে, রাঁধা > রান্দা, সিঁদুর > সিন্দু ইত্যাদি।

২০. কোথাও কোথাও চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ অনুপস্থিত। হাঁস > আস, বাঁশ > বাশ, চাঁদ > চাদ, পিঁপড়া > পিপরা, ফাঁক > ফাক, সাঁতার > সাতার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২১. র-এর স্থলে 'ল' এবং 'ল' এর স্থলে 'র'। শরীর > শরীল, রোম > লুম ইত্যাদি।

২২. ন -এর স্থলে 'ল' হয়; নড়া > লড়া, নাগাল > লাগাল, নীল > লীল ইত্যাদি।

২৩. ড় এবং ঢ় এর উচ্চারণ নেই বললেই চলে। তাই এতদ স্থলে 'র' হয়। যথাঃ পড়া > পরা, পাড়া > পারা, পাহাড় > পাহার/ পা'র, ঝড় > জহ্‌র, পোড়া > পুরা, গাঢ় > গার, আষাঢ় > আশার প্রভৃতি।

২৪. কোনা কোনো ক্ষেত্রে ম-এর স্থলে 'ফ'হয়। যেমনঃ মানকচু > ফানকচু।

২৫. কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দে অন্ত উদ্ধৃত স্বরের চিহ্ন দেখা যায় ছা (শাবক) > ছাও, পা > পাও, দা > দাও, গা (শরীর) > গাও, গাঁ (গ্রাম) > গাউ

২৬. শব্দের আদি র-ফলার উচ্চারণ নেই। প্রসাদ > পসাদ, প্রবাল > পবাল, প্রদ্যুত > পদ্যুত, প্রহ্লাদ> ক্রীত > কিত -ইত্যাদি। ব্যতিক্রম- ব্রত >'বর্ত।

২৭. অনাদি র-ফলাও অনেক স্থলে বিলুপ্ত। পুত্র > পুত্, চৈত্র > চৈত্, মুত্র > মুত ইত্যাদি।

২৮. অনেক শ স্থানে ছ হয়। শিকল > ছিকল, সোডা > ছুটা (সুটা), শ্রী > ছিরি ইত্যাদি।

২৯. শব্দের আদি, অন্ত ও মধ্যস্থিত ই-কার উ-কারে পরিণত হয়। ইঁদুর > উন্দুর, বালি > বালু, টেবিল > টেবুল প্রভৃতি।

৩০. আ-কার এর স্থলে এ-কার। ধাক্কা > ধেক্কা, তারা > তেরা, চারা > চেরা।

৩১.অনেক ক্ষেত্রে ম স্থলে ভ, আবার ভ স্থলে ম হয়। মহিষ > ভইস, ভেড়া > মেরা ইত্যাদি।

৩২. অনেক ক্ষেত্রে অ এর স্থলে আ হয়। লম্বা > লাম্বা, চলিশ > চালিশ, পঞ্জিকা > পাঞ্জি, চম্পা > চাম্পা প্রভৃতি।

৩৩. দের পরিবর্তে রার- আমাদের > আমরার। তাদের > তারার। তোমাদের > তুমরার।

৩৪. টি বা টা -এর পরিবর্তে 'গু' হয়। আমারটা তুমি নাও > আমার গু তুমি নেও। এটা কে ? > ইগু কিগু?

৩৫. এক বচনে কে-এর পরিবর্তে রে এবং বহুবচনে দিগকে-এর পরিবর্তে রারে ব্যবহৃত হয়। যেমন : আমাকে > আমারে, তাকে > তারে আমাদিগকে > আমরারে, তাদিগকে > তারারে।

৩৬. হইতে বা থেকে এর পরিবর্তে তাকি / তাইক্কা ব্যবহৃত হয়। থেকে > তাকি : ঘর থেকে > ঘর তাকি। এক থেকে > এক তাকি। গ্রাম থেকে > গাউ তাকি, উপর থেকে > উপর তাকি ইত্যাদি।

গ্রাম থেকে এসেছেন > গাউ তাকি আইছইন। [মৌলভীবাজার-সিলেট অঞ্চল]

থেকে > তাইক্কা : গাউ/গ্রাম তাইক্কা, এক তাইক্কা।

গ্রাম থেকে এসেছে। > গ্রাম তাইক্কা আইছে। [হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ অঞ্চল]

www.pathagar.com

৩৭ . হবে স্থলে অইবো বা লাগবো। দিতে হবে > দেওয়া লাগবো। কাজ হবে > কাজ অইবো।

সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় কিছু ভিন্ন ধরনের শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। যেমন :

বাংলা		সিলেটি	বাংলা		সিলেটি
তাড়াহুড়া	--	উলি	তাড়াতাড়ি	--	সকাল সকাল/জলদি
সন্ধ্যা	--	হাঞ্জা,	অহংকার	--	দ্বাফ্
আবর্জনা	--	বাদা	খাটো (বেটে)	--	বাট্টি
বিড়াল	--	মেকুর	লাউ	--	কদু
সত্য	--	হাচা	কথা	--	মাত্
ব্যথা	--	বিশ্	কতক্ষণ (সময়)	-	কতোবিল্
বালক (ছেলে)	-	পুয়া	পুরাতন	--	পুরান
বালিকা	--	পুরি	বৃষ্টি ও মেঘ	--	মেগ্ (বৃষ্টি এসেছে > মেগ্ আইছে)
ধৈর্য	--	আঙ্গাজ	ভুলে গেছি	--	পাউরি লাইছি
পিছে	--	করে	দাঁড়া	--	উবা
সহজে	--	আফ্‌রে	রাত জাগা	--	উজাগরি
বাড়তি	--	বলন্	অল্প	--	থোড়া
ঝামেলা	--	বেরা	জিজ্ঞেস	--	জিকার/ জিগার
গ্রাম	--	গাউ	এখনো	--	এবো

বর -- দামান) কেবল মুসলামানদের মধ্যে প্রচলিত) মন্দ -- নাটা। প্রভৃতি

সর্বনাম

সে > হে, তিনি > তাইন, ইনি > এইন।

এতদ্ব্যতীত—

১. প্রশ্নবোধক 'কোথায়' এর স্থলে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জে কই এবং সিলেটে কই অথবা কিয়ানো ব্যবহৃত হয়। যেমন : বাড়ি কোথায় ? - বাড়ি কই ? (বাড়ি কিয়ানো ?)

২. প্রশ্নবোধক কি এর স্থলে নি ব্যবহৃত হয়। যেমন: তুমি কি ভাত খাচ্ছ ? - তুমি ভাত খাইরায় নি ? ('নি' অবশ্য বাক্যের শেষে উচ্চারিত/ব্যবহৃত হয়।) তুই কি ভাত খাচ্ছিস? > তুই ব্বাত খাইরেনি? (সিলেট)। তুই ব্বাত খাছ না কিতা? (হবিগঞ্জ)

৩. প্রশ্নবোধক কি এর স্থলে কিতা -এর ব্যবহার : তুমি কী লিখছো ? > তুমি লেখরায় নি ? তুমি কি লিখছো? > তুমি কিতা লেখরায় নি?

৪. এখনো > এবো তুই এখনো যাসনি ? > তুইন্ এবো গেছোছ্ নানি ? / তুই অকোনো গেছোছ্ নানি?

৫. অতিরিক্তি হিসেবে 'বে' এর ব্যবহার।

www.pathagar.com

এটা কি হিন্দু নাকি ? > ইগু কিগু বে ইন্দু নি ?

অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়া পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন :

আসছে > আর্ (সিলেট)

এসেছে > আইছে আসছেন > আইরা, আইত্রা (সিলেট)।

এসেছেন > আইছইন। খাচ্চে > খার্ > খাইতাছে। যাচ্ছে > যার > যাইতাছে।

দিচ্ছে > দের, দিচ্ছেন > দিরা।

আসছি > আইয়ার্ / আইরাম্, আসছেন > আইরা।

খাচ্ছি > খাইরা্ / খাইরাম্, খাচ্ছে > খার্, খাচ্ছেন > খাইরা, প্রভৃতি।

সিলেটের লোকভাষার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ[২]

কারক নির্দেশক বদ্ধরূপমুল

প্রমিত বাংলার ন্যায় সিলেটের লোক ভাষাতেও ছয় প্রকার কারকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমনঃ **কর্তৃকারক,**

কর্তৃকারকে বিভক্তি : একবচনে শূন্য অ, তে, য় বিভক্তি এবং বহুবচনে রা, এরা, হকল, হকলে, তাইন, আইন, আইনতে, গুন, গুইনতে, তারা, তাইন ইত্যাদি বদ্ধরূপমূল ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন :

শুন্য বিভক্তি : ১. নানা আইছইন রাইগ্যা (রেগে)

এ, য় বিভক্তি : ১. মায় চায় মুকর বায়, পুয়ায় চায় আ-তর বায়, মাউগে চায় জেবর বায় (মা তাকায় মুখের দিকে, ছেলে তাকায় হাতের দিকে, স্ত্রী তাকায় পকেটের দিকে।

কর্তৃকারকে বহুবচন

১. আমরা পাইছি ২. তুমরা পাইছনা, তুমিতাইন খাইছনা।
এরা/আরা/বিভক্তি :
নাছিমা আর/ নাছিমারা ব্বালা (ভালো) আছৈন।

ন, নতে, ইন,ইনতে বিভক্তি :

১. এমদি পুয়াইন্ গ্বরো (ঘরে) হামাইতেঅউ, হেমদি পুড়িন্ বারই গেছৈনগি (এদিকে দিয়ে ছেলেরা ঘরে ঢুকতেই, অন্যদিক দিয়ে মেয়েরা বের হয়ে গেল)।

গুন. গুইন, গুনতে বিভক্তি :

১. মুরগর ছাওগুনতে খুটি খুটি খুদ খাইরা (মুরগির ছানাগুলো খুটে খুটে ক্ষুদ খাচ্ছে)।

(বাংলার ছ এবং সিলেটের ছ এরউচ্চারণ একরকম নয়)

তারা, তান, তাইন বিভক্তি :

১. তুমিতাইন ইতা না করলেও হেইন ইতা করছৈন (তোমরা এটা না করলেও তারা এটা করেছে)।

www.pathagar.com

কর্মকারক

কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, একবচনে শুন্য, অ, কে, রে, এরে, এ, য়, নে, বিভক্তি এবং বহুবচনে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে রারে, আরারে, অকলরে, অকলতেরে, নরে, ইনরে, ইনতরে, ইনতেরে, আইনরে, গুইনরে, গুইনতরে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কে, রে বিভক্তি : আমারে তুমার মনে পরেনি? (আমাকে কি তোমার মনে পড়ে?)

য় বিভক্তি : চাচায় থুরা বাড়াইয়া দেইন। (চাচা একটু বেশি করে দেন)

এ বিভক্তি : জনে জনে জিগাইমু (প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব)।

র/ন বিভক্তি : তান দেখা পাইলামনা (তার দেখা পেলাম না)।

করণ কারক

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি : একবচনে দি, দিয়া, রেদি, রেদিয়া বিভক্তি এবং বহুবচনে- রারেদি, অকলরেদি, হকলরে দিয়া, নরেদি, নরেদিয়া, অইনতরেদি, অইনতরেদিয়া, গুনরেদি, গুনরেদিয়া, গুনতরেদি, গুনতরেদিয়া, তানরেদি, তানরেদিয়া ইত্যাদি বিভক্তি ব্যবহৃত হয় যেমন:

১. কলম দি লেকইন, ২. চউক দিয়া দেকইন, ৩. মাতা দি বুজো।

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান করকে একবচনে চতুর্থী বিভক্তি এবং বহুবচনে কর্মকারকের মত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

আপাদান কারক

একবচনে তো, তন, তোনি, তনে, থাকি, থাকিয়া, থাইক্যা, অনে, অন্তে, অইতে, অতি, মানে ইত্যাদি বিভক্তি এবং বহুবচনে- রাতো, আরাতো, অকলাতো, নতো, ইনতো, আইনতো, গুনতো, গুইনতো, তাইনতো প্রভৃতি বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

একবচন :

১. গাছ তো/তন/তাকি/তনে আম পরছে।
২. বিপদো আল ছাড়িও না।

বহুবচন :

১. ইতা পাগল অকলতের/অক্লর কাম।

অধিকরণ কারক

একবচন ও (এ), ত, এ, য়. তো, তে প্রভৃতি বিভক্তি এবং বহুবচনে অলকো, নতো, ইনতো, আইনতো, গুনতো, গুইনতো, খাইনতো, গোছাইনতো ইত্যাদি বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

একবচন :

১. শুন্য বিভক্তি- তাইন ড্যাকাত গেছইন (তিনি ঢাকা গিয়েছেন)।
২. অ বিভক্তি- ই বছর, খেত্ বালা ঐছেনা (এ বছর ফসল ভালো হয়নি)।

www.pathagar.com

৩. য় বিভক্তি- ঢ়াতার বান্দর, ঢ়াতায় ঢ়াতায় আটে (পাতার বানর পাতায় পাতায় হাটে)।

(বাংলা প এবং সিলেটের প এর উচ্চারণ এক নয়।)

বহুবচন

১. অকলো/অকলতা বিভক্তি : ছলা অকলো/অকলাতো দ্বান (ধান) ব্যরা শেষ ঐছে (বস্তা গুলোতে ধান নেয়া শেষ হয়েছে।)।

সিলেটের লোকভাষায় এধরনের আরো অনেক স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা একে একটি প্রান্তিক ভূখণ্ডের ভাষা হিসেবে পরিচয় প্রদান করে।

তথ্যপঞ্জি

১. শরদিন্দু ভট্টাচার্য; সিলেট গীতিকা : সমাজ ও ভাষা; সাস্ট স্টাডিজ-ভলিউম ১৩; ২০১১; পৃ. ১০৯

২. বাংলা বিভাগ-শাবিপ্রবি, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের, ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের কয়েকজন শিক্ষার্থীর লেখা *সিলেটের উপভাষার বৈশিষ্ট্য: একটি পর্যালোচনা* শীর্ষক সেমিনার পেপারের সহায়তায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

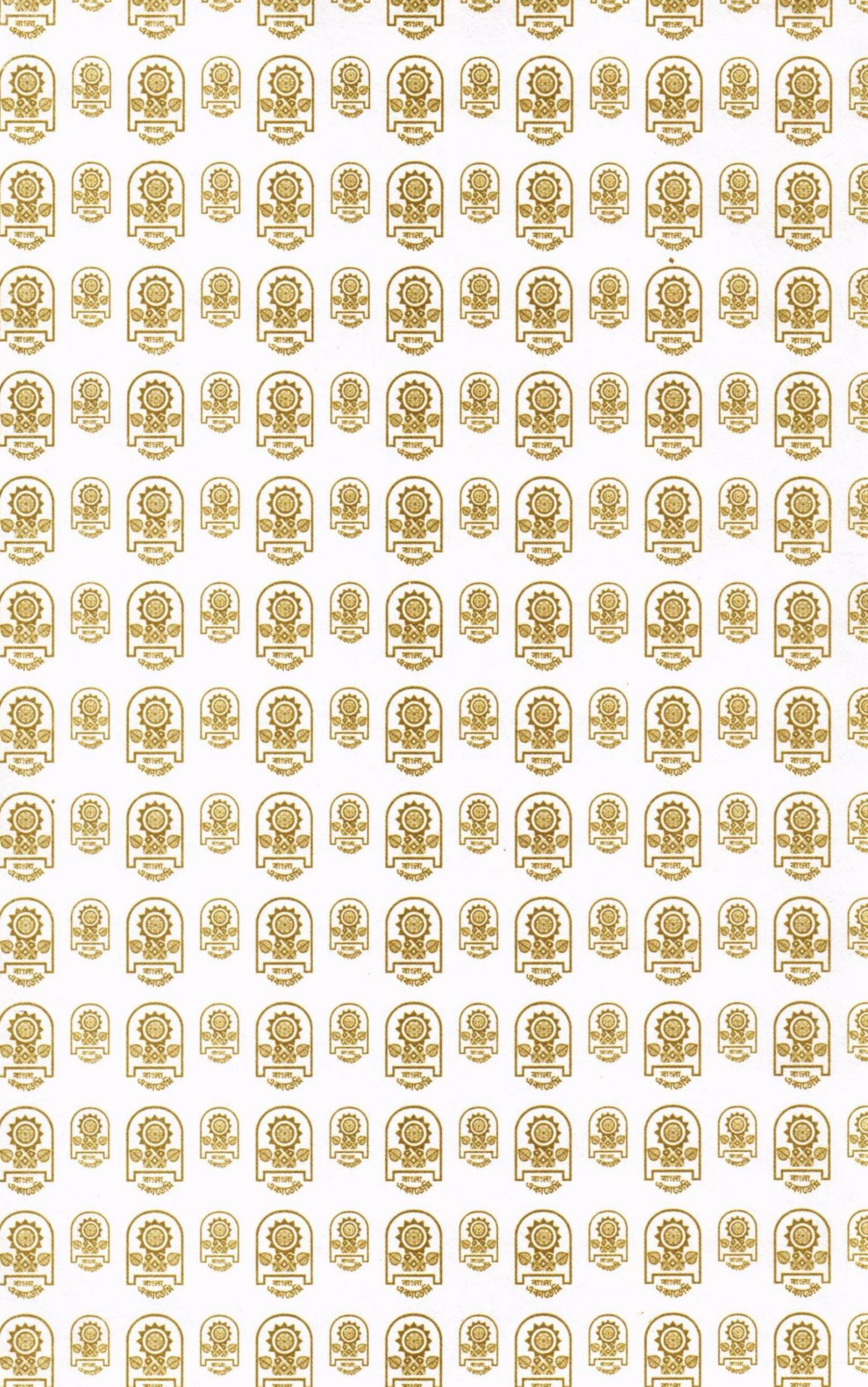
বাংলা একাডেমি